contents

আনসারী স্মরণিকা সিরিজ
সূরা কাহাফ উপসিরিজের তৃতীয় বই

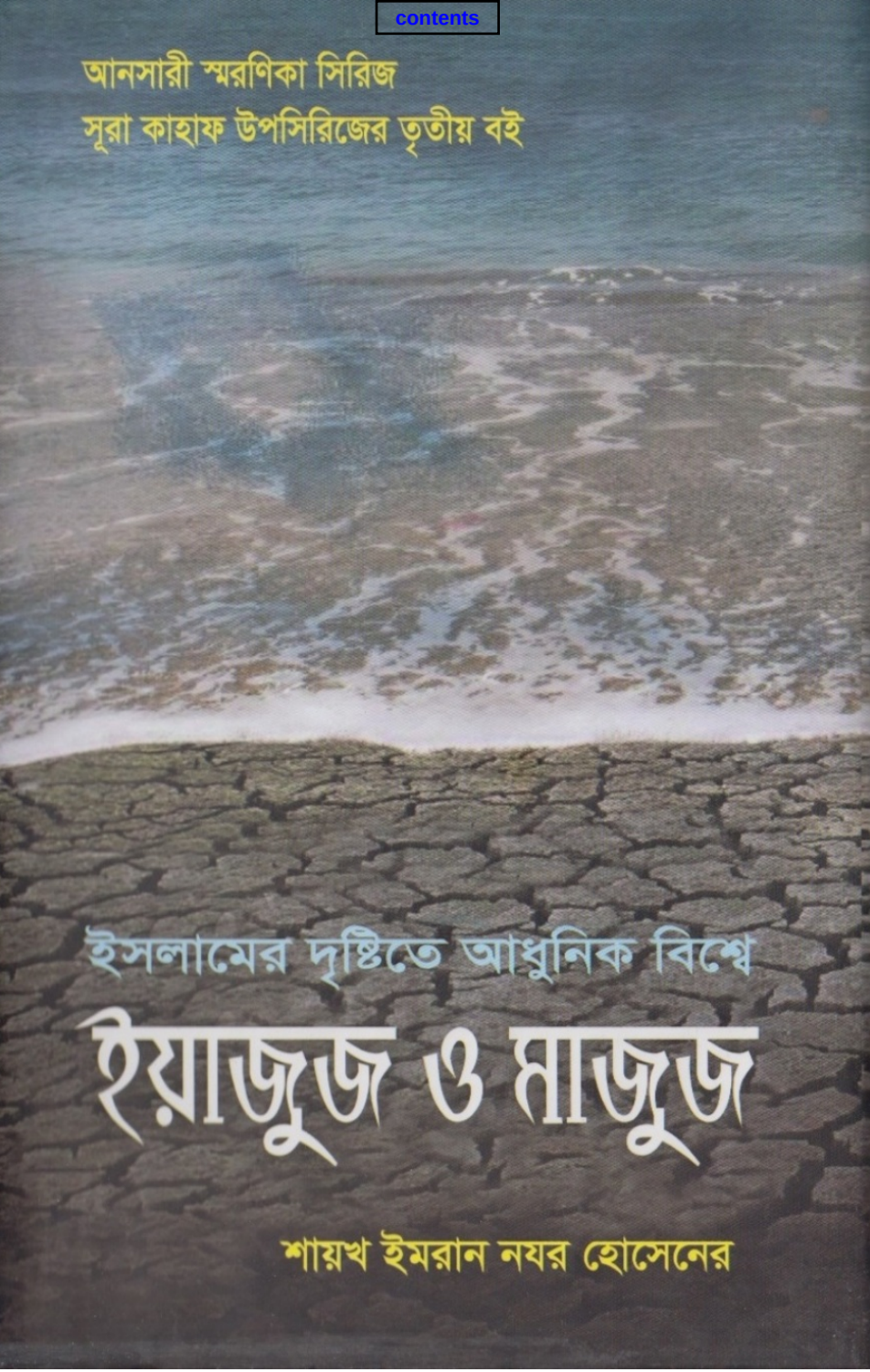

ইসলামের দৃষ্টিতে আধুনিক বিশ্বে

ইয়াজুজ ও মাজুজ

শায়খ ইমরান নযর হোসেনের

www.islamfind.wordpress.com

আনসারী স্মরণিকা সিরিজ
সূরা কাহাফ উপসিরিজের তৃতীয় বই

ইসলামের দৃষ্টিতে আধুনিক বিশ্বে ইয়াজুজ ও মাজুজ

An Islamic View of Gog and Magog In the Modern World

শায়খ ইমরান নযর হোসেন
মাসজিদ জামি'আহ, সান ফার্নান্ডো
ট্রিনিডাড ও টোবেগো

অনুবাদঃ আহমাদ মুহাম্মাদ হুসেইন

www.islamfind.wordpress.com

স্বত্ব
শায়খ ইমরান নযর হোসেন কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রকাশক

উৎসর্গ

লেখক বইটি উৎসর্গ করেছেন
ড. আল্লামা মুহাম্মাদ ইকবাল (রহ)-র উদ্দেশ্যে

অনুবাদটি উৎসর্গ করা হলো
লেখক শায়খ ইমরান নযর হোসেনের উদ্দেশ্যে

www.islamfind.wordpress.com

সূচিপত্র

অনুবাদকের কিছু কথা ১
আনসারী স্মরণিকা সিরিজ ৯
দ্বিতীয় সংস্করণের মুখবন্ধ ১৫
প্রথম সংস্করণের মুখবন্ধ ১৭
ভূমিকা ১৯
এক - আধুনিক যুগে শেষ সময়ের আলামত সমূহের গুরুত্ব ৪৫
দুই - গবেষণার পদ্ধতি ৮৩
তিন - পরিভাষাসমূহের ব্যাখ্যা ৯৯
চার - ইয়াজুজ ও মাজুজ পরিচিতি ১২১
পাঁচ - ইয়াজুজ ও মাজুজের চিহ্নিতকরণ ১৫৩
ছয় - ইয়াজুজ-মাজুজকে কী বিশ্বে ছেড়ে দেয়া হয়েছে? ১৭৫
সাত- ইয়াজুজ ও মাজুজকে ছেড়ে দেয়ার তাৎপর্য ১৯৫
আট - উপসংহার ২১৩

অনুবাদকের কিছু কথা

সমগ্র পৃথিবী আজ এক রহস্যময় **ইঙ্গ-ইসরাঈলি-মার্কিন ইউরো-রাশিয়ান** কালো শক্তির অক্টোপাস-বন্ধনে আবদ্ধ। মুসলিম বিশ্বও এর ব্যতিক্রম নয়। এক সময় ইউরোপীয় সভ্যতা রোমের চার্চ বা গির্জা দ্বারা শাসিত ছিল, অর্থাৎ ধর্ম ও রাজনীতি একই সাথে পরিচালিত হতো। কিন্তু ডারউইনবাদ, ফরাসী বিপ্লব এবং নানা পরিবর্তনের মাধ্যমে গির্জার সেই কর্তৃত্ব শেষ হয়ে গেল, এবং আবির্ভূত হলো নতুন এক মতবাদ: **ধর্ম, রাজনীতি, অর্থনীতি এসব পরস্পর আলাদা, এদের মাঝে কোন সম্পর্ক নেই।**

কট্টর খ্রিস্টান ইউরোপের মাঝে সংগঠিত আজব বিপ্লবের পরিণতিতে ধর্ম ও সমাজ এক ঈশ্বরহীন তথা ধর্মনিরপেক্ষ সভ্যতাতে রূপান্তরিত হলো। এই সভ্যতা আবির্ভূত হলো সীমাহীন বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, সৃজনশীলতা এবং অজেয় ক্ষমতা নিয়ে। এরা রাষ্ট্র, সামাজিক মূল্যবোধ, নীতি-নৈতিকতা, দর্শন, চিন্তা-চেতনা এমনকি ধর্মকেও তাদের নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নিল এবং এসবকে নিজেদের পছন্দ মতো সাজিয়ে তুললো, আর এটা আজও অব্যাহত রয়েছে।

অন্যদিকে মুসলিমরা নিজেদের আরাম-আয়েশ, অলসতার কারণে জ্ঞানবিজ্ঞান, সৃজনশীল কর্মকান্ডে এমনিতেই পিছিয়ে ছিল। তদুপরি ঔপনিবেশিক কালো শক্তির ষড়যন্ত্রে এসব একেবারেই বন্ধ হয়ে গেল। মুসলিমরা আরো অজ্ঞতার অন্ধকারে ডুবে গেল। অতঃপর ইংরেজরা এদেরকে উদ্ধারের নামে **নকল দ্বিমুখী শিক্ষার** প্রচলন করলো। তাতে অবশ্য অক্ষর জ্ঞান হলো ঠিকই, কিন্তু একদিকে সৃষ্টি হলো নিজ ঐতিহ্য ও আদর্শ বিস্মৃত, নিজ কৃষ্টি ও ধর্ম সম্পর্কে অজ্ঞ বা বৈরী ভাবাপন্ন ইংরেজি শিক্ষিত সংখ্যাগরিষ্ঠের দল। অপরদিকে সৃষ্টি হলো হত দরিদ্র দুনিয়া সম্পর্কে বেখবর, পরকালের নকল স্বপ্নে বিভোর মাদ্রাসা শিক্ষিত সংখ্যালঘুর দল। একদল **মিস্টার** আর একদল **মোল্লা**। কোন দলের কাছেই প্রকৃত জ্ঞান নেই এবং কোন দলই স্বাধীনভাবে নিজেদেরকে গড়তে শিখছে না।

পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত এই **মিস্টার** আকার আকৃতিতে মুসলিম ছদ্মবেশ থাকলেও তার মনমানসিকতা পুরোপুরি ইউরোপীয়। এরা ইউরোপীয় স্বপ্ন দেখে, ইউরোপীয়দের জীবন যাপন করে। তাদের এই ইউরোপীয় জীবন যাত্রা আজ চরমে পৌঁছেছে। আর সেই দল থেকে বেরিয়ে আসছে সালমান রুশদি, ফাতিমা মেরনিসি,

www.islamfind.wordpress.com

তসলিমা (আত্মস্বীকৃত বেশ্যা) নাসরীন, হুমায়ুন আজাদ সহ আরো অনেক আত্মস্বীকৃত নাস্তিকের দল। এরাই হচ্ছে আজকের যুগের প্রগতি ও আলোকপ্রাপ্তির ঝান্ডাবাহী।

অপরদিকে ইসলামের খুঁটিনাটি বিষয়ে তর্ক-বাহাস, মসজিদের ইমামতি, মাদ্রাসায় তালিম, ইত্যাদি কাজে ব্যস্ত রইল **মোল্লা**র দল। শতকরা নব্বই ভাগের বেশি জনতা গুরুত্বপূর্ণ সকল শিক্ষার স্পর্শ থেকে বঞ্চিত রইল। ফলস্বরূপ, বাপ-দাদাদের কাছ থেকে শোনা **রূপকাহিনী**র আড়ালে **এক প্রাণহীন ইসলামের খোলস** অবহেলায় পড়ে রইল।

উপরন্তু আরব বিশ্বে তথাকথিত **তৌহিদের** নামে এমন এক ইসলাম প্রচার করা হলো, যেটা ইসলামকে আরো প্রাণহীন বানিয়ে ছাড়লো। **শির্ক** উচ্ছেদের নামে সাহাবা কিরামদের কবরকে ধ্বংস করা হলো ... সবচেয়ে বড় যে বিশ্বাসঘাতকতা করা হলো তা হচ্ছে, মিথ্যা **শির্কে**র ধুয়া তুলে **ব্রিটিশদের** মদদে **উসমানি ইসলামি খিলাফত**কে বিলুপ্ত করা হলো। এবং মহান নবী (সাঃ)-এর প্রতিষ্ঠিত **দারুল ইসলামে**র বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা হলো। এই কাজ করতে গিয়ে বহু মুসলিমদেরকে নির্বিচারে হত্যা করা হলো, বহু মুসলিম মা বোনদের ইজ্জত লুটে নেওয়া হলো আর এটাই নাকি **তৌহিদ**।

এই সমস্ত নানাবিধ ষড়যন্ত্রের কারণে, কাফিরদের মিডিয়া, প্রচারণা ও তথ্য সন্ত্রাসের আন্তর্জাতিক আয়োজনের মুখে বর্তমানে মুসলিমেদের অবস্থা পুরোপুরি **সিংহের মোকাবেলায় ছাগ শিশুর মতো**। তা মোকাবেলা করার জন্যে মুসলিম জনগোষ্ঠী কর্তৃক রচিত পুস্তকের কোন উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি নেই বললেই চলে। কাফিরদের রণসজ্জার মুখোমুখি কোনরকমে দাঁড়াতে পারে, এরূপ বইপুস্তকের বেশির ভাগই নব্য মুসলিমদের লেখা। [এর উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম হলো, মাওলানা ড. মুহাম্মাদ ফজলুর রহমান আনসারী (রঃ), শায়খ ইমরান হোসেন, হারুন ইয়াহিয়া Harun Yahya প্রমুখ]।

Hamza Yousuf, Gai Eaton, Frithjof Schuon, Murad Hofmann, T.B.Irving, Maryam Jameelah, Jeffery Lang, Michael Wolfe, Martin Lings, Gary Miller, Abdul Hakim Murad, Ahmad Thomson, Leopold Weiss, Abdullah Hakim Quick এরা সবাই ধর্মান্তরিত মুসলিম!

অবাক করা হলেও সত্য, পশ্চিমা কাফিরতন্ত্রের আগ্রাসী **তথ্য সন্ত্রাস এবং কলম যুদ্ধে**র মোকাবেলায় আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গত শতাব্দিতে সবচেয়ে কার্যকর লেখা বইপত্র এসেছে দু'জন জন্মগতভাবে খ্রিস্টান লেখকদের কাছ থেকে। এদের একজন

হলেন Edward Said এবং অপর জন হলেন Maurice Bucaille। Edward Said-এর Orientalism এবং Covering Islam মুসলিমদের বিরুদ্ধে ইহুদি, খ্রিস্টান, পশ্চিমা সবার পরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের তথা প্রচারযন্ত্রের মুখোশ খুলে দিয়েছে, ঠিক তেমনি অনেক Orientalist-কে চিরতরে স্তবদ্ধ করে দিয়েছে। Maurice Bucaille-এর The Bible, The Qur'an and Science এবং What is the Origin of Man দুটো সাহিত্য কর্মই, একদিকে যেমন, জোর করে যারা Bible-কে ঐশী বাণী বলে চালাতে চেষ্টা করে, তাদের প্রচেষ্টাকে একেবারে সমাহিত করে দিয়েছে, তেমনি অপরদিকে হতাশাগ্রস্থ বা **বস্তুত কাফির** হয়ে যাওয়া মুসলিমদের মাঝে নিজেদের ধর্ম নিয়ে নতুন করে চিন্তাভাবনা করার একটা উদ্যম এনে দিয়েছে।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ ব্যাপারে সমস্ত ঘটনা ছাপিয়ে যে অসঙ্গতিটা সবার নজরে পড়বে, তা হচ্ছে জন্মগত মুসলিমদের প্রচেষ্টা এক্ষেত্রে একেবারে শুন্যের কোঠায়। প্রকৃতপক্ষে মুসলিম আলিমদের মাঝে আজ এক বিরাট ভ্রান্তি রয়ে গেছে। তা না হলে এ ক্ষেত্রে মুসলিমদের এমন দূরবস্থা কেন? আমাদের আলিম সমাজ আজ পর্যন্ত তাদের ভ্রান্তি উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়নি। যে নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গির কারণে প্রথমদিকে আলিম সমাজ ব্যর্থতার গ্লানি বরণ করে নিয়েছিল, আজো প্রায় প্রতিটি মুসলিম দেশেই তারা সেই একই দৃষ্টিভঙ্গির উপর অবিচল রয়েছে।

কতিপয় ব্যতিক্রমি ব্যক্তিত্বকে বাদ দিলে আলিম সমাজের সাধারণ অবস্থা হলো, আজকের যুগের ভয়ংকর গতিপ্রকৃতি এবং মানসিকতার নতুন গড়নকে উপলব্ধি করার কোনো চেষ্টাই তারা করেন না। আধুনিক পরিস্থিতি মুসলিমদের জন্যে যে ভয়ানক চ্যালেঞ্জ উপস্থাপন করেছে তার মোকাবেলা করতে এরা একেবারেই অক্ষম ও অসমর্থ।

কিন্তু দাড়ি-গোঁপ, টুপি-পাগড়ি, মেসওয়াক, ঢিলা-কুলুপ আর বিবি তালাকের মতো নিতান্ত গুরুত্বহীন ব্যাপারে তারা কিনা সিদ্ধহস্ত। মূলত এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্যে যে উদ্যম, মনমানসিকতা ও ইজতিহাদ লাগে, সেগুলিকে এরা নিজেদের জন্যে হারাম করে নিয়েছে। বস্তুত আজকে আমাদের আলিম সমাজ ইসলামের শিক্ষা এবং তার বিধিবিধান প্রচারের জন্যে যে পন্থা অবলম্বন করেছেন তা আধুনিক শিক্ষিত লোকদেরকে ইসলামের সাথে পরিচিত করানোর পরিবর্তে উল্টো তাদেরকে বীতশ্রদ্ধ করে দিচ্ছে। এমনকি কখনো কখনো তাদের ওয়াজ নসীহত শুনে কিংবা তাদের রচনাবলি পড়ে স্বতস্ফূর্তভাবেই মন থেকে বলে উঠে: **খোদা যেন কোন অমুসলিম বা পথভ্রষ্ট মুসলিমের কানে এই অর্থহীন প্রলাপ না পৌঁছায়।**

মোটকথা আমাদের এই আলিম সমাজ তাদের চারিদিকে ৩০০ বছরের পুরনো পরিবেশ তৈরী করে রেখেছেন। সেই পরিবেশেই তারা চিন্তা করেন, ভাবেন, তার ভেতরেই তারা বসবাস করেন, তার উপযোগী কথাবার্তাই তাদের মুখ থেকে বের হয়। আজ ২০১৩ সালে তারা নিজেদের গন্ডির সীমাবদ্ধতা থেকে বেরিয়ে কিছুই দেখতে চান না। এরা কোন চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করবেন? এ জন্যেই আমাদের নবী (সাঃ) বলে গেছেন যে: ***শেষ সময়ে পৃথিবীর সবচেয়ে নিকৃষ্ট জানোয়ার হবে এই সব আলিমরা।***

ইউরোপীয় সভ্যতার মতো আজকের মুসলিম এমনকি আলিমরাও বিশ্বাস করেন যে: **ধর্ম রাজনীতি ও অর্থনীতি পরস্পর আলাদা, এদের মাঝে কোন সম্পর্ক নেই।**

অনেকেই হয়তো বলতে পারেন এটাই তো ইসলামের শিক্ষা।

আমি তাদেরকে বলবো আপনারা কি আপনাদের পূর্বপুরুষদের ইতিহাস ঐতিহ্যের কোন খোঁজখবর রাখেন? তা নাহলে এই প্রশ্ন কোনো মুসলিমের মুখে শোভা পেত না। খ্রিস্টাব্দ ৬২৩ সাল থেকে ১৯২৪ সাল পর্যন্ত ইসলামি খিলাফত প্রতিষ্ঠিত ছিল। আজকের মুসলিমপ্রধান দেশগুলি ছিল এর অন্তর্ভূত। কোনো সীমানা ছিল না, ছিল না কোনো ভিসা, যেকোন মুসলিম এই খিলাফতের ভিতর স্বাধীনভাবে বসবাস করতে পারতো, নিজেদের ইচ্ছামত পেশা নিজের পছন্দের দেশে বেছে নিতে পারতো। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো, এই বিশাল খিলাফতে রাষ্ট্র পরিচালিত হতো কুর'আন ও সুন্নাহর মাধ্যমে, এর অর্থনীতি ছিল সুদবিহীন। রাজনীতি ছিল গণতন্ত্র তথা সমাজতন্ত্রের শির্ক মুক্ত।

কিন্তু ব্রিটিশ ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে এই খিলাফত ব্যবস্থাকে ধ্বংস করা হয়, মুসলিমদেরকে পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ করা হয়, তাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হয় রাজনৈতিক শির্ক এবং অর্থনৈতিক শির্ক। কিছু সচেতন মুসলিমরা এগুলির বিরোধিতা করে, কিন্তু তাদেরকে নির্মমভাবে দমন করা হয়, বাকিরা এই পরাধীনতার শৃঙ্খল মেনে নিতে থাকে এবং একেই তাদের স্বাভাবিক পরিণতি ভাবতে আরম্ভ করে। আস্তে আস্তে মুসলিমরা পাশ্চাত্যের কালো শক্তির জীবনযাত্রাকে গ্রহণ করতে শুরু করে।

তখন থেকেই মুসলিম বিশ্বে প্রবেশ করলো গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, পুজিবাদের আড়ালে সুদ, ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা ব্যবস্থা, আরো নানান কিছু। মূলত তখন থেকেই এই সব উদ্ভট চিন্তাচেতনা মুসলিমদেরকে গ্রাস করে নিয়েছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো

আমাদের আলিম সমাজও এই একই রকম চিন্তাচেতনায় বিশ্বাসী (কিছু বাদে, ইল্লা মাশাআল্লাহ)।

এই ধ্যানধারণায় বিশ্বাসী মুসলিমদের ব্যাপারে **ইঙ্গ-ইসরাঈলি-মার্কিন ইউরো-রাশিয়ান** কালো শক্তি একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে গেছে। কারণ, এরূপ মুসলমানেরা (যতই নামায, রোযা পালন করুক, লম্বা দাড়ি রাখুক, পরুক না কোর্তা জোব্বা আর কত কি) তাদের ধর্মহীনতার বিরুদ্ধে কখনো প্রতিবাদ করবে না, করবে না তাদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। এই সমস্ত কাফিররাও জানে কোন্‌টা **প্রকৃত ইসলাম** আর কোন্‌টা **বাতিল, ভন্ড ইসলাম**। তাই তারা এরূপ মুসলিমদের পৃষ্ঠপোষকতা করে, তাদের প্রচারিত ইসলামকে সম্মান করে।

কিন্তু আল্লাহ্‌র জমিন কখনো **মুহসিন** শূন্য ছিল না এবং আজও তার ব্যতিক্রম নয়। আর এ কারণেই পৃথিবীতে আজও এমন কিছু আলিম রয়েছেন যারা **মহা সত্যের** জন্যে সংগ্রাম করে যাচ্ছেন। এরাই হচ্ছেন আজকের যুগের আউলিয়া কেরাম। আল্লাহ্‌ আমাদেরকে **মহা সত্যকে** বুঝার তৌফিক দান করুন। তারপরেও এদের সংখ্যা নিতান্তই কম হবে। নবী (সাঃ) তো বলেই গেছেন,

بَدَأَ الإِسْلاَمُ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ

ইসলাম আরম্ভ হয়েছে অপরিচিত (গরীব) অবস্থায় এবং শীঘ্রই তা অপরিচিত হয়ে যাবে অতএব অপরিচিতদের জন্যে রয়েছে সুসংবাদ।

[সহীহ মুসলিম]

আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাদেরকে এই অপরিচিতদের দলভুক্ত করুন। আমিন!

এই বইটিতে কুর'আন ও হাদীসের মাধ্যমে বাস্তবতাকে তুলে ধরা হয়েছে। ইয়াজুজ ও মাজুজ, দাজ্জাল, শেষ সময়ের আলামত, ইত্যাদি বিষয়গুলিকে তো আমাদের আলিমরা **আলিফ লায়লার** গল্পের মতো বানিয়ে রেখেছেন। এই বইটিতে সেসব জঞ্জাল পরিষ্কার করা হয়েছে। প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল আজকের আজব বিশ্বের ঘটনাপঞ্জি এই বইটিতে উপস্থাপিত তথ্যের সত্যতা প্রমাণ করতে আরম্ভ করে দিয়েছে।

এর ভাল দিক হলো, এই উপস্থাপনার মাধ্যমে আজকের বিশ্বে চলমান রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সর্বোপুরি আজকের যুগের ভয়াবহ বাস্তবতাকে খুব সহজেই ব্যাখ্যা করা যায়। এটা সত্যিই আল্লাহ্‌র রহমত। আশা করি আল্লাহ্‌ আমাদের হৃদয়কে **সত্য** বুঝার জন্যে আগ্রহী করে দিবেন। আমিন!

আমার অনুবাদে ভুল থাকাটাই স্বাভাবিক। আশা করি তা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে মূল্যায়ন করা হবে। এই কঠিন কাজে আমি আমার সাধ্যমত চেষ্টা করেছি।

আমি আশা করছি এই বইটি পাঠের মাধ্যমে সচেতন পাঠক ক্ষণস্থায়ী দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে ইসলামে প্রতিষ্ঠিত হতে দৃঢ়প্রত্যয়ী হবেন এবং আজকের পৃথিবীর ভয়াবহ বাস্তবতাকে উপলব্ধি করে নিজেকে এবং নিজের পরিবারকে **দাজ্জাল** এবং **ইয়াজুজ ও মাজুজীয় বিশ্ব-ব্যবস্থা** থেকে রক্ষা করার সংগ্রাম চালিয়ে যাবেন। আমিন!

মহান আল্লাহ্‌র কাছে আমি শ্রদ্ধেয় শায়খ ইমরান নযর হোসেনের জন্যে দু'আ করছি এবং তাঁর শ্রদ্ধেয় শিক্ষক, অসাধারণ স্মরণশক্তির অধিকারী, মাওলানা ড. ফজলুর রহমান আনসারী (রঃ) এবং তাঁর শিক্ষক মাওলানা আব্দুল আলিম সিদ্দিকী (রঃ)-এর পবিত্র আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি, আল্লাহ্ তা'আলা এদের সকলের নেক আমলকে কবুল ও মঞ্জুর করে নিন। আমিন!

আমরা আরো মাগফিরাত কামনা করছি আল্লামা ড. মুহাম্মাদ ইকবাল (রঃ), ড. ইসমাঈল রাজি আল-ফারূকী, ম্যালকম এক্স, এবং এই পথে চলা নাম না জানা আরো অনেক মুসলিম মনীষীদের জন্যে। আমিন!

হে আল্লাহ্! আমাদের আদর্শ এবং অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব যেন হন, আল-কুতুব আল-গাউস আবদুল-কাদ্বির আল-হাসানী আল-হুসাইনী আল-জিলানী (রঃ), হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম আল-গাযালী (রঃ), মুঈনউদ্দিন চিশতি (রঃ) এবং এঁদেরই পবিত্র হাতে গড়া মুজাহিদ সালাউদ্দিন আইয়্যুবী (রঃ) ...। আমিন!

হে আল্লাহ্! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। ইয়া আল্লাহ্! জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ **আউওয়ালুল-মাখলুক রহমাতুল্লিল-আলামীন** হাবীবে মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের **ওয়াসীলায়** আমাকে ক্ষমা করুন। আমিন!

আহমাদ মুহাম্মাদ হুসেইন
রামাদান, ১৪৩২ হিজরী

کھل گئے یاجوج اور ماجوج کے لشکر تمام
چشمِ مسلم دیکھ لے تفسیرِ حرفِ ینسلون
[بانگِ درا، ظریفانہ : ۲۳]

খুল গ্যয়ে ইয়াজুজ আওর মাজুজকে লস্কর ত্যমাম
চ্যশমে মুসলিম দেখ্ লে ত্যফসীরে হ্যরফে ইয়ানসিলুন
[বাঙ্গ-ই-দ্যরা, য্যরিফানাঃ ২৩]

ইয়াজুজ ও মাজুজের দলবল হয়ে গেল মুক্ত
ইয়ানসিলুনের অর্থ মুসলিমের দৃষ্টিতে উন্মুক্ত
(এখানে কুর'আনের সূরা আম্বিয়ার ৯৫-৯৬ আয়াত দু'টির দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, যার শেষে রয়েছে *ইয়ানসিলুন* শব্দটি)

১৯১৭ সালে ইউরোপীয় ক্রুসেডারদের জেরুযালেম দখলের পর যিনি এই অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ চরণ দু'টি রচনা করেছিলেন সেই ড. আল্লামা মুহাম্মদ ইকবালের উদ্দেশ্যে নিবেদিত।

وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ
حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ

নিষেধাজ্ঞা জারি রয়েছে একটি শহরের [অর্থাৎ জেরুযালেমের] উপর যাকে আমরা ধ্বংস করে দিয়েছি [এবং এর অধিবাসীরা সেখান থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে], ['এই শহর আমাদের', এই দাবী নিয়ে] তারা [অর্থাৎ সেই অধিবাসীরা] আর সেখানে ফিরে আসতে পারবে না যতক্ষণ না ইয়াজুজ ও মাজুজকে মুক্ত করে দেয়া হচ্ছে এবং তারা সবদিকে ছড়িয়ে না পড়ছে [তারপরই তারা ইয়াজুজ ও মাজুজের বিশ্ব-ব্যবস্থা কায়েম করবে]। [আমাদের মন্তব্য ব্র্যাকেটে] [সূরা আম্বিয়া, ৯৫-৯৬]

www.islamfind.wordpress.com

আনসারী স্মরণিকা সিরিজ

বিশিষ্ট ইসলামি আলিম, দার্শনিক এবং সুফী শিক্ষক, মাওলানা ড. মুহাম্মাদ ফজলুর রহমান আনসারী (রঃ)-র (১৯১৪-১৯৭৪) সম্মানে **আনসারী স্মরণিকা সিরিজ** প্রকাশিত হয়। এই সিরিজের প্রকাশনা, তাঁর মৃত্যুর ২৫তম বার্ষিকী উপলক্ষে ১৯৯৭ সালে আরম্ভ হয়।

মাওলানা আনসারী (রঃ) ছিলেন এমন একজন ইসলামি পন্ডিত, শিক্ষক এবং আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শক, যিনি বর্তমান ধর্মবিমুখ জগতে ইসলামের জন্যে সংগ্রামে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন। এই মহৎ উদ্দেশ্য ১৯৫০ সাল থেকে ১৯৭০ সালের মাঝের দুই দশকের বেশী ইসলামের উপর বক্তৃতার সফরে তাঁকে বহুবার গোটা মানচিত্রব্যাপী বহু প্রত্যন্ত অঞ্চলে নিয়ে যায়। এসব সফরে তিনি করাচিতে (১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের জন্মের পর তিনি সেখানে অভিবাসী হয়ে আসেন) তাঁর নতুন বাসস্থান থেকে পশ্চিম দিকে যাত্রা আরম্ভ করতেন এবং কয়েক মাস সফরের পর পূর্ব দিক থেকে বাড়ি ফিরতেন।

তাঁর জীবনের মিশন ছিল স্বচ্ছ ও মহৎ। ব্যক্তিজীবনে ধর্মবিশ্বাসকে পুনরুদ্ধার করার আগে একটা রাষ্ট্রযন্ত্র, তথা আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা হিসেবে ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করা যে সম্ভব নয়, এ ব্যাপারটি তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। অথচ, সেই সময় মু'মিনদের এই ব্যক্তিগত বিশ্বাসই ইতিহাসের সবচেয়ে, প্রতারণামূলক, বিপজ্জনক ও অক্লান্ত আক্রমণের বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছিল। এই আক্রমণ পরিচালিত হয়েছিল আধুনিক ধর্মবিমুখ বিশ্ব দ্বারা, যার নেতৃত্বে প্রথমে ছিল ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ, বর্তমানে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র এবং সবশেষে হবে ইসরাঈল। কিন্তু সব সময়েই এই কর্মকান্ডের সবচেয়ে প্রভাবশালী পক্ষ ছিল ইউরোপীয় পরিচিতির আড়ালে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত সেখানকার ইহুদি সম্প্রদায়।

মহান আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি মানুষের বিশ্বাস পুনরুজ্জীবিত করা, এই একটি মাত্র উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই মাওলানা জীবন ব্যাপী প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন। ইসলামের পক্ষে বুদ্ধিবৃত্তিক সংগ্রাম করতে গিয়ে, তিনি তাঁর অসাধারণ মেধা এবং উচ্চমানের জ্ঞানসম্পদকে কাজে লাগিয়েছেন। যারাই তাঁর সংস্পর্শে এসেছে, তাঁর আধ্যাত্মিক জ্যোতি এবং অসাধারণ আকর্ষণ তাদের অন্তর স্পর্শ করেছিল। সত্যের পথে তাঁর সাধনা

www.islamfind.wordpress.com

ও শ্রমের ফলস্বরূপ, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, উভয় অঞ্চলের বিপুল সংখ্যক মুসলমান তাদের আত্মবিশ্বাস ও ইসলামের প্রতি ঈমান ফিরে পেয়েছে এবং তা সুদৃঢ় করতে পেরেছিল। হাজার হাজার মানুষ আধ্যাত্মিক জগতে তাঁর ছাত্র এবং শিষ্য হয়েছিল এবং বহু অমুসলিম তাঁর বাণী শুনে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিল।

মাওলানা তাঁর স্নাতক ডিগ্রি নিয়েছিলেন ভারতের আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে, যেখানে তিনি দর্শন ও ধর্মীয় বিষয়ে পড়াশোনা করেন। ইসলামি দর্শন ও আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে তাঁর চিন্তা ভাবনার উৎস ছিলেন বিখ্যাত ইসলামি চিন্তাবিদ ড. মুহাম্মাদ ইকবাল (রঃ)। ইকবাল ছিলেন ইসলামি জ্ঞানে সমৃদ্ধ অত্যন্ত উঁচুদরের পুস্তক *The Reconstruction of Religious Thought in Islām*-এর রচয়িতা। ধর্মীয় চিন্তা পুনর্গঠনের যে ডাক ড. মুহাম্মাদ ইকবাল দিয়েছিলেন, মাওলানা আনসারীর ইসলামি জ্ঞানগর্ভ *The Qur'anic Foundations and Structure of Muslim Society* অনেকটা সেই আহ্বানে সাড়া দিয়েই লেখা।

প্রখ্যাত ইসলামি চিন্তাবিদ, শিক্ষাবিদ, সুফী শায়খ এবং ভ্রমণরত ধর্মপ্রচারক মাওলানা আব্দুল আলীম সিদ্দিকী (রঃ)-র কাছ থেকে তিনি আধ্যাত্মিক দীক্ষা এবং প্রশিক্ষণ লাভ করেন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এই যে তিনি ড. ইকবাল ও মাওলানা সিদ্দিকী, উভয়ের কাছ থেকে সুফীতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করেছিলেন, এবং পরবর্তীতে নিজের ছাত্রদের কাছে তা হস্তান্তর করেছিলেন।

সুফী জ্ঞানতত্ত্ব অনুধাবন করে যখন **সত্য**কে গ্রহণ করা হয় (অর্থাৎ ইসলামকে গ্রহণ করা হয়) এবং মহান আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বস্ততা ও পরম আনুগত্য সহকারে জীবনযাপন করা হয়, তখন সেই **সত্য** তার হৃদয়ে আসন লাভ করে (এবং ইসলাম ক্রমে ঈমানে পরিণত হয়)। হাদীসে কুদ্‌সীতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মহান আল্লাহ্ বলেন:

أن السماوات والأرض لم تُطقْ أن تحملني، وضِقنَ من أن تسعني، ووسعني قلب المؤمن الوادع اللين

আমার আকাশ মন্ডলী ও আমার পৃথিবী অত্যন্ত ক্ষুদ্র বিধায় আমাকে ধারণ করতে পারে না। কিন্তু আমার অনুগত বান্দার অন্তর বা হৃদয় আমাকে ধারণ করতে সক্ষম।

[আয্-যুহদ, আহমাদ ইবনে হাম্বল]

হৃদয়ে **সত্যের** প্রবেশ বলতে কি বুঝায় এই হাদীসে তা নিখুঁত ভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

যখন **সত্য** হৃদয়ে প্রবেশ করে, তখন এক ঐশ্বরিক আলো (নুরুল্লাহ) হৃদয়ে প্রবেশ করে। তখন সেই আলো একজন মু'মিনকে কোন কিছুর আপাত বা **বাহ্যিক** চেহারার সীমানা পেরিয়ে, তার অন্তর্নিহিত **সত্যিকার অবস্থা** কী তা অনুধাবন করার মতো নিরীক্ষণ ক্ষমতা ও আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টি দান করে। হৃদয়ে **সত্য** লালন করার এই পর্যায়ে, মু'মিন দু'টো চোখ দিয়ে দেখতে আরম্ভ করে – বাহ্যিক চোখ ও হৃদয়ের চোখ – (উল্লেখ্য যে, ভন্ড মসীহ দাজ্জাল কেবল এক চোখ দিয়ে দেখে – বাহ্যিক চোখ দিয়ে)। একজন মু'মিন যখন **জিহাদে** বা আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রামে লিপ্ত হন তখন তাঁর ঈমান পূর্ণতা লাভ করে এবং তিনি ইহসানের পর্যায়ে উন্নিত হবার গৌরব অর্জন করেন। এভাবেই অন্তরের ভিতরে আল্লাহ্‌র **নুর** প্রবেশ করানো হয়। সূরা আন্‌কাবুতে বলা হয়েছে,وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا *যারা আমার পথে সাধনায় আত্মনিয়োগ করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে পরিচালিত করব* (২৯:৬৯)। এই প্রক্রিয়াকেই **তাসাউফ** বলে আখ্যায়িত করা হয়। তবে একে **ইহসান** বলাই উত্তম।

মু'মিনের হৃদয় সত্যের প্রকৃত রূপকে নিরূপণ করতে পারে – সেই হৃদয়ের অন্তর্নিহিত আলোই প্রকৃত মু'মিনকে আল্লাহ্‌র নিদর্শনগুলিকে (আয়াতুল্লাহ) চিনতে ও বুঝতে সাহায্য করে। শুধু এভাবেই আজকের পৃথিবীকে সঠিক ভাবে জানা ও বুঝা সম্ভব। আজকের পৃথিবীর বাস্তবতা যারা বুঝতে পেরেছেন, তারা জানেন যে আমরা কিয়ামতের পূর্ববর্তী ফিতনার যুগে বসবাস করছি। (ইসলামের বিজয়ের মাধ্যমে ইতিহাসের সমাপ্তি ঘটবে আর এর মাধ্যমেই কিয়ামতের (ساعة) বা সা'আর প্রথম ধাপ আরম্ভ হবে এবং সমগ্র বস্তু জগতের ধ্বংসের মাধ্যমে তার শেষ পর্যায় অনুষ্ঠিত হবে। এই ধ্বংসের মাধ্যমে আজকের জগত নতুন এক জগতে পরিণত হবে)।

মাওলানা আনসারী তাঁর জীবনের শেষ দশ বছর (১৯৬৪-১৯৭৪) করাচীতে *Aleemiyah Institute of Islamic Studies* প্রতিষ্ঠার কাজে উৎসর্গ করেছিলেন। সেখানে তিনি ইসলামি জ্ঞানে বিজ্ঞ এক নতুন প্রজন্মের আলিম তৈরী করার সংগ্রাম করে যাচ্ছিলেন, যারা কুর'আন ও হাদীসের আলোকে আধুনিক যুগকে সঠিকভাবে বুঝার ব্যাপারে আধ্যাত্মিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক পর্যায়ে সক্ষম হবে। আর তারপরে, এই আধুনিক যুগ ইসলামের প্রতি যে বিশাল চ্যালেঞ্জ উপস্থাপন করেছে, তাও যথাযথভাবে মোকাবেলা করতে সক্ষম হবে। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলস্বরূপই ওয়েষ্ট ইন্ডিজের ট্রিনিডাড থেকে

ইমরান নযর হুসেইন, ড. ওয়াফি মুহাম্মাদ; দক্ষিণ আফ্রিকার ডার্বান থেকে ড. আবুল ফযল মুহসীন ইব্রাহীম, মরহুম ড. আব্বাস কাসিম, মুহাম্মাদ আলী খান এবং আরো অনেকে; ওয়েষ্ট ইন্ডিজের গায়ানা থেকে সিদ্দিক আহমাদ নাসির, রউফ জামান ও মুহাম্মাদ সাফী; ওয়েষ্ট ইন্ডিজের সুরেনাম থেকে আলী মুস্তফা; আফ্রিকার মরিশাস থেকে বাসির আহমাদ কিনো; এবং আরো অনেক আলিম ব্যক্তিত্ব *Aleemiyah Institute of Islamic Studies , Pakistan* থেকে ডিগ্রি নিয়ে বেরিয়ে আসেন।

আনসারী স্মরণিকা সিরিজ হচ্ছে নিম্নলিখিত পুস্তকসমূহের সমন্বয়, যার সবকটিই তাঁর ঐ সকল ছাত্রদের মধ্যে একজনের লেখা:

- Jerusalem in the Qur'ān – an Islamic View of the Destiny of Jerusalem;
- Sūrah al-Kahf: Text Translation and Modern Commentary;
- Sūrah al-Kahf and the Modern Age;
- The Religion of Abraham and the State of Israel – A View from the Qur'ān;
- Signs of the Last Day in the Modern Age;
- The Importance of the Prohibition of Ribā in Islām;
- The Prohibition of Ribā in the Qur'ān and Sunnah;
- Dreams in Islām – A Window to Truth and to the Heart;
- The Caliphate, the Hejāz, and the Saudi-Wahhabi Nation-State;
- The Strategic Significance of the Fast of Ramadan, and Isrā and Mi'rāj;
- One Jamā'at - One Amīr: The Organization of a Muslim Community in the Age of Fitan; and
- An Islamic View of Gog and Magog in the Modern World.

মাওলানা যে বৃক্ষ রোপন করেছিলেন, এই সিরিজের বইগুলি সেই বৃক্ষেরই আংশিক ফল। এই বইগুলিতে, আজকের পৃথিবীর বাস্তবতাকে বুঝার এবং সেটিকে সঠিকভাবে বর্ণনা করার চেষ্টা করা হয়েছে। আর সেই সঙ্গে এই পৃথিবীর অভূতপূর্ব চ্যালেঞ্জকে সঠিকভাবে মোকাবেলা করারও চেষ্টা করা হয়েছে। সেই চেষ্টা অবশ্যই সব সময় সমালোচনা ও মূল্যায়নের জন্যে উন্মুক্ত।

আনসারী স্মরণিকা সিরিজে নতুন আরো কয়েকটি বই অন্তর্ভূত হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে সূরা কাহাফ সিরিজের দু'টি বই। তৃতীয় একটি বই হলো "আধুনিক যুগে শেষ সময় বা কিয়ামতের আলামত" নিয়ে লিখিত রচনাসমূহের সংকলন। *An Islamic*

View of Gog and Magog in the Modern World বইটি হলো সূরা কাহাফ সিরিজের তৃতীয় বই এবং *Dajjāl the false Messiah or Anti-Christ* নামক বইটি হবে সূরা কাহাফ সিরিজের চতুর্থ এবং শেষ বই।

আনসারী স্মরণিকা সিরিজ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে যদি সেই মহান মাওলানার জীবনী তুলে ধরা না হয় এবং তাঁর চিন্তা ও দর্শনের মূল্যায়ন করা না হয়। আমরা তাঁর জীবন, কর্ম ও দর্শনকে তুলে ধরার কাজটি সম্পন্ন করার নিকটে এসে গেছি আর আমরা আশা করি মহান আল্লাহ্‌র রহমতে শীঘ্রই তা সম্পন্ন হবে, ইনশাআল্লাহ্‌।

পাকিস্তানে আলীমিয়া স্মরণিকা সিরিজ প্রতিষ্ঠা করে এবং প্রকাশ করে, মাওলানা আনসারী (রঃ) তাঁর নিজের দীক্ষাগুরু মাওলানা আবদুল আলীম সিদ্দিকী (রঃ)-এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেছিলেন। আনসারী স্মরণিকা সিরিজ সেই মহান ঐতিহ্যের পদাঙ্ক অনুসরণের এক বিনীত প্রচেষ্টা মাত্র।

ইমরান নযর হোসেন

www.islamfind.wordpress.com

দ্বিতীয় সংস্করণের মুখবন্ধ

ছোটখাটো কিছু ভুল সংশোধন ছাড়াও এই সংস্করণে আমরা ইয়াজুজ ও মাজুজকে নতুনভাবে চিহ্নিত করেছি। প্রথম সংস্করণে আমরা অনেকটা তাড়াহুড়া করে বলেছিলাম, ইয়াজুজ হলো ইঙ্গ-মার্কিন-ইসরাঈলি যায়োনিস্ট চক্র এবং মাজুজ হলো রুশ-নেতৃত্বাধীন চক্র।

এব্যাপারে আমাদের ধারণায় পরিবর্তন এসেছে।

আমরা মনে করি উভয় চক্রের মধ্যেই ইয়াজুজ ও মাজুজের উপস্থিতি রয়েছে, এবং তারাই এই দুই চক্রকে এক মহা-সংঘাতের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, যার পরিণতিতে এই বিশ্বশক্তি দু'টি একে অন্যকে ধ্বংস করবে।

তবে, এটাও মনে রাখতে হবে, এই মহা-সংঘাতের পরও ইয়াজুজ ও মাজুজ টিকে থাকবে। তারা তাদের সর্বশক্তি ব্যবহার করবে ইসরাঈলকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করতে, যেন ইসরাঈল পৃথিবীর নিয়ন্তা-রাষ্ট্রে পরিণত হতে পারে।

ইমরান নযর হোসেন

যুল-কা'আদা, ১৪৩৩ হিজরী
কুআলা লামপুর, মালয়শীয়া

www.islamfind.wordpress.com

www.islamfind.wordpress.com

প্রথম সংস্করণের মুখবন্ধ

ইয়াজুজ ও মাজুজ বিষয়টি নিয়ে আমার গবেষণা দীর্ঘ ১৫ বছরের অধিক। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে এ বিষয়টির উপর আমি বক্তৃতা প্রদান করেছি। কিন্তু আমার আলোচ্য বিষয়টি কখনোই মুসলিমদের আগ্রহের প্রাচীরে বিন্দু পরিমাণ ফাটল ধরায় নি। *Jerusalem in the Qur'ān – an Islamic View of the Destiny of Jerusalem* বইটিতে ইয়াজুজ ও মাজুজ সংক্রান্ত অধ্যায়ে এ ব্যাপারে ব্যাপক যুক্তি প্রদান করা হয়েছে (যে, তারা আসলে মুক্তি পেয়ে গেছে)। ফলশ্রুতিতে, অনেক পাঠকই বুঝতে সক্ষম হয়েছেন যে, আমরা এখন আসলেই ইয়াজুজ ও মাজুজ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত বিশ্বে বসবাস করছি। কুর'আনুল কারিমের সূরা আম্বিয়াতে (৯৫-৯৬) বর্ণিত শহরটি যে **জেরুযালেম** তা খুব সহজেই তারা বুঝতে সক্ষম হয়েছেন।

অমানবিকতা ও পাশবিকতার সাথে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে মুসলিমদের ধ্বংস করার লক্ষ্যে ইয়াজুজ ও মাজুজই যে আজ **ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ** চালাচ্ছে, এই বিষয়টি তারা উপলব্ধি করতে পেরেছেন। ফলস্বরূপ, ইসরাঈলের **রহস্যময় ঔপনিবেশিক এজেন্ডা**-কে তারা সহজেই বুঝতে পেরেছেন। নিজেদেরকে এবং তাদের পরিবারদেরকে ইয়াজুজ ও মাজুজের কালো থাবা থেকে বাঁচানোর জন্য তাদের অনেকেই আজ সংগ্রাম করে যাচ্ছেন। কারণ ইয়াজুজ ও মাজুজের সাথে মিলিত হওয়ার মানেই হলো, প্রতি ১০০০ জনের মধ্যে ৯৯৯ জন জাহান্নামীর সাথী হয়ে যাওয়া। (আল্লাহ্ আমাদের রক্ষা করুন, আমিন)!

ইয়াজুজ ও মাজুজরা যে মুক্তি পেয়েছে সম্মানিত আলিমদেরকে বিষয়টি বুঝাতে আমি আমার সাধ্যমত চেষ্টা করেছি, কিন্তু বরাবরের মতোই আমি ব্যর্থ হয়েছি, বিষয়টি আশ্চর্যের তো বটেই। তবে আমি আশা করছি যে, এই বইটি সে ব্যাপারে এক নতুন চেতনার উদ্রেক করবে। ইনশাআল্লাহ্।

বইটি আনসারী স্মরণিকা সিরিজের তৃতীয় বই। প্রথম বই দু'টির নাম যথাক্রমে, *Sūrah al-Kahf: Text Translation and Modern Commentary* ও *Sūrah al-Kahf and the Modern Age*। চতুর্থ ও শেষ বইটি হবে ভন্ড মসীহ দাজ্জালকে নিয়ে। ইনশাআল্লাহ্।

www.islamfind.wordpress.com

আমি ড. তাম্মাম আদীকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তাঁর মূল্যবান ভূমিকা এই বইটিকে আরো সমৃদ্ধ করেছে। আমি তাঁর এই পাণ্ডিত্যকে অভিনন্দন জানাই। মূলত তিনি দামেস্কে এমন এক পরিবারে জন্ম লাভ করেন যার সাথে মিলিত হয়েছে মহান খলীফা হযরত উমর (রাঃ)-র বংশের পবিত্র সম্পর্ক। কম্পিউটার সায়েন্সের উপর তাঁর *PhD* রয়েছে। আরবী ভাষায় দক্ষতা তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছেন। কুর'আনে ব্যবহৃত আরবী নিয়ে তিনি ব্যাপক গবেষণা করেছেন আর এর মাধ্যমে তিনি (আরবী) ভাষার এক নতুন তত্ত্ব আবিষ্কার করেছেন। শীঘ্রই তিনি *The Qur'ān and the Return of Jesus* নামক একটি বই লিখতে যাচ্ছেন।

আমি আমার বিনীত ও আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি মুহাম্মদ আলমগীর, ড. ইমরান চৌধুরী, ড. হাতিম, তারেক জামাল, সালমান আল-হাক্ব, এবং আমার স্ত্রী আয়েশাকে। ভুল সংশোধন, প্রুফ দেখা ইত্যাদি কাজে এরা আমাকে ব্যাপক সহায়তা করেছে। এদের সবাইকে মহান আল্লাহ্ তা'আলা রহমত দান করুন। আমিন!

ইমরান নযর হোসেন

সফর, ১৪৩০ হিজরী
ক্যারিবীয় দ্বীপপুঞ্জ, ট্রিনিডাড

ভূমিকা

ড. তাম্মাম আদী

বিশ্বব্যাপী আমরা আজ ধ্বংসের এক লীলাখেলা পর্যবেক্ষণ করছি। ধ্বংস ও তার প্রকৃতি জানা এবং এর সাথে আমাদের আচরণ কি হবে তা ঠিক করা আজ তাই খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাড়িয়েছে। ধর্মীয় নেতারা এর উত্তর দিতে ব্যস্ত। যারা সত্যকে আসলেই খুঁজে বেড়ায়, তারা যে ধর্ম এর যথাযথ উত্তর দিতে পারবে সেই ধর্মকে সহজেই মেনে নিবে।

বিশ্বব্যাপী এই ধ্বংসের প্রাথমিক কারণসমূহের দায়সারা উত্তর প্রদানের মাধ্যমে মুসলিম আলেমরা ইসলামকে এক্ষেত্রে খুব অসুবিধাজনক স্থানে ফেলে রেখেছে। এই আলেমরা বলে থাকে, ইয়াজুজ ও মাজুজ একটা ধ্বংসাত্মক শক্তি যাদের ব্যাপারে ভবিষ্যদ্‌বাণী করা হয়েছে, আর তারা তো এখনও প্রাচীরে বন্দি রয়েছে।

এই বিশ্বাস মুসলিমদেরকে একটা গাধায় পরিণত করেছে, খুঁটির ভেতরে উইপোকা বাসা বাঁধার কারণে ঘর ধ্বসে পড়তে যাচ্ছে অথচ প্রতিরাতে সে কিনা বিছানায় ঘুমাতে গিয়ে আল্লাহ্‌কে ধন্যবাদ জানায় কারণ পোকামাকড় পরিদর্শক তো তার দেয়ালে উইপোকার কোন আক্রমণ খুঁজে পায় নি। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কুর'আন সংরক্ষণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, হাদীস কিংবা তাফসীর সংরক্ষণের প্রতিশ্রুতি তো তিনি দেননি। ইয়াজুজ ও মাজুজ সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণার মূল উৎস দু'টি:

১. তাফসীরের ভুল ভ্রান্তি এবং ত্রুটিবিচ্যুতিকে মেনে নেয়া।
২. মিথ্যা বা জাল হাদীস গ্রহণ করা অথবা যে হাদীস কুর'আনের বিপরীত তার ভুল ব্যাখ্যা করা।

হাদীস হবে কুর'আন ভিত্তিক, এই মূলনীতির মাধ্যমে উপরে উল্লিখিত দ্বিতীয় সমস্যার সমাধান করা যায়। শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রঃ) কুর'আন ও হাদীসের একজন অতুলনীয় আলিম ছিলেন। তিনি সম্পূর্ণ কুর'আন ও অগণিত হাদীস মুখস্থ করেছিলেন এবং তাৎক্ষণিকভাবে যে কোন বিষয়ে কুর'আনের সমস্ত আয়াত ও হাদীস নিয়ে আসতে পারতেন। উপর্যুক্ত মূলনীতির ভিত্তিতে তিনি ফতোয়া দিতেন এবং বলা হয়ে থাকে তিনি প্রতিটি সহীহ হাদীস উল্লেখ করতেন আর সেই সাথে কুর'আনের

কোন্ আয়াত সেই হাদীসটির ভিত্তি তা বলে দিতেন। নবী (সাঃ) যখন কোন সিদ্ধান্ত দিতেন তখন তিনি এর সমর্থনে কুর'আনের আয়াত উল্লেখ করতেন ঠিক একইভাবে সাহাবা (রাঃ)-গণও একই কাজ করতেন। অন্যদিকে, ইয়াজুজ ও মাজুজ সম্পর্কে তাফসীরের ভুল ভ্রান্তি এবং ত্রুটিবিচ্যুতি এতটাই প্রকট যে, এমন একটি তাফসীর গ্রন্থ খুঁজে পাওয়া যাবেনা যেখানে সামান্যতম সম্ভাবনাও পোষণ করা হয়েছে যে, ইয়াজুজ ও মাজুজ মুক্তি পেয়েছে। তাই কুর'আন ইয়াজুজ ও মাজুজ সম্পর্কে কি বলেছে সেটা পর্যালোচনা করে দেখাটাই সঠিক কাজ হবে। আর ঠিক এ কাজটাই করেছেন শায়খ ইমরান হোসেন।

ইয়াজুজ ও মাজুজের মুক্তি এখনো হয়নি এই বিশ্বাসটিকে নতুন করে ভেবে দেখার জন্য শায়খ ইমরান হোসেন আলিমদেরকে চ্যালেঞ্জ করেছেন। বাহ্যত কিছু হাদীস দ্বারা এটি মনে হলেও এটি কিন্তু আসলে কুর'আন বিরোধী। ইয়াজুজ ও মাজুজের মুক্তি আরো আগে হয়েছে, একথা তিনি জোর দিয়ে বলেছেন। সমসাময়িক তথ্য উপাত্ত, ঐতিহাসিক বাস্তবতা এবং কুর'আনের আয়াতের মাধ্যমে তিনি এ কাজটি সম্পন্ন করেছেন।

আমি ২৫ বছর যাবত স্বাধীনভাবে কুর'আনের অর্থের প্রকৃতি (কুর'আনিয় শব্দার্থবিদ্যা) নিয়ে গবেষণায় মগ্ন রয়েছি। আমার প্রাপ্ত মূলনীতিগুলি এই বইয়ের তৃতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত শায়খ ইমরান হোসেনের কর্মপদ্ধতিকে সমর্থন করে। কুর'আন বিশ্লেষণের এক বিশেষ প্রক্রিয়া হলো **তাবীল**। **তাবীল** ব্যবহারের মাধ্যমে বিশ্বের ঘটনাবলীকে বিচার করতে হবে। **তাবীল** মূলত একপ্রকার সামঞ্জস্যকরণ পদ্ধতি, যে প্রক্রিয়ায় কোন আয়াতের অর্থকে সঠিকভাবে ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক তথ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা হয়। অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন একজন আলিমের মূল্যবান **তাবীল** শুধুমাত্র অর্থ ও তথ্যের উপর নির্ভর করে না, বরঞ্চ এরই সাথে আল্লাহ্ প্রদত্ত বিশেষ **নুরের** সাহায্যেও গঠিত হয় (এরূপ একজন আলিম হলেন শায়খ ইমরান হোসেন, আর এক্ষেত্রে তিনি বড়ই ভাগ্যবান কেননা আল্লাহ্র এই **নুর** তিনি সময় সময় লাভ করেছেন)।

কতগুলি ক্ষেত্রে শায়খ ইমরান হোসেন বেশ সফলভাবে **রূপক তাবীল** করেছেন, বিশেষ করে কিছু আধ্যাত্মিক বিষয়ে, যেখানে পরীক্ষা করে দেখার মত বাস্তব জগতের কোন তথ্য আমাদের হাতে নেই।

এই পর্যায়ে আমি **তাবীলের** মূলনীতি ও কুর'আনের শব্দার্থের উপর কিছু কথা বলবো। এটা ইয়াজুজ ও মাজুজ ও তাদের আচরণের ধরন সম্পর্কিত কুর'আনিক

আয়াতের বিশুদ্ধ **তাবীল** করতে সাহায্য করবে। আমি সেসব মূলনীতিকে এখানে ব্যবহার করবো। আমার এই **তাবীল**গুলি ব্যাপকভাবে শায়খ ইমরান হোসেনের নিজস্ব **তাবীলে**র অনুরূপ। উভয় প্রকার **তাবীল** আমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছে যে, বাস্তবতাকে বিচারের জন্যে আমরা যখন কুর'আনের আয়াতকে প্রয়োগ করবো, তখন আমরা এই চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে আসতে বাধ্য হবো যে, **ইয়াজুজ ও মাজুজের মুক্তি অনেক আগেই হয়ে গেছে**।

তাবীলঃ কুর'আনিক শব্দার্থবিদ্যার মূলনীতিসমূহ

কুর'আনের ভাষাকে সঠিকভাবে বুঝতে হলে মনে রাখতে হবে, আল্লাহ্ তা'আলা আরবী ভাষাকে সৃষ্টি করেছেন ও সেই সাথে তিনি তাকে বিন্যস্ত করেছেন। আরবরা এটি করেনি। একারণেই আল্লাহ্ তা'আলার নাযিল করা গ্রন্থের মতো আরেকটি গ্রন্থ আনা তো দূরে থাক, ছোট যে কোন সূরার মতো একটি সূরা পর্যন্ত আরবরা রচনা করতে পারেনি। আল্লাহ্ তা'আলা কুর'আনে যেভাবে আরবীকে ব্যবহার করেছেন তা প্রায়ই আরবদের আরবী থেকে ভিন্ন। আরবরা প্রায়ই তাদের মাতৃভাষা আরবীতে ভুল করতো এবং প্রায়শই তারা আরবী পরিভাষাগুলিকে ভুল বুঝতো। এমনকি আরবের নামকরা কবি থেকে আরম্ভ করে, অভিধানপ্রণেতা, তাফসীরকারকরাও প্রায়ই আরবীভাষা ভুল বুঝতেন এবং ভুলভাবে প্রয়োগ করতেন। অন্যদিকে আরবীর ব্যবহারে আল্লাহ্ তা'আলা হলেন একেবারে নিখুঁত, প্রাঞ্জল ও সুস্পষ্ট।

وَهَٰذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِينٌ

এই কুর'আন সুস্পষ্ট আরবী ভাষায় (নাযিল হয়েছে)।

[নাহ্‌ল ১৬:১০৩]

ফলস্বরূপ কুর'আনের অর্থ, শব্দার্থ ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে আমাদেরকে কেবলমাত্র কুর'আনের উপরই নির্ভর করতে হবে। বহু বছর গবেষণার ফলে আমি কুর'আনিক শব্দার্থের একটি তত্ত্ব বের করতে সক্ষম হয়েছি।

আমি সাম্প্রতিক সময়ে অবগত হয়েছি যে, ড. মাওলানা ফজলুর রহমান আনসারী (রঃ) (শায়খ ইমরান হোসেনের শিক্ষক) বিশ্বাস করতেন যে, কুর'আনের অর্থ গঠনের একটা নিজস্ব পদ্ধতি রয়েছে যেটা যুগপৎভাবে অন্য সকল আয়াতের সাথে সম্পর্ক রাখে আর এগুলির ব্যাখ্যা প্রদান করে। আমার অভিজ্ঞতাও ঠিক তাই।

বিচ্ছিন্নভাবে একটা শব্দ একাধিক অর্থ প্রকাশ করতে পারে বা ধারণ করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, ضَرَبَ **দ্বারাবা** শব্দটির অর্থ হচ্ছে আঘাত করা, প্রমাণ উপস্থাপন করা, কোন কিছুকে চাপিয়ে দেওয়া, ভ্রমণ করা ইত্যাদি। প্রত্যেকটি অর্থ আলাদা আলাদা একটি সূত্রের মতো। বাস্তব জীবনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন আকারে এগুলি ব্যবহৃত হয় (যেমন, লাঠি দ্বারা পাহাড়ে আঘাত করো, ফেরেশতারা তাদের মুখে আঘাত করলো)। **দ্বৈত অর্থ** প্রকাশের এই সম্ভাবনা (একাধিক অর্থ এবং প্রত্যেকটি অর্থের একাধিক প্রয়োগপদ্ধতি) আসলে মানবীয় জ্ঞানের একটা ভিত্তি। প্রত্যেকটি ভাষাতেই এটা রয়েছে। এটা মানব মনকে স্বাধীনভাবে অর্থগ্রহণ, আবিষ্কার ও গবেষণার দিকে উৎসাহিত করে। হযরত আদম (আঃ)-কে আল্লাহ্ তা'আলা এই ক্ষমতা প্রদান করেছিলেন। এই ক্ষমতার জন্যই আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশতাদেরকে আদেশ দেন তাঁকে সিজদাহ করার জন্যে।

একটি শব্দকে (উদাহরণস্বরূপ, ضَرَبَ দ্বারাবা) ব্যবহার উপযোগী করার জন্যে দু'টি কাজ করতে হয়:

১. প্রাসঙ্গিক স্থানে শব্দটিকে রাখা, যেন একাধিক অর্থের সম্ভাবনা কমে যায়। শব্দটিকে আমরা কোন্ বাক্যে স্থাপন করছি, যেমন وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا (সে উপমার মাধ্যমে আমাদের নিকটে প্রমাণ উপস্থাপন করল – ইয়াসিন ৩৬:৭৮), প্রসঙ্গটিই আমাদের বলে দিচ্ছে আমরা এখানে বড়জোর একটি অর্থ বাছাই করতে পারবো। কিন্তু এই পর্যায়ে শব্দটির একটি অর্থের ভিতরেই অনেক ব্যাপকতা থাকতে পারে। ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রায়ই এটি ভাবার্থক হয়ে থাকে।

২. অর্থকে বাস্তবতার সাথে সম্পর্কযুক্ত করা (তাবীল করা)। আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহে কুর'আনের অর্থকে বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যেতে পারে। উপর্যুক্ত আয়াতের বাকি অংশ, وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ (অথচ তাকে কিভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে সেটা ভুলে গেল এবং বললো, "কে এই শুষ্ক হাড় সমূহে জীবন দিবে?")। বাস্তব ঘটনার সাথে মিল থাকার কারণে অর্থটি এখানে সঠিক হয়েছে। বাস্তবতাকে উপলব্ধি করার জন্যে আমরা এখন এই পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারি (যে ব্যক্তি তার নিজ সৃষ্টিকে ভুলে যায়, তার কাছে শুষ্ক হাড়ে জীবন দেয়ার মাধ্যমে প্রমাণ উপস্থাপন করা হচ্ছে)। অতঃপর এই অর্থকে উপলব্ধি করতে হবে (অর্থাৎ উপমাকে বুঝতে হবে এবং সেটা ভুল কিনা তা পর্যবেক্ষণ করতে হবে)। বাস্তবতা ও অর্থগঠনের পদ্ধতির মধ্যাকার এই সম্পর্ককে বলা হয় পদ্ধতি উপলব্ধিকরণ প্রক্রিয়া বা তাবীল।

'অর্থপ্রকাশের পদ্ধতি' সাদৃশ্যপূর্ণ তাবীল করতে সহায়তা করে। এই পদ্ধতিই হলো, চিন্তা, গবেষণা ও ফিকাহ শাস্ত্রের অন্যতম হাতিয়ার। বাস্তবে বিভিন্ন অবস্থার প্রেক্ষিতে একই অর্থপ্রকাশ পদ্ধতির আলাদা আলাদা তাবীল হতে পারে। এটি পুরোপুরি নির্ভর করছে, আল্লাহ্ তা'আলার কাছ থেকে আমরা কিরূপ নির্দেশনা পাচ্ছি তার উপর।

প্রেক্ষাপটের উপর নির্ভর করছে রূপক তাবীলের প্রয়োজনীয়তা। এর মানে হলো, কোন কিছুর বাহ্যিক অর্থকে *ভিন্ন কোন বাস্তব ঘটনার সাথে মিলিয়ে দেখানো।* স্বপ্ন ও আধ্যাত্মিক বিষয়ের অর্থ প্রায়ই রূপকভাবে বুঝতে হয়। এর প্রধান কারণ হলো, আধ্যাত্মিক বাস্তবতা জাগতিক বাস্তবতা থেকে ভিন্ন হয়ে থাকে। জাগতিক বাস্তবতা প্রতারণাময় আর এটা চূড়ান্ত নয় (**মাছালুল গুরুর** বা ভ্রান্ত অভিজ্ঞতা) সেজন্য *রূপক তাবীল* অতীব প্রয়োজনীয়। আখিরাতেই কেবল বাস্তবতা হবে পরম ও চূড়ান্ত সত্য।

আল্লাহ্ তা'আলা কখনো কখনো *অর্থগঠনের পদ্ধতি ও বাস্তবতার* মধ্যে একটি প্রাচীর রেখে দিয়েছেন। যেমন: এই আয়াতটি فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا (কাহাফ ১৮:১১) অর্থাৎ, "আমরা তাদেরকে গুহায় বহু বছর ঘুম পাড়িয়ে দিলাম তাদের কানে কোন কিছু ***দ্বারাবা-র*** মাধ্যমে"। এখানে (দ্বারাবার অর্থ পরিষ্কার না হওয়ায়) *অর্থপ্রকাশের পদ্ধতির* সাহায্যে তাবীল করা অসম্ভব। আল্লাহ্ তা'আলা সে সমস্ত যুবকদের কানকে কি করেছেন আমাদেরকে তা বলা হয়নি। ফলে আমরা একদিকে **অর্থগঠনের পদ্ধতি** এবং অপরদিকে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের কানের ব্যাপারে আসলে কি করেছেন সেই ***বাস্তবতার*** সাথে কোন রকমের যোগসূত্র স্থাপন করতে পারছি না। অতএব, فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ, কথাটির অর্থ, আমরা আবরণ লাগিয়ে দিলাম, ছিলমোহর লাগালাম, বা তাদের কানকে কোন কিছু দ্বারা আচ্ছাদিত করলাম, এগুলির যে কোনটি হতে পারে। এই জাতীয় আয়াতকে বলা হয় ***মুতাশাবিহাত***। এই সমস্ত আয়াতের ব্যাখ্যা আল্লাহ্ তা'আলাই ভাল জানেন। বক্র মনের মানুষেরা যখন এই সকল আয়াতের অনুসরণ করে, তখন তারা আখিরাতের বিষয়াদির উপর আন্দাজ বা অনুমান করে থাকে, অর্থাৎ তারা অস্বাভাবিক তাবীল করে থাকে। এর মাধ্যমে তারা নানা রহস্যময় ও উদ্ভট ধারণার আবির্ভাব ঘটায় অথবা মিথ্যা নবুওতের দাবী পর্যন্ত করে (যেমন গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী)।

কুর'আনে ব্যবহৃত গুরুত্বপূর্ণ শব্দগুলির এক বা একাধিক স্থানে (ঐ পরিভাষা সম্বলিত আয়াত) প্রয়োগকে লক্ষ্য করে আমরা শব্দগুলির নির্দিষ্ট অর্থ বের করতে পারি, এবং এই প্রক্রিয়ায় আমরা ***অর্থপ্রকাশ পদ্ধতি*** ও **বাস্তবতা** উভয়ের সাথে সম্পর্ক গড়ে

নিতে পারি। ফলে তাবীল করাটা সম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। "ফ্যাসাদ কি?" শিরোনামের উপ-অধ্যায়ে আমরা এই বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে যাচ্ছি।

কোন আয়াতের ক্ষেত্রে যদি সকল প্রকারের তাবীল (সাদৃশ্যময় বা রূপক তাবীল) করাটা সম্ভবপর হয় তবেই আয়াতটিকে ***মুহকাম*** বলা হবে। কোন কোন মুহকাম আয়াতের ***অর্থপ্রকাশ পদ্ধতি*** আমাদেরকে সাদৃশ্যময় তাবীল করতে সহায়তা করে এবং সাথে সাথে আয়াতের সাথে সম্পৃক্ত 'সাদৃশ্যময় কারণসমূহ' বের করতে সাহায্য করে। কোন কোন মুহকাম আয়াতের কেবল রূপক তাবীলই সম্ভব।

মুহকাম আয়াতসমূহই কুর'আনের ভিত্তি (উম্মুল কিতাব)। আল্লাহ্ তা'আলা কুর'আন সংরক্ষণের যে ওয়াদা করেছেন এগুলি তারই অন্তর্গত। এগুলি কুর'আনের মূল কাঠামো, অর্থ বুঝার মাধ্যম। কেননা কুর'আনের গুরুত্বপূর্ণ বিধিনিষেধ তথা সতর্কবাণীর তাবীলকে তো এগুলিই সংরক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। আল্লাহ্ তা'আলার নাযিল করা বাস্তবতাকে তাঁর আলো বা **নুরের** মাধ্যমে বুঝতে, এবং কুর'আনের মুহকাম আয়াতসমূহকে নিজ নিজ মেধানুসারে বাস্তবের সাথে সম্পৃক্ত করে সেগুলির তাবীল করতে, আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সকলকে উৎসাহিত করেন, শুধুমাত্র আলিমদেরকে উৎসাহিত করেন তা নয়। এটি কেবল ফিকাহের কিতাবে উল্লেখিত ঘটনাসমূহকে আওতাভূক্ত করে তা নয় বরং বাস্তবের সকল ঘটনা এর অন্তর্ভূত।

মুহকাম আয়াতগুলিকে রাজনীতি ও সামাজিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার কারণে অনেক আলিমই মুসলিম শাসকদের দ্বারা নির্যাতিত ও নিপীড়িত হয়েছেন। এরূপ ঘটনার আরম্ভ হয় উমাইয়্যাদের খিলাফত আমলে। এই প্রেক্ষিতে, তাফসীরসমূহকে তাদের মর্জি অনুসারে কাটছাট করা হতো।

ইয়াজুজ ও মাজুজের মুক্তি যদি ইসলামের ঠিক আগে হতো, তাহলে তারা কি দ্রুত মুসলিমদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করতো না? নবী (সাঃ) আমাদেরকে বলেছেন: উমর (রাঃ) হলেন ভয়ংকর ফিতনা (বড় রকমের পরীক্ষা, যেমন ইয়াজুজ ও মাজুজ) এবং মুসলিমদের মাঝে বন্ধ দরজার ন্যায়। এই দরজা তো ভেঙ্গে যাবে, যেন আগের মতো আবার বন্ধ না হয়ে যায়। ইয়াজুজ ও মাজুজরা কি সেই বন্ধ দরজাকে ভেঙ্গে ফেলে নি? ইসলামি সাহিত্য ও জ্ঞানবিজ্ঞানে ইয়াজুজ ও মাজুজকে নিয়ে আলোচনা পর্যালোচনাকে তারা কি সীমাবদ্ধ করে ফেলেনি, ঠিক যেমনটি, যায়নিস্টরা আমেরিকান মিডিয়াতে তাদের বিষয় উল্লেখ করাকে অ্যান্টি-সেমেটিক বলে দাবী করে?

ইয়াজুজ ও মাজুজঃ সেই ধ্বংসাত্মক জনগোষ্ঠী যারা এক অনন্য পরাশক্তিতে পরিণত হতে সক্ষম

যুলক্বার্নাইনের রাজ্য ছিল অপ্রতিরোধ্য ক্ষমতা সম্পন্ন এবং সেই সাথে তা ছিল সীমাহীন প্রযুক্তিতে ভরপুর (১৮:৮৪)। পূর্ব পশ্চিমের সবগুলি জাতিকে তিনি পরাজিত করেন এবং পাপাচারীদের শায়েস্তা করেন। সেই সাথে তিনি ন্যায়পরায়ণদের পুরস্কৃত করেন (কাহাফ ১৮:৮৫-৯১)। দুই পাহাড়ের বেষ্টনীপূর্ণ (সাদ্দান্) একটি স্থানে পৌঁছালে, সেখানের অধিবাসীরা সাহায্যের জন্য তাঁর নিকটে আকুল আবেদন জানায়।

قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا

তারা বললো, "হে যুলক্বার্নাইন! ইয়াজুজ ও মাজুজ জাতি পৃথিবীতে ব্যাপক ধ্বংস সাধন করছে (বিশ্বব্যাপী ধ্বংস সাধন, মুফসিদুনা ফিল আরদ্ব) আমরা কি আপনাকে চাঁদা দিবো যাতে আপনি আমাদের ও তাদের মাঝে {যা দুই পাহাড়ের বেষ্টনীর (*সাদ্দান*) মধ্য দিয়ে অতিক্রম করছে এবং সম্পূর্ণ প্রাচীররূপে ছিলনা} পরিবর্তন করে (তাজ'আলা) দিবেন একটা (সম্পূর্ণ) প্রাচীরে (*সাদ্দান*, একটা প্রাচীর যা অতিক্রম করা যায়না)।"

[কাহাফ ১৮:৯৪]

অনেকেই হয়তো ভাবতে পারেন, অন্যান্য অবাধ্য জাতির ন্যায় যুলক্বার্নাইন ইয়াজুজ ও মাজুজকে পরাজিত করতে পারতেন এবং তাদেরকে অন্যান্য অবাধ্য জাতির ন্যায় শাস্তি প্রদান করতে পারতেন। (তিনি তা না করে) বরঞ্চ পাহাড়দ্বয়কে একটা প্রাচীরে পরিণত করে দিলেন (সূরা কাহাফ ১৮:৯৫)। এর একমাত্র কারণ হলো, তিনি জানতেন আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ছিল যে, ইয়াজুজ ও মাজুজকে কোন মানুষ ধ্বংস করতে পারবে না, এমনকি তাঁর মত প্রযুক্তিতে উন্নত পরাশক্তিও না। এটাই প্রমাণ করছে যে, ইয়াজুজ ও মাজুজ সমগ্র বিশ্বের একমাত্র পরাশক্তিতে পরিণত হতে সক্ষম। চতুর্থ অধ্যায়ে শায়খ ইমরান হোসেন ইয়াজুজ ও মাজুজের বিভিন্ন বৈশিষ্ট সূচারুভাবে আলোচনা করেছেন।

আর-রাদ্‌মঃ ইয়াজুজ ও মাজুজের প্রাচীর; যা যুলক্বার্নাইন দু'টি পাহাড়ের মধ্যকার গিরিখাতকে বন্ধ করার জন্য তৈরী করেছিলেন

ইয়াজুজ ও মাজুজ পাহাড় দু'টির মধ্যখান দিয়ে যাতায়াত করত, যেটা অনেক উঁচু ছিল আর দেখতে অনেকটা প্রচীরের মতো (কাহাফ:৯৩) আর এই গিরিপথের অপর প্রান্তের প্রতিবেশীদেরকে তারা আক্রমণ করতো।

আক্রান্ত লোকেরা যুলক্বার্নাইনকে ইয়াজুজ ও মাজুজ ও তাদের মাঝের (বাইনানা ওয়া বাইনাহুম, একটি পাহাড়ী অঞ্চল যার মাঝদিয়ে অতিক্রমণের জন্য একটি ফাটল বা গিরিপথ রয়েছে) গিরিপথটিতে একটি মজবুত প্রাচীর (সাদ্দান) তৈরী করে দিতে অনুরোধ করে। তিনি উত্তরে বললেন, أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا অর্থাৎ 'আমি তোমাদের ও তাদের মাঝে একটি প্রলেপ বা তালি নির্মাণ করবো'। যুলক্বার্নাইন বের হবার পথটিকে গলিত লোহা ও সেটার উপর উত্তপ্ত তামা প্রবাহিত করে গিরিপথটিকে বন্ধ করে দেন।

ইয়াজুজ ও মাজুজের প্রাচীর দু'টি পাহাড় ও তাদের মধ্যাকার একটি ফাটল বা গিরিপথ নিয়ে গঠিত, যেটা যুলক্বার্নাইন কর্তৃক প্রলেপ (আল–রাদ্‌ম) প্রাপ্ত হয়।

যদি কোন ব্যক্তি তালি মারা জুতা পরিধান করে তাকে আমরা বলবো, সে রাদ্‌মান পরিধান করেছে (তালি বা প্রলেপযুক্ত জিনিস)। أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا অর্থাৎ আমি তোমাদের ও তাদের মাঝে একটি প্রলেপ বা তালি নির্মাণ করব। **রাদ্‌ম** কেবলমাত্র বাঁধ বা প্রাচীর হিসেবে ব্যবহৃত হয় এটা মনে করাটা ভুল। ব্যাকরণগত অবাস্তবতাটাই এ সমস্ত গবেষকদের এবং অন্যান্যদেরকে এই ভুলে পতিত করেছে। উপরের এই ভুল সংশোধন আমাদেরকে সঠিকভাবে তাবীল করতে সাহায্য করবে।

পঞ্চম অধ্যায়ে, শায়খ ইমরান হোসেন সূরা কাহাফের (৯৩-৯৭) আয়াতের তাবীলের মাধ্যমে **রাদ্‌ম**-এর ভৌগোলিক সীমানা চিহ্নিত করেছেন। প্রাচীরসদৃশ পাহাড় দু'টি ককেশাস পার্বত্য অঞ্চলের পূর্ব ও পশ্চিম অংশে অবস্থিত, যা **ড্যারেল গর্জ** নামক একটি সংকীর্ণ গিরিপথ দ্বারা আলাদা হয়েছে। ককেশাস পার্বত্য অঞ্চলটি পশ্চিমে কৃষ্ণসাগর থেকে পূর্বে কাস্পিয়ান সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল এলাকা।

ইসলাম আসার আগে ইয়াজুজ ও মাজুজের প্রাচীরে একটি বড় ফাটল তৈরী হয়ঃ কাস্পিয়ান সাগর সরে যাওয়ার কারণে পাহাড়ী উপকূলীয় এলাকা উন্মুক্ত হয়ে যায়

আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেছেন ইয়াজুজ ও মাজুজ এই প্রলেপযুক্ত প্রাচীরের উপর দিয়ে আসতে পারবে না, আর না তারা এটি ভাঙতে সক্ষম হবে (কাহাফ ১৮:৯৭)। যুলক্বার্নাইন জানতেন এই প্রাচীর তাদেরকে ক্ষণস্থায়ী সুরক্ষা প্রদান করবে। আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে তিনি ঘোষণা করেন, "এটি (আল-রাদ্‌ম, প্রলেপকৃত পাহাড়ী বেস্টনী) আমার প্রতিপালকের করুণা, কিন্তু যখন আমার প্রতিপালকের **প্রতিশ্রুতি** আসবে তখন তিনি এটিকে **দাক্কায়** {দাক্কা = পাহাড়ী এলাকা, ধ্বংসস্তুপ (কাহাফ ১৮:৯৮)} পরিণত করবেন ।

আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক নবী রাসূলকে সর্বশেষ বাণীসহ (অর্থাৎ কুর'আনসহ) সর্বশেষ নবীর আগমনের **প্রতিশ্রুতি** দিয়েছিলেন। অনেক ধর্মগ্রন্থে (যেমন তাওরাতে) এটিকে **প্রতিশ্রুতি** হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। যুলক্বার্নাইন যে **প্রতিশ্রুতি**র কথা বললেন সেটা হলো, ইসলাম। নবী (সাঃ)-এর জন্মের কিছুকাল আগে মোটামুটি ৫৫০ খ্রিস্টাব্দে ভৌগোলিক কারণে, কাস্পিয়ান সাগর কিছুটা সরে যায় আর এতে ককেশাস পার্বত্য অঞ্চলের পুব দিকের শেষভাগে একটি পাহাড়ী উপকূলীয় এলাকা উন্মুক্ত হয়ে পড়ে। ইয়াজুজ ও মাজুজ এই অঞ্চল দিয়ে পারস্যদেশ আক্রমণ করতো। খলীফা উমর (রাঃ) এই অঞ্চলেই ইয়াজুজ ও মাজুজের বিরুদ্ধে সেনাশিবির স্থাপন করেছিলেন।

এই **প্রতিশ্রুতি** যে ইসলাম তা অনেক হাদীসের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে, যেখানে সতর্কবাণী পেশ করা হয়েছে যে, আরবরা হবে ধ্বংসের প্রধান লক্ষ্যবস্তু (ওয়াইলুল লিল আরাব)। কারণ ইয়াজুজ ও মাজুজের রাদ্‌মে (প্রলেপকৃত প্রাচীরে) একটা ছিদ্র উন্মুক্ত হয়ে গেছে। নবী (সাঃ) অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়েন আর সেই ছিদ্রের পরিমাণ ছিল: ৯০ একক সম্ভবত ৯০ ফারসাক (১ ফারসাক = ৩.৫ মাইল)। আরবদেরকে ইয়াজুজ ও মাজুজের ধ্বংসাত্মক তরঙ্গে ভাসিয়ে নিতে কেবল এই পরিমাণটাই যথেষ্ট ছিল। "এবং সেই দিন (যখন প্রাচীরটি উন্মুক্ত হবে) আমি তাদের একে অপরকে মিশিয়ে দিব তরঙ্গের মতো" (কাহাফ ১৮:৯৯)।

এছাড়াও ইয়াজুজ ও মাজুজের "প্রত্যেক পাহাড় থেকে বের হয়ে আসা" হিসেবে مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে পাহাড় (হাদাব) শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, ফলে **দাক্কা** শব্দটির অর্থ যে **পাহাড়ী এলাকা** হবে, এই আয়াতটি আমাদেরকে তা বেছে নিতে দারুনভাবে সহায়তা করছে। এই প্রশস্ত এলাকাটি সাগরের তলায় থাকার কারণে এর গুরুত্ব ছিল না। পরবর্তীতে সাগর সরে যায় এবং সেখানে **দারিয়াল গর্জ** নামক সংকীর্ণ গিরিপথের প্রকাশ ঘটে।

হাদীসে ব্যবহৃত এ সব পরিভাষার কারণে পূর্বযুগের মুসলিমরা ইয়াজুজ ও মাজুজকে ***আল-তুর্ক*** হিসেবে বিবেচনা করতো। তাদের পূর্বপুরুষদের নাম ছিল **তুর্ক**। বর্তমান যুগের তুর্কিদের সাথে এটিকে মিলিয়ে কেউ যেন দ্বিধাগ্রস্থ না হয়।

ইয়াজুজ ও মাজুজের যামানা

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন: "এবং ***সেই দিন*** আমি তাদের একে অপরকে মিশিয়ে দেব তরঙ্গের মতো" (কাহাফ ১৮:৯৯)। তিনি এখানে ***সেই দিন*** বলতে কি বুঝিয়েছেন?

আল্লাহ্ তা'আলার নিকটে একদিন (ইয়াওম) হলো, একটি ঐশ্বরিক দিন যা ২৪ ঘন্টার নয় বরং তা হাজার বা তারও বেশি চন্দ্রবর্ষের সমান। ঐশ্বরিক দিনের বিভিন্ন পরিমাণ রয়েছে, তবে সেটা অন্ততপক্ষে ১০০০ চন্দ্রবর্ষের সমান হবে:

وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ

আর তোমার রবের নিকট নিশ্চয় এক দিন তোমাদের গণনায় হাজার বছরের সমান।

[হাজ্জ ২২:৪৭]

তৃতীয় অধ্যায়ে শায়খ ইমরান হোসেন বিভিন্ন ঐশ্বরিক দিন নিয়ে আলোচনা করেছেন। কুর'আন তিনটি বিশেষ ঐশ্বরিক দিন নিয়ে আলোচনা করেছে।

১. একটি ঐশ্বরিক দিন ৫০,০০০ চন্দ্রবর্ষের সমান। যে সময়টিতে সকল ফেরেশতারা মহান আল্লাহ্ তা'আলার কাছে উঠে আসে:

تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ

ফেরেশতাগণ এবং রূহ এমন একদিনে আল্লাহ্‌র দিকে উত্থিত হয় যার পরিমাণ ৫০ হাজার বছরের সমান।

[মা'আরিজ ৭০:০৪]

এই লম্বা সময়ে কি ঘটে সূরা মা'আরিজে তা আলোচিত হয়েছে। এই দিনের অন্যান্য ঘটনার মাঝে রয়েছে, মানুষ পুনরায় জীবিত হবে এবং কাফিররা জাহান্নামে প্রবেশ করবে। কিছু তাফসীরকারক এটিকে কিয়ামতের দিন বলে বিশ্বাস করেন।

২. একটি ঐশ্বরিক ব্যবস্থাপনা যা দু'টি ঐশ্বরিক দিন নিয়ে গঠিত। প্রথম ***সহস্রাব্দ*** যাতে আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশতাদের মাধ্যমে পৃথিবীতে তাঁর আদেশ পাঠান ও তা কার্যকর করেন। আর এর পর আসে দ্বিতীয় ***সহস্রাব্দ*** যেখানে ফেরেশতারা আল্লাহ্ তা'আলার পাঠানো সকল আদেশ পালনের ফলাফল নিয়ে উপরে উঠে আসে। এতে রয়েছে মানুষের সকল কাজের হিসাব।

يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ

তিনি আসমান এবং যমিন পর্যন্ত সকল কাজ পরিচালনা করেন। তারপর তা একদিনে তার কাছে উঠে আসে, যেদিনের পরিমাণ হবে তোমাদের গণনায় হাজার বছর।

[সাজ্‌দাহ ৩২:০৫]

ফলে, আমরা দেখতে পাই ইসলামের আগমন ও ইয়াজুজ ও মাজুজের মুক্তি উভয়ই একটি ঐশ্বরিক দিনের সকালে সম্পন্ন হয়। এটা সংগঠিত হয়েছে ***তত্ত্বাবধানমূলক সহস্রাব্দে***। আর সেই ***সহস্রাব্দের ব্যবস্থপনার*** সমাপ্তি যদি আজ থেকে ৫০০ বছর আগে হয়ে থাকে এবং আমরা যদি এখন ***জবাবদিহীমূলক সহস্রাব্দের*** মাঝে অবস্থান করছি, যা প্রত্যেক ***তত্ত্বাবধানমূলক সহস্রাব্দের*** পর আসে, আর এই ***তত্ত্বাবধানমূলক সহস্রাব্দ*** যদি প্রায় ১৪৬০ সৌরবর্ষ বা ১৫০৫ চন্দ্রবর্ষ আগে আরম্ভ হয়ে থাকে, তাহলে মনে হয়, অবশ্য আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন, এই ***জবাবদিহীমূলক সহস্রাব্দে*** কিয়ামত সংঘঠিত হতে পারে, নতুবা ঠিক তার পর পরই।

ইয়াজুজ ও মাজুজ বর্তমান সময়ের পরাশক্তি কিন্তু তারা ধ্বংস হবে

দীর্ঘ ১৫০০ বছরেরও অধিক সময় মানবজাতি তরঙ্গের মতো ইয়াজুজ ও মাজুজের সাথে মিশে তাদের জীবন ব্যবস্থাকে গ্রহণ করেছে, না হয় তাদের সাথে একত্রে সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এখন তাই এটা বলা খুবই কঠিন যে, কে আসলে ইয়াজুজ ও মাজুজ আর কে কেবল তাদের সাথে যোগ দিয়েছে? এর ভিত্তি হল ঐ হাদীস যাতে বলা হয়েছে, প্রতি ১০০০ জনে ৯৯৯ জন জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে আর নিক্ষিপ্তরা হবে ইয়াজুজ ও মাজুজ। ইয়াজুজ ও মাজুজ ইতোমধ্যেই প্রতিটি পাহাড় থেকে এবং ক্ষমতার প্রতিটি উচ্চ স্থান থেকে বেরিয়ে এসেছে, ***মিন কুল্লি হাদাবিন ইয়ানসিলুন*** (কাহাফ ১৮:৯৬)।

তারা এখন পৃথিবীর অদ্বিতীয় পরাশক্তি। তারা একটি অত্যাচারী যালিম সভ্যতা (কায়্যাতিন যালিমাতিন) ব্যতীত আর কিছুই নয়। কিয়ামত আসার আগেই প্রত্যেক অত্যাচারী যালিম সভ্যতার মতো এরাও ধ্বংস হবে (হাজ্জ ২২:৪৫-৪৮)।

ইয়াজুজ ও মাজুজ তাদের আরবী নামের অর্থকে বাস্তবে পরিণত করেছে। এই দু'টি কর্তা ও কর্মবাচক শব্দদ্বয়ের উৎপত্তি হয়েছে তাদের মূল **'হামযা','জীম','জীম'** ج ء ج থেকে। কুর'আনের অন্যত্র এই মূল থেকে আগত অনেক শব্দ রয়েছে, যেমন "উজাজ" শব্দটি ফুটন্ত নোনা পানির স্বাদ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ফলে "ইয়াজুজ" শব্দের অর্থ হলো, যারা অপরকে জ্বালিয়ে দেয় এবং "মাজুজ" শব্দের মানে হলো, যারা নিজেরাও জ্বলতে থাকে।

ইয়াজুজ ও মাজুজকে এবং অধিকাংশ মানবজাতি যারা তাদের জীবনব্যবস্থাকে গ্রহণ করবে, এদের সকলকে মহান আল্লাহ্ তা'আলা কেন জাহান্নামের উত্তপ্ত আগুনে নিক্ষেপ করবেন? আমরা কিভাবে ইয়াজুজ ও মাজুজীয় জীবনব্যবস্থাকে চিহ্নিত করবো এবং তাকে কিভাবে বর্জন করবো? নিচের অধ্যায়ে আমরা এইসব প্রশ্নের উত্তর *মুহকাম* আয়াত থেকে বের করব। ইনশাআল্লাহ্।

ফ্যাসাদ কি?

ইয়াজুজ ও মাজুজকে ***মুফসিদুনা ফিল আরদ্ব*** হিসেবে (কাহাফ ১৮:৯৪) আখ্যায়িত করা হয়েছে। আমি স্বাধীনভাবে এই আয়াতটির অনুবাদ করেছি "পৃথিবীতে ধ্বংসযজ্ঞের স্থপতি" হিসেবে। আসুন আমরা আরও একটু গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করি।

মুফসিদুনা শব্দটি *মুফসিদ* কর্মবাচ্যের বহুবচন। এর অর্থ, "তারা সংঘবদ্ধভাবে কোনকিছু ঘটায়"। এক্ষেত্রে এটি নির্দেশ করছে একটি দলের দিকে যাদের গোষ্ঠীগত কাজ বা জীবনযাত্রাই হলো *ফ্যাসাদ* নামক একটা হারাম কাজ চালিয়ে যাওয়া।

ফ্যাসাদ আর *মুফসিদুনা* উভয় শব্দই এসেছে মূল অক্ষর ف 'ফা', س 'সীন', د 'দাল' থেকে। অতএব, দেখা যাক *ফ্যাসাদ* কিজন্য ক্ষতিকারক?

এই মূল থেকে আগত শব্দসমূহকে (যেমন *ইউফ্‌সিদুনা, ইউফ্‌সিদ, ইউফ্‌সিদা, তুফ্‌সিদু, আল-মুফ্‌সিদীন, এবং আরো অনেক*) কুর'আনে একটা বিশেষ ভঙ্গিতে আল্লাহ্ তা'আলা ব্যবহার করেছেন। নিচে কিছু আয়াতে *ফ্যাসাদ*-এর গঠনপ্রকৃতির উদাহরণ রয়েছে। খেয়াল রাখতে হবে যে, ক্রিয়াসমূহের বহুবচন সংঘবদ্ধতা বা সামাজিক কাজকর্মকে ইঙ্গিত করে। কোন শব্দের আগে ال আলিফ-লাম যোগ করলে, এবং ব্যাকরণগত অন্যান্য গঠন কাঠামো, কোনকিছুর সামগ্রিকতা বুঝাতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। 'সমস্ত কিছু' এর অনেকটা কাছাকাছি।

১. ধর্মীয় ক্ষেত্রে *ফ্যাসাদ*। এর মানে হলো, কোন ঐশ্বরিক চুক্তির বাস্তবায়ন ব্যাপকভাবে পরিত্যাগ করা:

يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ

যারা আল্লাহ্‌র সাথে প্রতিজ্ঞা করার পর তা ভঙ্গ করে।

[বাকারাহ ২:২৭]

যখন কোন রক্ষণশীল বা কট্টরপন্থি দল কৌশলে নিজেদের ধর্মগ্রন্থের আইন ভঙ্গ করে, তাকে ধর্মীয় *ফ্যাসাদ* বলে। এটা তাদের সকলের আখিরাত জীবনকে ধ্বংস করে দেয়।

২. পারিবারিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে *ফ্যাসাদ*। এর মানে হলো, কৌশলে সমস্ত পারিবারিক সম্পর্কের বন্ধন ছিন্ন করা।

www.islamfind.wordpress.com

وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ

আল্লাহ্ যা জোড়া লাগানোর আদেশ দিয়েছেন তা ছিন্ন করে এবং যমীনে ফ্যাসাদ করে।

[বাকারাহ ২:২৭]

এর মানে হলো, স্বামী থেকে স্ত্রী, সন্তান থেকে পিতামাতা এবং ভাইদেরকে একে অন্যের কাছ থেকে বিছিন্ন করা।

৩. কোন জাতিকে নিশ্চিহ্ন করার *ফ্যাসাদ*। গণহত্যা সাধন করা:

يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ

ফ্যাসাদ করবে এবং রক্তপাত করবে।

[বাকারাহ ২:৩০]

৪. চাষাবাদের ক্ষেত্রে *ফ্যাসাদ*। কৌশলে সমস্ত শস্য, ফসলকে ধ্বংস বা বিনষ্ট করা।

لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ

তারা তাতে ফ্যাসাদ করতো এবং শস্য ফসল ধ্বংস করতো।

[বাকারাহ ২:২০৫]

উদাহরণস্বরূপ, সমস্ত কৃষিব্যবস্থাকে ধ্বংস করা অথবা ফসলের জীনগত পরিবর্তন সাধন এবং বীজে ক্ষতিকারক দ্রব্যের অন্তর্ভুক্তি।

৫. প্রজনন (আন-নাস্‌ল) ক্ষেত্রে *ফ্যাসাদ*। এর মানে হলো, কৌশলে মানব প্রজনন ধারাকে ধ্বংস করা অথবা শিশুদের ব্যাপকভাবে হত্যা করা:

لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ

তারা ফ্যাসাদ করতো এবং শস্য ফসল ধ্বংস ও সন্তানদের হত্যা করতো।

[বাকারাহ ২:২০৫]

৬. অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে *ফ্যাসাদ*। এর মানে হলো, এমন একটা বাণিজ্যিক ব্যবস্থা চালু করা যাতে ক্ষমতাবানরা শ্রমিকদেরকে কম মজুরী দিয়ে খাটাবে বা তাদেরকে বঞ্চিত করবে:

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

তোমরা ওজন ও পরিমাপ পরিপূর্ণ করবে এবং মানুষকে তাদের পণ্যে কম দেবে না আর যমীনে সংশোধনের পর ফ্যাসাদ করবে না।

[আরাফ ৭:৮৫]

৭. সমকামীর *ফ্যাসাদ*। এর মানে হলো, সামাজিকভাবে সমকামীতার প্রচলন করা:

أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ

তোমরা তো পুরুষদের দিকে (যৌন উদ্দেশ্যে) আকৃষ্ট।

[আনকাবুত:২৯-৩০]

এটি **গে বা সমলিঙ্গ বিবাহ**-কে বৃদ্ধি করে দেয় আর প্রকৃত বিবাহকে হ্রাস করে দেয়।

তাহলে *ফ্যাসাদ* হলো স্বতঃস্ফূর্তভাবে এবং কৌশলে মানুষের জীবনকে ধ্বংস করা, গণহত্যা সাধন করা অথবা মানুষের জীবনের মৌলিক উপাদানসমূহকে ধ্বংস করে ফেলা। এর ভিতর আখিরাতের জীবনও অন্তর্ভূত রয়েছে। ইয়াজুজ ও মাজুজকে *মুফসিদূন* বলা হয়েছে কিন্তু তাতে কোন বিশেষ প্রকারের *ফ্যাসাদ* নির্দিষ্ট করা হয়নি। এর মানে হলো, তারা এমন একটা দল যাদের গোষ্ঠীগত কাজ বা জীবনযাত্রাই হলো সব ধরনের, সকল প্রকারের *ফ্যাসাদে* লিপ্ত হওয়া। এরাই আল্লাহ্ তা'আলার ক্রোধের এবং জাহান্নামের আগুনে প্রবেশের উপযুক্ত। এরাই হলো সেসমস্ত লোক যাদেরকে *সূরা ফাতিহাতে* বলা হয়েছে:

الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

ঐসমস্ত লোক যারা আল্লাহ্ তা'আলার ক্রোধের উপযুক্ত।

[ফাতিহা ১:৭]

www.islamfind.wordpress.com

প্রথম অধ্যায়ে বর্তমান বিশ্বে পরিদৃষ্ট বিভিন্ন প্রকারের ফ্যাসাদকে শায়খ ইমরান হোসেন চিহ্নিত করেছেন। বিগত শতকে বিভিন্ন জাতি, গোত্রকে নিশ্চিহ্ন করার *ফ্যাসাদ* যে ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে, সপ্তম অধ্যায়ে তিনি সেটা পরিষ্কার করে দিয়েছেন। এগুলি বিশেষভাবে ইয়াজুজ ও মাজুজেরই কাজ। কিন্তু কিভাবে তারা সমগ্র মানবজাতিকে এই নারকীয় কাজে মাতিয়ে দিল? তাও আবার দলগতভাবে এবং স্বতন্ত্রভাবে সকলকে নিয়োজিত করে!

ইয়াজুজ ও মাজুজের পরিচয় ও তাদের নিয়ন্ত্রিত ফ্যাসাদকারী দল

সুরা বাকারার শুরুর দিকে আল্লাহ্ তা'আলা সংঘবদ্ধভাবে ফ্যাসাদকারী একটি দলের পরিচয় দিয়েছেন। সেখানে তিনি তাদের প্রতারণামূলক মিশন, তাদের অদ্ভূত বিশ্বাস, তাদের কার্যকালাপের ধরন, তাদের সাংগঠনিক কাঠামো, এমনকি তাদের গোপন পরিকল্পনা পর্যন্ত তুলে ধরেছেন। এই আয়াতগুলিতে ইয়াজুজ ও মাজুজ এবং তাদের পক্ষে কাজ করা বিভিন্ন ফ্যাসাদকারী দল সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

১. ভন্ড ধর্মীয় দল। প্রতারণার উদ্দেশ্যে যারা আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাসের ভান করে:

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ

মানুষের মধ্যে এমন কিছু লোক রয়েছে যারা বলে: "আমরা আল্লাহ্ ও আখিরাতের উপর ঈমান এনেছি"। অথচ তারা ঈমানদার নয়।

[বাকারাহ ২:৮-৯,১৪]

২. ঈমানের অন্যরকম দাবীদার। তাদের সোজাসাপটা বিশ্বাস নিয়ে তারা এতটাই অহংকারী যে সাধারণ লোকদের সাথে, যারা তাদের ভাষায় 'নির্বোধ', আলোচনা করতেও তারা রাজি নয়:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ

যখন তাদেরকে বলা হয়: 'যে সকল লোকেরা ঈমান এনেছে তাদের মতো ঈমান আনো'। তারা বলে: 'আমরা কি গাধাদের মতো ঈমান আনবো।'

[বাকারাহ ২:১৩]

৩. মানসিকভাবে এরা দ্বিমুখী স্বভাবের। এই দলের লোকেরা মানসিক ও আত্মিকভাবে দ্বিমুখী এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাদের এই দ্বিমুখীতাকে আরও বাড়িয়ে দেন:

فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا

তাদের অন্তরে রোগ রয়েছে আর আল্লাহ্ সেই রোগ বাড়িয়ে দেন।

[বাকারাহ ২:১০]

ভ্রান্ত যুক্তি, অদ্ভুত ধর্মীয় প্রথা, আচার আচরণ এবং যৌন স্বেচ্ছাচারিতা এর অর্ন্তভুক্ত।

৪. আশাব্যঞ্জক মিশন। এরা সমাজকে সমৃদ্ধি ও উন্নয়নের দিকে নিয়ে যাবার প্রতারণামূলক মিশন বাস্তবায়নের দাবী করে থাকে:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ

আর যখন তাদেরকে বলা হয়: "যমীনে তোমরা ফ্যাসাদ করো না।" তারা বলে: "আমরা তো সংশোধনকারী।"

[বাকারাহ ২:১১]

৫. গোপন আলোচনা, ষড়যন্ত্র করা। এই দলের লোকেরা নিয়মিত তাদের উচ্চপদস্থ নেতাদের সাথে গোপন আলোচনা সভা করে। এভাবে তারা তাদের আনুগত্যকে নবায়ন করে এবং কাজের হালচাল, অগ্রগতি জেনে নেয়:

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ

যখন তারা ঈমানদারদের সাথে মিলিত হয়, তখন বলে: "আমরা ঈমান এনেছি," আর যখন তারা তাদের শয়তানদের সাথে মিলিত হয় তখন বলে: "আমরা তো আসলে উপহাসকারী।"

[বাকারাহ ২:১৪ এবং প্রায় একই রকম আলে ইমরান ৩:১১৯-১২০]

৬. উচ্চপদস্থ নেতারা হবে 'শয়তান'। শীর্ষস্থানীয় সদস্যরা উচ্চপদস্থ নেতাদের নিকট কাজের প্রতিবেদন পেশ করে। যাদেরকে আল্লাহ্ 'শয়তান' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন:

وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ

যখন তারা তাদের শয়তানদের সাথে মিলিত হয়।

[বাকারাহ ২:১৪]

কুর'আনে 'শয়তান' শব্দটির এটাই প্রথম ব্যবহার এবং তা বহুবচন হিসেবে এসেছে। এই 'শয়তান' কারা, সেটা পরবর্তী দু'টি উপ-অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করেছি? এবং কিভাবে তারা ইয়াজুজ ও মাজুজের পক্ষে কাজ করা ফ্যাসাদকারী দলকে সাহায্য সহায়তা করে, উৎসাহিত করে এবং পরিচালনা করে, তা নিয়েও আলোচনা করেছি।

বর্তমানের কেন্দ্রিয় বিশ্বব্যাপী মুদ্রাব্যবস্থা এবং অর্থনৈতিক ফ্যাসাদকে, প্রথম অধ্যায়ে শায়খ ইমরান হোসেন অত্যন্ত সফলতার সাথে চিহ্নিত করেছেন। আর এটা কেবল উপরে বর্ণিত বৈশিষ্টে বৈশিষ্টমন্ডিত ইয়াজুজ ও মাজুজের দ্বারাই সম্ভব। চতুর্থ অধ্যায়ে শায়খ ইমরান হোসেন ইয়াজুজ ও মাজুজের চালচিত্র তথা জীবনআলেখ্য আলোচনা করেছেন এবং তাদের চেহারা উন্মোচন করেছেন, যে চেহারা উপরে বর্ণিত বৈশিষ্টের প্রায় অনুরূপ।

শয়তানের গোষ্ঠিঃ মিষ্টভাষী, প্রতারক ও মনহরণকারী নেতৃবর্গ

শয়তান (ইবলিশ, জিনদের নেতা) হচ্ছে সবচেয়ে বড় প্রতারক। মহান আল্লাহ্ তা'আলা জিন এবং মানব শয়তানদেরকে প্রত্যেক নবীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী হিসেবে পাঠিয়েছেন।

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ

আর আমরা এভাবে মানুষ এবং জিনদের মধ্য থেকে শয়তানদেরকে প্রত্যেক নবীর শত্রু বানিয়েছি, তারা প্রতারণার উদ্দেশ্যে একে অপরের সাথে মিষ্টি ও ধোঁকাপূর্ণ কথার কুমন্ত্রণা দেয় এবং তোমার রব যদি চাইতেন তবে, তারা তা করতো না। সুতরাং তুমি তাদেরকে ও তারা যে মিথ্যা রটায় সেগুলিকে পরিত্যাগ করো।

[আন'আম ৬:১১৩]

এই 'শয়তান' সমূহ ধোঁকা (আল-গুরূর) দেবার জন্যে অস্ত্র হিসেবে মিষ্টি ভাষা (যুখরুফুল ক্বওল) ব্যবহার করতে (গোপনে বা পরোক্ষভাবে) একে অপরকে উৎসাহিত করে। পরকালে (আখিরাত) অবিশ্বাসী মন ও হৃদয়ই (কুলুব) কেবল এরূপ কথা শোনে, গ্রহণ করে এবং সেই সাথে তাদের পাপ কাজকে চালাতে থাকে যেটাতে তারা অভ্যস্ত।

কারা এই ফ্যাসাদের পরিকল্পনাকারী?

ইয়াজুজ ও মাজুজের শীর্ষস্থানীয় নেতাগণ এবং এদের সাথে জড়িত বিভিন্ন ফ্যাসাদকারী দল বনী ইসরাঈলের অধীন

ফ্যাসাদকারী দলগুলির গোপন বৈঠকের আরও একটি বর্ণনা আল্লাহ্ তা'আলা প্রদান করেছেন। শীর্ষস্থানীয় সদস্য এবং উচ্চপদস্থ নেতাদেরকে ('শয়তান') একই গোত্রের বলে চিহ্নিত করা হয়েছে:

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ

যখন তারা ঈমানদারদের সাথে মিলিত হয় তখন বলে: 'আমরা ঈমান এনেছি' আর যখন তারা এক অপরের সাথে একান্তে মিলিত হয় তখন বলে: 'তোমরা কি তাদের সাথে সে কথা আলোচনা করো যা আল্লাহ্ তোমাদের উপর উন্মুক্ত করে দিয়েছেন যাতে তারা এর মাধ্যমে তোমাদের রবের কাছে তোমাদের বিরুদ্ধে দলীল পেশ করতে পারে?'

[বাকারাহ ২:৭৬]

তাহলে এই গোত্রটি আসলে কোন্ গোত্র?

এরা এমন একটি সম্প্রদায় যারা তাওরাতে নবী (সাঃ)-এর যথাযথ বর্ণনা সত্ত্বেও ইসলামকে কেবল বর্জনই করেনা সেই সাথে সেটিকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্রও করে। এই সম্প্রদায়টি হলো বনী ইসরাঈল। যাদের ফ্যাসাদীয় আচরণ যুগ যুগ ধরে বদলায় নি (বাকারাহ ২:৪০-৭৩) এবং সামনেও বদলাবে না {তাদের অন্তর পাথরে পরিণত হয়েছে, কুর'আনের প্রতি তারা ঈমান আনবে না; (বাকারাহ ২:৭৪-৭৫)}। তাদের ষড়যন্ত্রমূলক আচরণ গরুর ঘটনাতে সমালোচিত হয়েছে (বাকারাহ ২:৬৭-৭৩)। আল্লাহ্

তাদেরকে একটি গরু কুরবানি করতে আদেশ করেন এবং সেই গরুর মাংসের টুকরোকে আক্রান্ত ব্যক্তির শরীরে আঘাত করতে আদেশ করেন। এতে আক্রান্ত ব্যক্তি কিছু সময়ের জন্য জীবিত হবে এবং তার হত্যাকারীর (ক্বাতাল্‌তুম নাফ্‌সান, তোমরা তাকে হত্যা করেছ) নাম বলে দিবে। বনী ইসরাঈলদের সমস্ত সম্প্রদায় এই ঘটনাকে চাপা দেবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় (*ওয়াল্লাহু মুখ্‌রিজুন মা কুন্‌তুম তাক্‌তুমুন*, তোমরা যা গোপন করেছ আল্লাহ্‌ তা প্রকাশ করবেন)।

কুর'আনে বনী ইসরাঈলকে কিতাবের লোকজন (আহ্‌লে কিতাব) হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। এই পরিভাষাটি খ্রিস্টানদের ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়েছে। কুর'আনের প্রেক্ষাপটই বলে দিবে কখন কোন সম্প্রদায়কে ইঙ্গিত করা হচ্ছে। তবে কুর'আন কখনো কখনো উভয় সম্প্রদায়কে একযোগে ইঙ্গিত করেছে।

আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাদেরকে সংবাদ দিচ্ছেন, 'আহ্‌লে কিতাবের একটা দল (প্রেক্ষাপটই বলে দিচ্ছে এরা হয় সমস্ত ইহুদি, অথবা তাদের কোন উপগোত্র) তাওরাতকে বাতিল করেছিল এবং জিন শয়তানদের মন্ত্র পাঠের (মা তাত্‌লু আশ-শায়াতীন, বাকারাহ ২:১০১-১০২) আস্তানাতে একত্রে জড়ো হতো'। এই আবৃত্তির ভিতরে ইহুদিদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ তামলুদও অন্তর্ভূত থাকতো। তাছাড়া আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাদেরকে আরও সংবাদ দিচ্ছেন যে, ফ্যাসাদ তৈরি করতে সমগ্র ইহুদিরা সংঘবদ্ধভাবে কঠোর পরিশ্রম করতো (মায়িদাহ ৫:৬৪)। এতে সকল প্রকারের ফ্যাসাদের সাথে ধর্মীয় ফ্যাসাদও অন্তর্ভূত ছিল। আহ্‌লে কিতাবের সৎ চরিত্রের লোকেরা কিন্তু এই কাজের ব্যতিক্রম কারণ তারা কুর'আনকে গ্রহণ করেছে:

لَيْسُوا سَوَاءً مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ
يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي
الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ

তারা সমান নয়; আহ্‌লে কিতাবদের মাঝে একদল ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। তারা রাতের বেলায় আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করে এবং সিজদায় পড়ে থাকে। তারা আল্লাহ্‌ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে, ভাল কাজের আদেশ দেয় এবং মন্দ কাজের নিষেধ করে। আর তারা কল্যাণকর কাজের দিকে দ্রুত ধাবিত হয় এবং তারা নেককারদের অন্তর্ভূত। আর এরাই হলো সৎকর্মশীল।

[আলে ইমরান ৩:১১৩-১১৫]

উপরের আলোচনা থেকে আমি বলতে পারি, ইয়াজুজ ও মাজুজ ও তাদের পক্ষ নিয়ে কাজ করা ফ্যাসাদকারী দলসমূহকে নেতৃত্বদানকারী মানব **শয়তান**রাই হলো আসলে বনী ইসরাঈল। যারা জিন শয়তানদের মন্ত্র পাঠকে অনুসরণ করে চলে।

পূর্ববর্তী উপঅধ্যায় সমূহতে আমি কুর'আন ও ইয়াজুজ ও মাজুজের মধ্যে যে সম্পর্ক রয়েছে তার ভিত্তিটা দেখিয়েছি। দ্বিতীয় পর্যায়ের যে সমস্ত আয়াতে ইয়াজুজ ও মাজুজের উল্লেখ করা হয়েছে, সে সকল আয়াত নিয়ে যখন আলোচনা করা হবে তখন এটা একটা চূড়ান্ত সূত্র হিসেবে কাজ করবে।

ইয়াজুজ ও মাজুজ বনী ইসরাঈলকে তাদের 'নিজেদের শহরে' ফিরিয়ে আনবে

সূরা আম্বিয়ার ৯৫-৯৭ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা একটি শহরের কথা উল্লেখ করেছেন যা ইয়াজুজ ও মাজুজের সাথে সম্পর্ক রাখে।

وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ

নিষেধাজ্ঞা জারি রয়েছে একটি শহরের উপর যাকে আমরা ধ্বংস করে দিয়েছি, তারা (অর্থাৎ সেখানের অধিবাসীরা) আর ফিরে আসতে পারবে না যতক্ষণ না ইয়াজুজ ও মাজুজকে মুক্ত করে দেয়া হচ্ছে এবং তারা সবদিকে ছড়িয়ে না পড়ছে। আর সত্য ওয়া'দের সময় নিকটবর্তী হলে হঠাৎ কাফিরদের চোখ স্থির হয়ে যাবে। তারা বলবে, "হায়! আমাদের দুর্ভোগ! আমরা তো এ বিষয়ে উদাসীন ছিলাম, বরং আমরা ছিলাম যালিম।"

[আম্বিয়া ২১:৯৫-৯৭]

শহরটিকে ধ্বংস করা হয়েছে এবং সেখানকার লোকজন সেখানে আর ফিরতে পারবে না যতক্ষণ নিচের শর্তসমূহ পূরণ না হচ্ছে:

১. ইয়াজুজ ও মাজুজ যতক্ষণ না মুক্তি পাচ্ছে;

২. ইয়াজুজ ও মাজুজ সমগ্র বিশ্বে তাদের উপস্থিতি ছড়িয়ে না দিচ্ছে (*মিন কুল্লি হাদাবিন ইয়ান্‌সিলুন*)। আর এটি অন্ততপক্ষে নিচের ঘটনাসমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে হবে:

- ইয়াজুজ ও মাজুজের প্রতিটি রাজকীয় ও সম্ভ্রান্ত শাসক পরিবারের সাথে বংশগত সম্পর্ক রয়েছে।
- ইয়াজুজ ও মাজুজের প্রতিটি সাংগঠনিক ব্যবস্থাতে প্রবেশ থাকবে (*হাদাব* = সংগঠন, প্রতিষ্ঠান চালনা করা)।
- ইয়াজুজ ও মাজুজ প্রতিটি পাহাড় থেকে দ্রুতবেগে ছুটে আসবে (সবখানে যুদ্ধ অথবা আক্রমণ চালনা করবে)।

এই সমস্ত শর্তাবলী আমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছে যে, ঐ ধ্বংস প্রাপ্ত শহরের জনগণকে ফিরিয়ে আনতে ইয়াজুজ ও মাজুজ সহায়তা করবে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে, শায়খ ইমরান হোসেন অত্যন্ত সফলভাবে এই আয়াতটিকে **জেরুযালেম** শহরের ইতিহাসের সাথে সম্পর্কিত করতে সক্ষম হয়েছেন।

তিনি সেখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, শহরটিকে ধ্বংস ও বনী ইসরাঈলকে সেখান থেকে বহিষ্কারের বহু বছর পর তাদেরকে গত শতাব্দিতে **জেরুযালেমে** ফিরিয়ে আনা হয়েছে।

কেন ইসরাঈল রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে? এবং বনী ইসরাঈলকে তাদের পুরাতন শহরে (জেরুযালেমে) ফিরে আসতে কেন বাধ্য করা হয়েছে? এই আয়াতটি এই সকল ঘটনার ব্যাখ্যা প্রদান করে। শায়খ ইমরান হোসেন জোর দিয়ে দাবী করেছেন যে, এই কাজ সম্পন্নকারীরা অবশ্যই ইয়াজুজ ও মাজুজ। ইয়াজুজ ও মাজুজের নেতৃত্ব যে বনী ইসরাঈলের হাতে রয়েছে এটাই তার বাস্তব প্রমাণ।

যখন সময়ের পরিক্রমায় ইয়াজুজ ও মাজুজ তাদের মিশনকে সফল করে ফেলবে, তখন বুঝতে হবে যে সত্য প্রতিশ্রুতি (ওয়া'দ আল-হাক্ব, শেষ সময়) খুবই নিকটবর্তী।

এর মানে হলো, বনী ইসরাঈল যাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং ক্রুশবিদ্ধ করার চেষ্টা করেছিল সেই ঈসা নবী (আঃ)-এর আগমন সম্ভবত খুবই নিকটবর্তী। যারা তাঁর সত্য মিশনকে প্রত্যাখ্যান করেছিল তাঁর প্রত্যাবর্তনের সময় এই মহাসত্যের সামনে

তাদের চোখ খুলে যাবে এবং উপলব্ধি করবে যে, এই কঠিন শাস্তি থেকে বাঁচার আর সময় নেই।

ঐ ধ্বংসপ্রাপ্ত শহরটি **জেরুযালেম**, যা শায়খ ইমরান হোসেন জোর দিয়ে বলেছেন, আর সেটা নিচের তথ্যাদির কারণে আরো জোরাল মনে হচ্ছে। মহান আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছেন যে এটা তিনি নির্ধারিত করে রেখেছেন যে, বনী ইসরাঈল দু'বার পৃথিবীতে ক্ষমতাবান হবে ও ফ্যাসাদ করবে (ইসরা ১৭:৪-৮)। প্রথমবার ক্ষমতাবান হবার ঘটনাটি ইতোমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে (*ওয়া কানা ওয়া'দান মাফ্উলা*, আর কাজটি সম্পন্ন হবে এটা ধার্য ছিল)। আমার বিশ্বাস, আমরা এখন বনী ইসরাঈলের দ্বিতীয়বার ক্ষমতাবান হওয়াকে প্রত্যক্ষ করতে যাচ্ছি (ওয়া'দাল আখিরাহ, এর মানে, শেষ ধার্যকৃত বিষয় [ক্ষমতাবান হওয়া])। পরবর্তী আয়াতে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে, শেষবার যখন তারা উদীয়মান [ক্ষমতাবান] হবে (ওয়া'দাল আখিরাহ, একই বাক্য) তখন বনী ইসরাঈলকে বিভিন্ন দেশ থেকে **জেরুযালেম** শহরে একত্রিত করা হবে।

فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا

যখন ওয়া'দ আল-আখিরাহ আসবে আমরা তোমাদেরকে জড় করে নিয়ে উপস্থিত হবো।

[ইসরা ১৭:১০৪]

দাজ্জাল (ভন্ড মসীহ) হচ্ছে ইয়াজুজ ও মাজুজের নেতা

উপরের আলোচনার মাধ্যমে এটা সুস্পষ্টভাবে পরিষ্কার যে, ইয়াজুজ ও মাজুজের নেতারা অবশ্যই বনী ইসরাঈলি। আর তাদের ধর্ম হলো জিন শয়তানদের মন্ত্র। আর নিশ্চিতভাবে তাদের নেতাদের মধ্যে একজন হবে খুবই উঁচু পর্যায়ের। হাদীস এবিষয়টিকে চূড়ান্ত করেছে। আর আমাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছে যে, সে হলো, আল-মসীহ আদ্-দাজ্জাল (মিথ্যাবাদী, প্রতারক, চাকচিক্যময়) নামক এক ইহুদি ব্যক্তি। হাদীসে একে ভন্ড মসীহ হিসেবে আখ্যায়িত করা হচ্ছে {ইহুদিরা আসল মসীহ হযরত ঈসা (আঃ)-কে প্রত্যাখ্যান করেছিল}। মদীনার অধিবাসী ইবনে সাইয়াদ নামক এক ইহুদি যুবককে নবী (সাঃ) দাজ্জাল হিসেবে সন্দেহ করেছিলেন। হাদীস আমাদেরকে আরো বলছে যে, ঠিক সেই সময়ে দাজ্জাল ভিন্ন আকৃতিতে একটা বিশেষ দ্বীপে অবস্থান করছিল। দাজ্জাল

বিভিন্ন আকার ও রূপে আবির্ভূত হয়ে থাকে। শায়খ ইমরান হোসেন *Jerusalem in the Qur'ān* নামক গ্রন্থে দাজ্জালের বিভিন্ন রূপ নিয়ে আলোচনা করেছেন।

ইয়াজুজ ও মাজুজ ধর্মীয় ফিরকাতে অনুপ্রবেশ করেছে

কুর'আনে বিভিন্ন প্রকার ফ্যাসাদ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তার উপর ভিত্তি করে, নবী (সাঃ)-এর বিশিষ্ট সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে মাস্‌উদ (রাঃ) তাঁর সময় কালে মুসলিমদের মাঝে আবির্ভূত বিভিন্ন উদিয়মান ফিরকাগুলিকে **'ইসলামের ইহুদি'** হিসেবে আখ্যায়িত করতেন। তিনি এর দ্বারা বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন যে, এ ফিরকাগুলি ইহুদিদের পরিকল্পিত নানা ধরনের ফ্যাসাদকে প্রকাশ করতো।

হাদীস আমাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছে যে, এই সমস্ত ফিরকাগুলি জাহান্নামে প্রবেশ করবে। কুর'আন ও সুন্নাহকে অবলম্বনকারী মূলধারাটিই কেবল জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা পাবে।

প্রথম অধ্যায়টিতে শায়খ ইমরান হোসেন বিভিন্ন ফিরকার উপর আলোচনা করেছেন।

'ইয়াজুজ ও মাজুজ' বিষয়টিতে সঠিক অবস্থান নেওয়ার জন্যে তিনি সে সমস্ত ফিরকাগুলির উদ্দেশ্যে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছেন।

খ্রিস্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ, নাস্তিক, বহু ঈশ্বরবাদীদের বিশেষ ফিরকা বা দলগুলির মধ্যে যে **'ফ্যাসাদকারী দলের'** বৈশিষ্ট্য রয়েছে তা নিশ্চিত। স্বাভাবিকভাবেই এরা সর্বোচ্চ ফ্যাসাদকারী দল ইয়াজুজ ও মাজুজের সাথে সম্পর্ক রাখে। আমরা বলছি, এ সমস্ত দলের শীর্ষ নেতৃবৃন্দ দাজ্জালের (বিভিন্ন কাজের) সহযোগী।

আর এ জন্যেই আল্লাহ্ তা'আলা ইহুদি ও খ্রিস্টানদেরকে সহচর, বা বন্ধু, বা অভিবাবক (আওলিয়া) হিসেবে গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। তিনি সতর্ক করে দিয়েছেন যে, তারা আসলে একে অপরের সহচর বা বন্ধু ও অভিবাবক {*বা'দুহুম আওলিয়াও বা'দ* (মায়িদাহ ৫:৫১)}। শায়খ ইমরান হোসেন বিশেষভাবে চিহ্নিত করেছেন যে, **ইহুদি-খ্রিস্টান চক্রটি** হলো ইয়াজুজ ও মাজুজের প্রতিরূপ।

নিহিতার্থ

ইয়াজুজ ও মাজুজের মুক্তি-পরবর্তী সময়ে আধ্যাত্মিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিণতির ব্যাপারে শায়খ ইমরান হোসেন বেশ অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো: আমরা কিভাবে মিষ্ট-ভাষী মনহরণকারী নেতাদেরকে বর্জন করবো যারা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ভাল কাজে যোগ দেয় অথচ বাস্তবতা হলো সেগুলি তাদের ফ্যাসাদ তৈরী করার কর্মসূচি? এ ব্যাপারে সূরা কাহাফ একটি উত্তর প্রদান করেছে। তা হচ্ছে, শহরসমূহ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া। হাদীসও এ ব্যাপারে দিকনির্দেশনা প্রদান করেছে। সপ্তম অধ্যায়ে শায়খ ইমরান হোসেন **মুসলিম গ্রামের** প্রস্তাব দিয়েছেন।

মুসলিম উম্মাহর অখণ্ড ঐক্য অনেক আগেই চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে। যতক্ষণ পর্যন্ত ইয়াজুজ ও মাজুজ সমগ্র বিশ্ব-ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করছে ততক্ষণ পর্যন্ত **ইসলামিক খিলাফত** প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হবে না। সূরা সফ্ (৬১:১-১৪) আমাদেরকে বিশ্ব ইতিহাস এবং ভবিষ্যতের ঘটনার ব্যাপারে একটা ধারণা দেয়। ঈসা (আঃ) ও মূসা (আঃ)-এর সাথে প্রতারণাকারী দ্বিমুখী চরিত্রের বনী ইসরাঈল আল্লাহ্‌র নূরকে নিভিয়ে দিতে চায়। তারা ঈসা (আঃ)-এর পরিবর্তে ভন্ড মসীহ দাজ্জালকে গ্রহণ করেছে। তাদের সৈন্যবাহিনী ইয়াজুজ ও মাজুজ, যারা আজ সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু ইমাম আল-মাহদী তাদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত যুদ্ধ করবেন, এবং কাজটি শেষ করবেন হযরত ঈসা (আঃ)। তিনি তখন ইসলাম অনুযায়ী বিশ্বকে শাসন করবেন।

ড. তাম্মাম আদী
সফর, ১৪৩০ হিজরী

www.islamfind.wordpress.com

এক - আধুনিক যুগে শেষ সময়ের আলামত সমূহের গুরুত্ব

قال النبي محمد صلى الله عليه و سلم
مثل هذه الدنيا مثل ثوب شق من أوله إلى أخره
فبقي متعلقا بخيط في أخره فيشق ذلك الخيط أن ينقطع

নবী মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এই দুনিয়া এক টুকরো কাপড়ের মতো এবং ঝুলন্ত সুতার ন্যায় যাকে খুব শীঘ্রই কেটে ফেলা হবে।

[বায়হাকি, শু'আবুল ঈমান]

শেষ সময়ের আলামত, আরো ভালভাবে বলতে গেলে ভন্ড মসীহ দাজ্জাল ও ইয়াজুজ ও মাজুজ এসে উপস্থিত হওয়া যখন আসন্ন, তখন "শেষ যুগ" বিষয়টিকে হৃদয়ঙ্গম করা কতগুলি কারণে অত্যাধিক গুরুত্ব বহন করে। সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হলো, কি ধর্মনিরপেক্ষ কি ধার্মিক, কি বাহ্যিক কি আধ্যাত্মিক, সকল দিক দিয়ে ইসলামের প্রতিদ্বন্দ্বীরা যখন ইসলামি জ্ঞানবিজ্ঞানের কাছে বর্তমানের দুর্নীতিগ্রস্থ, পতনশীল, সর্বোপরি বিশ্বব্যাপী ফ্যাসাদপূর্ণ এবং ক্ষয়িষ্ণু সমাজব্যবস্থার সাংগঠনিক কাঠামো, রাজনৈতিক ধরন, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, ধর্মীয় এবং আধ্যাত্মিক বাস্তবতার কারণ জানতে চায়, তখন পরিষ্কার হয়ে যায় যে, আসলে ইসলামি জ্ঞানবিজ্ঞান এক্ষেত্রে কতটা নাজুক অবস্থায় রয়েছে।

বস্তুত পুডিঙের মজা তখনই পাওয়া যায় যখন তা খাওয়া হয়। ঈসা (আঃ)-এর প্রত্যাবর্তন, ভন্ড মসীহ দাজ্জাল, ইয়াজুজ ও মাজুজ বিষয়গুলিতে এই লেখকের যে দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে তা যদি সফলভাবে গতকালের *Pax Britannica*, বর্তমানের *Pax Americana* এবং সঠিকভাবে ধারণা করে থাকলে আগামী দিনের *Pax Judaica*-কে (অনেকে বলে থাকেন আগামীকাল এসে গেছে) সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে, আর সেটা যদি ইহুদি, খ্রিস্টান, মুসলিম বা অন্যকোন কান্ডজ্ঞানহীন তাত্ত্বিক সমালোচক দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রত্যাখ্যাত হয় তখন বুঝার আর বাকি থাকে না যে, এটা তাদের বোকামি

ব্যতীত আর কিছুই নয়। *Jerusalem in the Qur'ān* প্রকাশিত হয় ২০০২ সালে। বইটি বেস্ট সেলার হিসেবে বিবেচিত হয়েছে, তা সত্ত্বেও বাস্তবতা এই যে বইটির তাত্ত্বিক ভিত্তিকে প্রত্যাখ্যান করতে পারে, এরূপ একটি জ্ঞানগর্ভ সমালোচনার অপেক্ষায় লেখক এখনো রয়েছেন।

বিশ্বের ঘটনাসমূহ আজ খুব দ্রুত উন্মোচিত হচ্ছে আর এই ঘটনাসমূহই *Jerusalem in the Qur'ān* এবং সেই সাথে *An Islamic View of Gog and Magog in the Modern World* নামক বই দু'টিতে বর্ণিত বিশ্লেষণকে সত্যায়িত করতে শুরু করে দিয়েছে। ঈসা (আঃ) একদিন প্রত্যাবর্তন করবেন। অপরদিকে ভন্ড মসীহ দাজ্জাল ও সেই সাথে ইয়াজুজ ও মাজুজ সম্প্রদায় এই পৃথিবীতে অনেক আগেই মুক্ত হয়েছে। তারা যে কেবল মুক্ত হয়েছে তাই নয়, তারা আজকের পৃথিবীর নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় রয়েছে। এই বাস্তব সত্যটুকু মেনে নিতে আমাদের সমালোচকরা উৎসাহিত হবেন, আমরা এটাই আশা করছি।

'ইয়াজুজ ও মাজুজ' বিষয়টি আজ সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে কেননা পবিত্র কুর'আনই এই বিষয়টির গোড়াপত্তন করেছে। অপরদিকে 'দাজ্জাল' শব্দটি কুর'আনে ব্যবহৃত হয়নি (যদিও কুর'আনের কিছু অনুচ্ছেদ পরোক্ষভাবে দাজ্জালের সাথে জড়িত রয়েছে)। এটাই সেই বিষয় যেখানে ইসলামি পান্ডিত্য প্রয়োগ করার সময় এসেছে। এই বাস্তবতা নিয়ে চিন্তা করতে অনাগ্রহী প্রকৃতির পন্ডিতরা (যাদের দৌড় কেবল কিতাবের গন্ডি আর মিষ্টি মিষ্টি সুন্নাত, জোব্বা, পাগড়ি ও বিবি তালাকের মাসআলা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ - অনুবাদক) 'শেষ সময়ের আলামত' বিষয়টির সাথে নিজেদেরকে সজাগ করে নিতে পারে। অবশ্যই এই বিষয়গুলি আজকের আধুনিক যুগকে প্রভাবিত করছে।

বাহ্যিক ও বাস্তব একে অপরের বিপরীত

আজকের পৃথিবীর বাস্তবতা কি? আমাদের প্রথম প্রতিক্রিয়া হলো, দৃশ্যমান ঘটনা ও বাস্তবতা একে অপরের বিপরীত। ভন্ড মসীহ দাজ্জালের মতো যারা (বাহ্যিকভাবে) 'এক' চোখ দিয়ে দেখতে অভ্যস্ত তারা তো আজকের পৃথিবীকে সর্বোন্নত পৃথিবী হিসেবে স্বীকৃতি দিচ্ছে। আজকের পৃথিবীতে এখনো খিযির (আঃ)-এর মতো লোক রয়েছে যারা 'দুই চোখ' (বাহ্যিক এবং অন্তর্দৃষ্টি) দিয়ে দেখে, (সূরা কাহাফে তাঁর

কথা আলোচিত হয়েছে)। তারা আজকের এই বিশ্বব্যবস্থাকে ইতিহাসের সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যবস্থা বলে মনে করেন।

সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, নবী (সাঃ) বলেছেন: দাজ্জাল **নদী** ও **আগুন** সাথে নিয়ে আসবে কিন্তু তার **নদী** বাস্তবে হবে **আগুন** আর তার 'আগুন' বাস্তবে হবে **নদীর ঠান্ডা পানির ন্যায়**। এমন অনেকে রয়েছেন, যাদের মধ্যে প্রখ্যাত ইসলামি পন্ডিতরাও অন্তর্ভূত, যারা বিশ্বাস করেন যে, কট্টরপন্থি মুসলিমদের দ্বারা উৎসাহিত হয়েই নাকি আমেরিকার শত্রুরা আমেরিকাতে আক্রমণের পরিকল্পনা করে এবং আমেরিকাতে ৯/১১-র হামলা চালায়। এই মিথ্যা দ্বারা তারা সত্যিই প্রভাবিত হয়েছেন। মূলত বাহিরের অবস্থা দেখে রায় দেয়ার কারণে এনারা প্রতারিত হয়েছেন।

প্রকৃতপক্ষে কি ঘটেছে, তাঁরা সেই বাস্তবতাতে প্রবেশ করতে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছেন। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে, পশ্চিমা বিশ্বের তথাকথিত **ইসলামিক সন্ত্রাসবাদ** নামক অন্যায় যুদ্ধে অত্যন্ত ধৃষ্টতা এবং ঔদ্ধত্যের সাথে তাঁরা যোগ দিয়েছেন। **সন্ত্রাসী**র বানোয়াট সংজ্ঞাটিও (যারা পশ্চিমা এবং ইসরাঈলের অত্যাচারের বিরুদ্ধে হাত তোলে, তারাই **সন্ত্রাসী**) তাঁদেরকে প্রভাতের আলো দেখাতে পারেনি। যখন তাঁরা আলো দেখবেন, তখন নিজেদেরকে রক্ষা করতে এবং গর্তে পড়ে যাওয়ার পর নিজেদেরকে তুলে আনতে বড্ড দেরি হয়ে যাবে। তাঁরা কুর'আনের সূরা হুজুরাতের সতর্কবাণী বুঝতে চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

হে ইমানদারগণ! যদি কোন পাপিষ্ঠ লোক তোমাদের নিকট (কোন খবর নিয়ে) আসে তখন তা যাচাই করো, তা না হলে তোমরা নিজেদের অজান্তে কোন সম্প্রদায়ের ক্ষতি করে ফেলবে এবং নিজেদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হবে।

[হুজুরাত ৪৯:০৬]

৯/১১-র অফিসিয়াল ব্যাখ্যা দ্বারা যারা প্রতারিত হয়েছেন তাদের জেনে রাখা উচিত যে, আমেরিকার উপর চালিত এই সন্ত্রাসী হামলার আগে এবং পরে লন্ডন, মাদ্রিদ, মুম্বাই এবং আরও অনেক জায়গায় ধারাবাহিকভাবে হামলা পরিচালিত হয়েছে। হামলার এই ইতিহাস অনেক দীর্ঘ। সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের এই বাস্তবতাকে ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁরা বুঝতে পারবেন না যতক্ষণ না বিষয়টিকে **দাজ্জাল** এবং সেই সাথে **ইয়াজুজ ও মাজুজ**-

এর মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। আর এভাবে তাঁরা প্রতারিত হতেই থাকবেন। বিষয়সমূহ উপলব্ধি করার কারণেই লেখক এই মিথ্যা দ্বারা প্রতারিত হননি।

১৯১৪ সালের গ্রীষ্মকালে পরিচালিত সন্ত্রাসী হামলার সাথে যে এই হামলার যোগসূত্র রয়েছে, লেখক সেটা ৯/১১-র হামলার দিনেই ধরে ফেলেন। এই সন্ত্রাসী হামলার তিন মাস পর *A Muslim Response to the Attack on America* নামক বইটি প্রকাশিত হয়, আর তাতে নিচের মন্তব্যটি ছিল:

> আমি বিশ্বাস করি যে, শেষ পর্যন্ত গোটা পৃথিবীকে যে কোন উপায়ে শাসন করার ব্যাপারে যারা বদ্ধপরিকর, তারাই উভয় সন্ত্রাসী হামলার জন্য দায়ী এবং আমি এও বিশ্বাস করি যে ৯/১১-র আক্রমণ, পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে ইসরাঈলি মোসাদ এবং যারা তাদের হয়ে কাজ করে তারাই দায়ী।

এই চ্যালেঞ্জের সাত বছর পর *The Islamic Travelogue* নামক বইটি প্রকাশিত হয় তাতে রয়েছে:

> ৯/১১-র দুর্ভাগ্যজনক হামলার দিন সকালে আমি নিউইয়র্কের *J F Kennedy Airport*-এ ছিলাম, ঠিক যখন আমেরিকার *CIA* এবং ইসরাঈলের মোসাদ বাহিনী মিলিতভাবে লোয়ার ম্যানহাটনের *World Trade Center*-এর *Twin Tower*-এ হামলা পরিচালনা করে এবং শেষমেশ সেটাকে বিধ্বস্ত করে। ভয়ংকর এই সন্ত্রাসী হামলার দায়দায়িত্বকে তারা কৌশলে আরব ও মুসলিমদের কাঁধে চাপিয়ে দেয়। রহস্যজনক এবং স্রষ্টাবিমুখ ইহুদি-খ্রিস্টান চক্র, যারা বর্তমানের ইউরো ইহুদি রাষ্ট্র ইসরাঈলের পক্ষে বিশ্ব-শাসন করছে, অর্থাৎ আমেরিকার *CIA* এবং ইসরাঈলের মোসাদ বাহিনী, এই হামলা পরিচালনা করেছে — আমার এই দাবীকে তারা ইচ্ছা করলে চ্যালেঞ্জ করতে পারে। আমেরিকান সরকার যে এর সাথে জড়িত রয়েছে এই সত্যটিকে যেন পাশ কাটানো যায় এবং এর দায়দায়িত্ব যাতে আরব ও মুসলিমদের উপর চাপানো যায় সে জন্যে এই ব্যাপারটিতে তারা অবশ্যই পীড়াপীড়ি আরম্ভ করে দিবে। তাদেরকে, এবং যারা এই বিশ্বাসের উপর জেদ করে বসে আছেন তাদেরকেও আমি আমন্ত্রণ জানাবো, যারাই এতে জড়িত থাকুক, আসুন আমরা তাদের বিরুদ্ধে সৃষ্টিকর্তা ও তাঁর নবী (সাঃ)-এর চূড়ান্ত অভিশাপ কামনা করি।

এসকল ঘটনা কী আকস্মিকভাবেই ঘটেছে?

'শেষ সময়ের আলামত' বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম করা সত্যিকারের মু'মিনকে বাস্তবতা মোকাবেলা করার সাহস প্রদান করে। সেই সাথে বর্তমানের আজব এই পৃথিবীতে চলমান বহু অনন্য ও রহস্যময় ঘটনার ব্যাপারে সঠিক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে সাহায্য করে। বাস্তবতাকে বুঝলে যে বিষয়গুলি পরিষ্কার হয়ে যাবে, সেগুলি হলো:

- সমকালীন **বিশ্বায়ন** এবং পুরোপুরি ঈশ্বরবিমুখ এবং ক্ষয়িষ্ণু বিশ্বব্যাপী সমাজব্যবস্থা যেখানে আজ সমগ্র মানবজাতি নিঃশেষিত হচ্ছে।
- আজকের বিশ্বব্যাপী **সরকারব্যবস্থা** এবং রাজনৈতিক একনায়কতন্ত্র যা রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বকে উপহাস করে।
- পরস্পর নির্ভরশীল বিশ্বব্যাপী **সুদভিত্তিক** অর্থনৈতিক ব্যবস্থার আগমন, যা একদিকে নজিরবিহীন স্থায়ী বিশ্বব্যাপী দারিদ্র্য আর অপরদিকে অভাবনীয় স্থায়ী সম্পদের পথ করে দিচ্ছে।
- বোগাস, জালিয়াতিপূর্ণ, *non-redeemable* **বিনিময়ের অযোগ্য**[১] কাগজি মুদ্রার ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক মুদ্রা ব্যবস্থা। যে মুদ্রা ব্যবস্থা গুটি কয়েক লোককে জালিয়াতি পন্থায় অন্যের উপার্জনকে ব্যবহার করে ধনী বানাতে সাহায্য করে। এর মাধ্যমে কোন কিছু বিনিয়োগ করা ছাড়াই তারা সম্পদ বানায়। মুদ্রা যখন তার প্রকাশিত মূল্যমান হারায়, তখন গুটি কয়েক লোক লাভবান হয় এবং অধিকাংশ মানুষকে ক্ষতির মুখোমুখি হতে হয়।
- বিশ্বব্যাপী শীঘ্রই **ক্যাশহীন** ইলেকট্রনিক মুদ্রা সম্বলিত নতুন এক আন্তর্জাতিক মুদ্রা ব্যবস্থা চালু হতে যাচ্ছে যা নিয়ন্ত্রিত হবে ইসরাঈলি রাষ্ট্রের একান্ত অনুগত আন্তর্জাতিক কেন্দ্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত ব্যাংকিং ব্যবস্থা দ্বারা।
- **নারী বিপ্লব** রাতকে (অর্থাৎ নারীকে) দিনে (অর্থাৎ পুরুষে) পরিণত করেছে এবং এই প্রক্রিয়া পরিবার ব্যবস্থাকে ভেঙ্গে ফেলেছে।
- উদ্ভট **বিনোদন** ও খেলাধুলার বড় আসর যেমন, অলিম্পিক গেম্‌স, বিশ্বকাপ ক্রিকেট, বিশ্বকাপ ফুটবল, মিস ওয়ার্ল্ড, মিস ইউনিভার্স সুন্দরী প্রতিযোগীতা, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন, এসকল আয়োজন খুবই চতুরভাবে তৈরী করা

[১] যে কাগজের নোটের পরিবর্তে ব্যাংক সমমূল্যের সোনা দিবে না, অর্থাৎ যার পরিবর্তে আসল বা প্রকাশিত মূল্য উদ্ধার করা যাবে না।

হয় যা মানুষের মনকে মোহাচ্ছন্ন করে রাখে ও তাদের দৃষ্টিকে অন্যত্র সরিয়ে দেয়। এটা কার্যকরভাবেই মানুষের দৃষ্টিকে আধুনিক যুগের ভয়ংকর বাস্তবতা থেকে অন্যত্র সরিয়ে দিচ্ছে।

- **টেলিভিশন** (এমনকি ইসলামিক টিভি চ্যানেলও) বাস্তবতাকে বিকৃত করে। কোন পর্যালোচনা ছাড়াই এই সমস্ত মিথ্যাকে যারা হজম করে, এই অনুষ্ঠানগুলি তাদের মগজ ধোলাই করে। ইসলামিক স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেলও এই ক্ষেত্রে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে ৫% বিষ ছড়াচ্ছে, ইত্যাদি।

প্রকৃতপক্ষে, বিষয়টি সত্যধর্ম ও বাতিল ধর্মকে আলাদা করতে সহায়তা করবে। সেই সাথে সত্য ধর্মের আওতার মধ্যে বাতিল ফিরকাগুলিকেও আলাদা করতে, পাঠককের কাছে এক অখন্ডনীয় প্রমাণ সরবরাহ করবে। বাতিল ধর্ম ও বাতিল ফিরকাগুলির একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো, তারা উপরে বর্ণিত বাস্তবতা এবং এই অধ্যায়ের অন্যত্র উল্লেখিত নানা রহস্যময় ঘটনা যা ক্রমাগত বিকশিত হচ্ছে, সেসবের ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম নয়।

এই সকল ঘটনা কি কেবল আকস্মিকভাবেই ঘটেছে? যদি তা না হয় তবে এসব ঘটনাকে ব্যাখ্যা করবে কে? আমরা বলি **আধুনিক যুগে শেষ সময়ের আলামত** বিষয়টিই এই সমস্ত রহস্যময় ঘটনাকে ব্যাখ্যা করতে পারে। আমি এই বিষয়টির উপর মৌলিক আলোচনা *Jerusalem in the Qur'ān* বইটিতে তুলে ধরেছি। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, **একটি শহরে**র উপর তিনি নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন, যে **শহরটি**কে তিনি ধ্বংস করেছেন। "এই শহর আমাদের" এই দাবী নিয়ে তার অধিবাসীরা আর কখনোই সেখানে ফিরে আসতে পারবে না যতক্ষণ না ইয়াজুজ ও মাজুজকে মুক্ত করে দেয়া হচ্ছে এবং তারা সবদিকে ছড়িয়ে না পড়ছে (আম্বিয়া ২১:৯৫-৯৬)। **আধুনিক যুগে শেষ সময়ের আলামত** বিষয়টি ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে আমাদের মৌলিক কর্মপন্থা হলো, ঐ **শহরটি**কে আমরা **জেরুযালেম** হিসেবে চিহ্নিত করেছি (দ্বিতীয় অধ্যায় দেখুন, কুর'আনের বিশেষ কোন আয়াতকে আমরা কিভাবে ব্যাখ্যা করবো সেই মূলনীতি নিয়ে আমরা সেখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা প্রদান করেছি)।

প্রকৃত মসীহের ভূমিকায় অভিনয় করার যে মিশন নিয়ে ভন্ড মসীহ **দাজ্জাল** নেমেছে, সে এই মুহূর্তে সেটাকে বাস্তবায়িত করার একেবারে চূড়ান্ত পর্যায়ে অবস্থান করছে। এটাই হলো আজকের আধুনিক যুগের বাস্তবতা। আর **জেরুযালেম** শহরটিকে

নিজেদের দখলে আনার জন্যে ইহুদিরা তো ইতোমধ্যেই **জেরুযালেমে** প্রত্যাবর্তন করেছে।

প্রতারক রাষ্ট্র হিসেবে পবিত্রভূমিতে ইতোমধ্যেই ইসরাঈল সফলভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই রাষ্ট্রটি ক্রমাগত আরও শক্তিশালী হচ্ছে। ইয়াজুজ ও মাজুজ নিয়ন্ত্রিত জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে তারা যুক্তরাষ্ট্রের অগণিত ভেটো পেয়ে রক্ষা পাচ্ছে। সেই সাথে নিজেদের রাষ্ট্রকে তারা ক্রমাগত সম্প্রসারিত করছে যেন **নিয়ন্তা রাষ্ট্র** হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্থান খুব শীঘ্রই দখল করে নিতে পারে। খুব শীঘ্রই একজন **যুবক, সুঠাম, কোঁকড়া চুলের অধিকারী** ইসরাঈলি রাষ্ট্রটিকে শাসন করবে এবং নিজেকে **মসীহ** হিসেবে ঘোষণা করবে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে, সে হবে ভন্ড মসীহ **দাজ্জাল**। সে যদি ইয়াজুজ ও মাজুজকে তার পদাতিক সৈন্য হিসেবে ব্যবহার না করতো তবে সে তার মিশনকে কখনোই এত দূর নিয়ে যেতে পারত না।

লেখকের ব্যাখ্যার মূল তত্ত্ব এটাই। আমি বহু বছর আগে যেসকল আনুসাঙ্গিক মন্তব্য করেছিলাম সেগুলি নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই, বরং পরীক্ষা করে দেখতে হবে এখানে দেয়া **আধুনিক যুগে শেষ সময়ের আলামত** বিষয়টির ব্যাখ্যার সত্যতা কতটুকু। ইসলাম সত্য আর এই সত্য অবশ্যই বাস্তবতাকে ব্যাখ্যা করবে। এখানে বলে রাখা প্রয়োজন যে, ইসরাঈলের সাথে সম্পৃক্ত মূল বিষয়টিতে এই অধ্যায়ে এবং বইটির অন্যত্র যখন আমরা বারবার ফিরে যাবো তাতে যেন সম্মানিত পাঠক অবাক না হন। আমরা এটা করেছি যেন পাঠক বুঝতে পারেন যে, প্রকৃত পান্ডিত্য একগুঁয়েভাবে সেই সকল থিওরীর মধ্যে আটকে থাকে না যা আজকের চলমান বাস্তবতাকে ব্যাখ্যা করতে বারংবার ব্যর্থ হয়।

অপ্রত্যাশিতভাবে এ ব্যাপারে জ্ঞানগত নিরবতা এবং সেই সাথে বিষয়টির উপর প্রকাশিত নিম্নমানের বইসমূহ বিষয়টিকে কেবল ঘোলাটেই করেছে। কুর'আনিক শব্দার্থবিদ ড. তাম্মাম আদী এই ব্যাপারটিতে মন্তব্য করতে গিয়ে লেখকের সাথে ঐক্যমত পোষণ করেছেন। তিনি সরাসরি **ইয়াজুজ ও মাজুজে**র দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন। তাঁর মন্তব্য হলো, বিষয়টিকে যাতে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা না যায় সে জন্যে স্বতস্ফূর্তভাবে তথ্য উপাত্তে ভেজাল মিশ্রিত করা হয়েছে:

> আমার বিশ্বাস আপনারাও আমার সাথে এ বিষয়ে অবশ্যই একমত হবেন যে, ইসলামি সাহিত্য এমনকি তাফসীর, হাদীসের শরাহ কিতাবসমূহও এই ব্যাপারটিতে সম্পূর্ণরূপে প্রভাবিত হয়েছে এবং কিতাবগুলিকে কাটছাট করা

হয়েছে, যেন নবী (সাঃ)-এর যামানাতেই যে ইয়াজুজ ও মাজুজের মুক্তি ঘটেছে এই বাস্তবকে জটিল করা যায় বা ঘোলাটে করা যায়।

এই বইয়ের ভূমিকায় ড. আদী আরও মন্তব্য করেছেন:

অন্যদিকে, ইয়াজুজ ও মাজুজ সম্পর্কে তাফসীরের ভুল ভ্রান্তি এবং ত্রুটিবিচ্যুতি এতটাই প্রকট যে, এমন একটি তাফসীর গ্রন্থ খুঁজে পাওয়া যাবেনা যেখানে সামান্যতম সম্ভাবনা পোষণ করা হয়েছে যে, ইয়াজুজ ও মাজুজ মুক্তি পেয়েছে। তাই কুর'আন ইয়াজুজ ও মাজুজ সম্পর্কে কি বলেছে সেটা পর্যালোচনা করে দেখাটাই সঠিক কাজ হবে।

ঈসা (আঃ)-এর অলৌকিক প্রত্যাবর্তন সম্পর্কে আমাদের এই বই সরাসরি (পাঠকের) দৃষ্টি আকর্ষণ করছে।

কেননা, তিনিই হবেন শেষ সময়ের **সকল আলামতের সবচেয়ে বড় আলামত** যেমনটির ভবিষ্যদ্‌বাণী নবী (সাঃ) করেছেন, এবং কুর'আনেও বর্ণিত হয়েছে (যুখরুফ ৪৩:৬১)। ইতিহাসের এই মহাগুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটি এখনও ঘটেনি, তবে এটি এতটাই নিকটবর্তী যে, মনে হচ্ছে এখনকার স্কুলপড়ুয়া ছেলেমেয়েরা এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করার জন্যে বেঁচে থাকবে।

নবী (সাঃ)-এর হাদীস এ ব্যাপারে আমাদেরকে বলে দিচ্ছে যে, ভন্ড মসীহ দাজ্জালকে প্রথমে ছেড়ে দেয়া হবে, কারণ আসল মসীহের ভূমিকায় অভিনয় করাই হচ্ছে তার মিশন। এই মিশনটি তাকে সম্পন্ন করতে হবে। স্বাভাবিকভাবেই এর জন্যে তাকে **জেরুযালেম** (প্রতারক রাষ্ট্র ইসরাঈল) থেকে গোটা বিশ্বকে শাসন করতে হবে, এবং তারপর ঘোষণা করতে হবে, **আমিই মসীহ**। ঠিক সেই সময় সত্যকে প্রকাশ করার জন্যে এবং দাজ্জালকে ধ্বংস করার জন্যে ফিরে আসতে পারবেন আসল মসীহ ঈসা (আঃ), তার পূর্বে নয়। কেবল তারপরেই তিনি ইয়াজুজ ও মাজুজীয় বিশ্বব্যবস্থাকে ধ্বংস করার জন্যে আল্লাহ্‌র নিকটে দু'আ করতে পারবেন, যার ভবিষ্যদ্‌বাণী নবী (সাঃ) করেছেন।

অর্থ প্রকাশের এই পদ্ধতি দাজ্জালকে চিহ্নিত করতে আমাদেরকে সক্ষম করেছে। সে-ই যে সমগ্র বিশ্বকে শাসন করার লক্ষ্যে ইয়াজুজ ও মাজুজীয় বিশ্বব্যবস্থা চালু করার পেছনে প্রধান পরিকল্পনাকারী তা আর বুঝতে বাকি নেই। পবিত্রভূমিকে চূড়ান্তভাবে দখল করার জন্যে, সেখানে ইসরাঈলি রাষ্ট্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে, এবং *Pax Judaica* অর্থাৎ বিশ্বব্যাপী ইহুদি *মেসনিক* একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার জন্যে, দাজ্জাল

এই তো কিছু কাল আগে সেখানে মধ্যযুগীয় বর্বর ইউরোপীয় ক্রুসেডারদের অভিযান চালনা করে।

ইসলামি খিলাফত ব্যবস্থাকে ধ্বংস করা ছাড়া সে এ কাজ কিছুতেই সম্পাদন করতে পারত না। তার লোকবলকে (অর্থাৎ ইয়াজুজ ও মাজুজকে) সে তার মিশনের গোড়া থেকেই ব্যবহার করে আসছে, যাতে তার লড়াইগুলিতে তারা অংশগ্রহণ করে (দেখুন, *Jerusalem in the Qur'ān* এবং *Sūrah al-Kahf and the Modern Age*)।

শেষ সময়ের আলামত বিষয়টিকে বুঝার ক্ষেত্রে কুর'আনিক চাবিকাঠি যে সূরা কাহাফ, সেটার ব্যাখ্যা আমরা *Sūrah al-Kahf and the Modern Age* বইটিতে তুলে ধরেছি। ভন্ড মসীহ দাজ্জালের কঠিন পরীক্ষা ও ফিতনা থেকে বাঁচার জন্যে নবী (সাঃ) মু'মিনদেরকে সূরা কাহাফের প্রথম দশ আয়াত তিলাওয়াত করতে বলেছেন। এটিই কুর'আনের প্রথম সূরা যা আমাদেরকে **ইয়াজুজ ও মাজুজের** সাথে পরিচয় করিয়ে দেয় এবং বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করে। আরও তাৎপর্যপূর্ণভাবে, যারা আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি সন্তান আরোপ করে, সরাসরি সে সমস্ত লোকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এই সূরাটির একটি আয়াত এভাবে আরম্ভ হয়েছে:

وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا

উপরন্তু, (এই ঐশ্বরিক বার্তা) তাদের জন্য সতর্ককারী যারা জোর দিয়ে বলে, 'মহান আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নিজের জন্য সন্তান গ্রহণ করেছেন।'

[কাহাফ ১৮:০৪]

অন্তর দিয়ে আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনা কিছু যুবকদের (দাড়ি রাখতে যারা কারো পরোয়া করেনি) কথা বর্ণনা করতে করতে এই সূরাটি সামনের দিকে অগ্রসর হয়েছে। তারা ঐ সমস্ত শত্রুর কবল থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করার জন্যে পালিয়ে গিয়েছিল, যারা ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল। তাদের শত্রুরা মহান আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে অন্যকিছুর ইবাদত করতো। আজকের এই আধুনিক যুগে যারা ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাচ্ছে তারা আসলে ঐ লোকদেরই দলভুক্ত। এরা হলো দাজ্জালের চেলা যারা কর্মঠ মুসলিম ও মুসলিম যুবকদেরকে নাজেহাল করছে। তারা এই মুসলিম যুবকদেরকে যেসব দেশ সন্ত্রাসবাদকে উৎসাহিত করে তাদের হাতে সোপর্দ করে, এবং কিউবার গুয়ান্তানামোতে অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ঘাঁটি ও আরো অনেক জায়গায় নিয়ে অত্যাচার করে। সূরা কাহাফে বর্ণিত ঐ যুবকেরা তাদের থেকে নিজেদেরকে রক্ষার জন্যে গুহায় আশ্রয় নিয়েছিল।

আল্লাহ্‌র প্রতি তাদের ঈমানকে বাচিয়ে রাখার জন্যেই ঐ যুবকেরা গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। আল্লাহ্‌র নিকটে তারা দু'আ করেছিল। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে ঘুম পাড়িয়ে দেন। তারা প্রায় ৩০০ বছর ঘুমিয়ে কাটায়। ঐশ্বরিক হস্তক্ষেপেই এই যুবকেরা অনিষ্টের হাত থেকে রক্ষা পায়। সূরাটির পরবর্তী অংশে এই গল্পের সাথে আজকের ভয়ংকর যুগের (অর্থাৎ ফিতনার যুগের) পরীক্ষা, ও নানাবিধ বিপদ-আপদের ব্যাপারে ঐশ্বরিক ওয়া'দ বা সতর্কবাণীর একটি সম্পর্ক তুলে ধরা হয়েছে। সেই যুগটি যখন আসবে তখন সা'আ বা শেষ সময়ের আলামতগুলি একের পর এক প্রকাশিত হবে:

وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا

> এভাবেই আমরা তাদের গল্পের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করেছি, যেন তারা (অর্থাৎ মানবজাতি, যখন এই বিষয়টির উপর গবেষণা বা আলোচনা করবে তখন) জানতে পারবে যে, আল্লাহ্‌র সতর্কবাণী (এমন একটা যুগের ব্যাপারে যা চরম পরীক্ষা, বিপদ-আপদ বিশিষ্ট হবে) এবং শেষ যুগ যে সত্য এবং আসন্ন সেই ব্যাপারে কোন প্রকার সন্দেহ নেই ...।
>
> [কাহাফ ১৮:২১]

মহান আল্লাহ্ তা'আলা এবং নবী (সাঃ) উভয়েরই বলে দেওয়া সেই ফিতনার যুগ তো উপস্থিত হয়েই গেছে! **সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের** মাধ্যমে পৃথিবীতে ছড়িয়ে থাকা মুসলিমদেরকে টার্গেট করা হচ্ছে এবং তাদেরকে ভীতসন্ত্রস্ত করে রাখা হচ্ছে। এটা সূরা কাহাফে বর্ণিত **ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধেরই** পুনরাবৃত্তি। এই যুদ্ধ যে **শেষ সময়ের একটি আলামত** তা চিহ্নিত করার জন্যে এই সূরাতে আলোচিত গল্পটি আমাদের পাঠকদেরকে সাহায্য করছে। ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করা **দাজ্জালের লোকেরাই** আসলে ইয়াজুজ ও মাজুজ। এটাই চিহ্নিত করতে এই সূরাটি আমাদেরকে সাহায্য করছে। আল্লাহ্ তা'আলা যে নিজের জন্য একটি সন্তান নিয়েছেন, এটা মূলত তাদেরই ঘোষণা।

ইসলামের বিরুদ্ধে পরিচালিত যুদ্ধের কবল থেকে ঈমান রক্ষার জন্যে মুসলিমদেরকে সূরা কাহাফে বর্ণিত যুবকদের ঘটনাকে অনুসরণ করতে হবে। সেই সময়, সেই যুবকেরা যুদ্ধের অশুভ স্পর্শ থেকে সরে গিয়ে নিজেদের বিশ্বাসগত অবস্থানকে জানিয়ে দিয়েছিল, অর্থাৎ এব্যাপারে তারা অনড় ছিল। তারা **কৌশলগত বিচ্ছিন্নতা** অবলম্বন করে এবং একটি গুহায় আশ্রয় নেয় এবং মহান আল্লাহ্ তা'আলার নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করে।

ইসলামের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধ ক্রমবর্ধমান ভাবে তীব্র থেকে তীব্রতর হতেই থাকবে, যতক্ষণ না মানবজাতির উপর ইসরাঈলি অশুভ *মেসনিক* রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক, অর্থনৈতিক এবং অবশ্যই সামরিক একনায়কত্ব চেপে বসছে। ইসরাঈলি রাষ্ট্র বড় আকারের যুদ্ধ বাধাতে সক্ষম। সম্ভবত, পাকিস্তানের নিউক্লিয়ার প্লান্টগুলিতে যুক্তরাষ্ট্র ও ইন্ডিয়া কর্তৃক আক্রমণ এবং সেই ফাঁকে ইরানের পরমাণু স্থাপনাগুলিতে ইসরাঈলের আক্রমণের মাধ্যমে তা সংঘটিত হতে পারে। এই যুদ্ধগুলিতে পরমাণু অস্ত্র যে ব্যবহৃত হবে তা খুবই সম্ভব। এই বইটি রচনার শেষদিকে মুম্বাই শহরে ৯/১১ ধরনের সন্ত্রাসী হামলা পরিচালিত হয়। এটা পরিষ্কার যে, এই সন্ত্রাসী হামলার মাধ্যমে পাকিস্তানের উপর চূড়ান্ত আক্রমণের পথ প্রশস্ত হচ্ছে। এই হামলার ফলে পাকিস্তান পরমাণু শক্তিধর দেশগুলির তালিকা থেকে বের হয়ে যাবে। এই বিশাল যুদ্ধগুলি সফলভাবে যখন সকল কাঁটাকে সরিয়ে ফেলবে তখনই ইসরাঈলের বিশ্বব্যাপী একনায়কত্ব মানবজাতির উপর চেপে বসবে। পৃথিবী সে সময় এমন অত্যাচার প্রত্যক্ষ করতে থাকবে যার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ, মুসলিমরা সীমান্তবর্তী জনবিচ্ছিন্ন লোকালয়গুলিতে চলে গিয়ে **কৌশলগত বিচ্ছিন্নতার** পথ অবলম্বন করতে বাধ্য হবে। যে কৌশল তাদেরকে ইয়াজুজ ও মাজুজের কালো থাবা থেকে রক্ষা করবে। এরকম যে ঘটতে যাচ্ছে নবী (সাঃ) পূর্ব হতেই তার আশংকা করেছিলেন, এবং নিম্নোক্ত উপদেশ প্রদান করেন:

يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ، وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ، يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتَنِ

> আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী (সাঃ) বলেছেন: এমন একটা সময় আসবে যখন মুসলিমদের নিকট সর্বোত্তম সম্পদ হবে বকরী বা ছাগল, সে এগুলি নিয়ে উঁচু পর্বত ও বৃষ্টিপাতের স্থানগুলিতে চলে যাবে। এই ভাবে সে দ্বন্দ্ব, সংঘাত, পরীক্ষা (ফিতনা) থেকে নিজের দ্বীনসহ পলায়ন করবে।
>
> [সহীহ বুখারী: কিতাবুল ঈমান]

এই বিচ্ছিন্ন জনপদগুলিতেই স্বাধীনতা বিরাজ করবে। তরুণেরা সেখানে দৃঢ়চেতা মুসলিম পুরুষ ও নারীদের কাছ থেকে প্রশিক্ষণ লাভ করবে। এরাই অত্যাচারের প্রতিরোধ করবে। এই মুসলিমরাই ইসরাঈলি অশুভ *মেসনিক* একনায়কতন্ত্রের সাথে শান্তি (*peace*) স্থাপনের প্রক্রিয়াকে প্রত্যাখ্যান করবে। ইসরাঈলিরা অবিরতভাবে নির্দোষ

মুসলিমদের উপর অত্যাচার চালাচ্ছে, বিশেষভাবে পবিত্রভূমিতে, যেটা তাদের রক্তের সাথে মিশে একাকার হয়ে আছে।

যে সকল ধর্ম বা মতাদর্শ সত্য জ্ঞানের দাবী করে, অবশ্যই মানবজাতির উপর জেঁকে বসা এই রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক, অর্থনৈতিক এবং সামরিক একনায়কতন্ত্রের বাস্তবতাকে ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা তাদের থাকতে হবে। ইসরাঈল বিশ্বে যে খেলা চালাচ্ছে, তার সাথে এই একনায়কতন্ত্রের যে একটা রহস্যময় ভূমিকা রয়েছে, তা খুবই পরিষ্কার। যারা এই ঘটনাগুলিকে ব্যাখ্যা করতে ব্যর্থ হবে, তাদের সত্য জ্ঞানের দাবী অন্ততপক্ষে সন্দেহে পর্যবসিত হবে। এর কারণ, বিকাশমান এই আলামতগুলি প্রতিদ্বন্দ্বি ধর্মীয়, মতাদর্শিক দল এবং ফিরকাগুলিকে একটা ফলাফল বের করার জন্যে ক্রমবর্ধমানভাবে হুমকি দিচ্ছে। আমাদের জবাব হলো, এই সমস্ত ঘটনাগুলিকে **শেষ সময়ের আলামত** হিসেবে চিহ্নিত করতে হবে।

হিন্দুবাদ, ইহুদিবাদ, খ্রিস্টবাদ, ইসলাম এবং যারা আধুনিক বিশ্বব্যবস্থাকে চালু করেছে সেই ইউরো ইহুদি-খ্রিস্টান চক্র, এরা সবাই প্রতিদ্বন্দ্বিতার সাথে সত্যের দাবী করে থাকে এবং সর্বশেষে উল্লেখিত নামটি সবচেয়ে জোর দিয়ে সত্যের দাবী জানায়। বিশ্বে চলমান এই আজব ঘটনাগুলিকে তারা কিভাবে ব্যাখ্যা করবে?

পৃথিবীতে ঘটবে এমন সব আজব ঘটনার ভবিষ্যদ্‌বাণী আজ থেকে প্রায় ১৪০০ বছর পূর্বে নবী (সাঃ) করে গেছেন, অথচ তিনি না পারতেন পড়তে, না পারতেন লিখতে। ব্যবসার কাজে দু'বার দামেস্কে গমন ব্যতীত তিনি তাঁর বাসস্থান আরবের বাহিরে কখনো যাননি। তিনি কি করে এ সমস্ত ঘটনাকে **শেষ সময়ের আলামত** হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন? উদাহরণস্বরূপ, তিনি ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছেন:

- **মহিলারা পুরুষের ন্যায় কাপড় পরিধান করবে।** আমরা কি সেটা দেখছি না? তারা এখন জ্যাকেট, ট্রাউজার পরিধান করে। এমনকি তারা *working clothes* এর সাথে টাইও পরে যা খুবই পুরুষালি। ত্রিনিদাদের *Hilton Hotel*-এ ১৪ বছর যাবত কাজ করা একজন মহিলা তার কাজের জন্যে খুবই পরিচিত ছিল। এই তো কিছু দিন আগে তাকে চরম অপমানের সাথে বাহির করে দেয়া হয়, কারণ সে নতুন ইউনিফর্ম পরতে প্রতিবাদ জানিয়েছিল, যা ছিল একেবারে পুরুষদের পোষাক। মহিলারা এখন ব্লু জিনস পরে, যা অবিকল পুরুষদের ট্রাউজারের মতো। আধুনিক নারী আন্দোলনের কারণেই তারা এ পথে অগ্রসর হয়েছে যার পরিকল্পনাকারী হলো ভন্ড মসীহ দাজ্জাল।

মা ও স্ত্রীর ভূমিকা পালনের পরিবর্তে তারা আজ পুরুষের ভূমিকা পালন করতে অগ্রসর হচ্ছে। আর এর মাধ্যমে দাজ্জাল তাদেরকে পথভ্রষ্ট করছে। এর ফলস্বরূপ অনেক যুবক ও যুবতী এখন পার্টটাইম মায়ের হাতে বড় হচ্ছে, যা তাদের জন্যে বড়ই হতাশাজনক। কিছু মহিলারা পুরুষের পোশাক পরিধান করছে পুরুষত্বকে ফুটিয়ে তোলার জন্যে, আবার কখনো অন্য নারীদেরকে আকৃষ্ট করার জন্যে। এভাবে নারীর সাথে নারীর, অর্থাৎ *lesbian* নামক যৌন সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার পথ তৈরী করে দিচ্ছে।

- **নারীরা কাপড় পরিধান করবে তারপরেও তাদেরকে উলঙ্গ মনে হবে।** দাজ্জালীয় নারী আন্দোলনের প্রভাবে নারীদের পোশাকে নগ্নতা আজ একটা সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রথমে প্রকাশিত হয় তাদের হাঁটুর নিচের তারপর সেটা হাঁটু অতিক্রম করে। সেটা এখন কিনা ভিতরের অন্তর্বাসকে উন্মুক্ত করবার হুমকি দিচ্ছে। আটসাঁট পোশাক পরিধানের ফলে নারীদের দেহ নিয়ে কল্পনার কোন কিছুই বাদ থাকছে না, কারণ তারা তাদের **সম্পদ**কে প্রদর্শন করছে। **এক টুকরা গোসলের কাপড়** শেষমেশ প্রতিস্থাপিত হয়েছে **বিকিনি** দ্বারা, আর এটা অবশেষে প্রতিস্থাপিত হয়েছে **এক টুকরা ফিতা দ্বারা**। এটা আবার কিসের দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে তা কে জানে! নারীদের এই নগ্নতার স্বাভাবিক ফলস্বরূপ যৌন বিপ্লব সাধিত হয়েছে। যেটা যৌনতাকে **সূর্যের আলোর ন্যায় সহজলভ্য** করে তুলেছে। কিন্তু **সূর্যের আলোর ন্যায় সহজলভ্য** যৌনতার পথে কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে বিবাহ এবং বৈবাহিক চুক্তি। এজন্যে বৈবাহিক প্রতিষ্ঠানকে তারা এমনভাবে আঘাত করছে যেন মনে হচ্ছে আজ তা বিলীন হয়ে যাবে। বৈবাহিক প্রতিষ্ঠানের উপর আক্রমণ এবং পর্যায়ক্রমে পরিবার ব্যবস্থার উপর প্রতিশোধমূলক আক্রমণ, সমাজকে আজ ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। আল্লাহ্‌র হারাম করা জিনিস থেকে নিজের দৃষ্টিকে যে সংরক্ষণ করবে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে অন্তর্দৃষ্টি দান করবেন। আমিন!
- **পুরুষেরা নারীদের ন্যায় পোশাক পরিধান করবে।** মুখে দাড়ি রাখা অবস্থায় পুরুষেরা নারীদের ন্যায় সজ্জিত হতে পারে না। আধুনিক পশ্চিমা সভ্যতায় পুরুষের মুখ থেকে দাড়ি ইতোমধ্যেই উধাও হয়ে গেছে। যার প্রভাব পড়েছে বাকি বিশ্বের পুরুষদের উপর। দাজ্জালের সাথে সম্পৃক্ত নবী (সাঃ)-এর এই আজব ভবিষ্যদ্‌বাণী আজ বাস্তবায়িত হয়েছে। সৌদিদের **দাড়ির প্রতি**

করুণার কারণে আজ মুসলিমদের হৃদয়ভূমিতে এই জিনিসটি চোখে পড়ছে। মুসলিমদের বিদ্যাপিঠ আল-আযহারে শায়খ হবার প্রতিযোগীতায় টিকে থাকার জন্যে দাড়িকে সম্পূর্ণভাবে মুন্ডন করা হচ্ছে। এটা অনেকটা নারীদের পুরুষের ন্যায় পোশাক পরার ন্যায়। যার মাধ্যমে অন্য পুরুষরা একে অপরের প্রতি আকৃষ্ট হয়। ব্যাপক সমকামিতা কিয়ামতের একটি আলামত। তথাকথিত গণতান্ত্রিক পশ্চিমা বিশ্ব নির্লজ্জভাবে তাদের এই বিকৃত সমকামিতাকে স্কুলগুলির উপর চাপিয়ে দিচ্ছে। মুসলিম ও বাকি মানবতার কপালে সামনে কী অপেক্ষা করছে তা সম্পর্কে একজন কানাডিয়ান মুসলিম এই লেখকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। *কানাডাতে অবস্থিত বৃটিশ কলম্বিয়ান স্কুলগুলিতে আমাদের জন্যে ব্যাপক দুর্ভোগ অপেক্ষা করছে। সরকার দু'জন সমকামিকে স্কুলের কারিকুলাম সংস্কারের জন্যে নিয়োগ করেছে। এই দু'জন, যাদের সন্তান জন্ম দেবার ক্ষমতা নেই, ক্ষমতা চালাবে ৯৯% অভিভাবকের উপর, যাদের সন্তান জন্ম দেবার ক্ষমতা আছে এবং সন্তান রয়েছে। নতুন কারিকুলামে প্রতিটি শিশুকে অন্তত ১২ গ্রেড পেতে হবে। সেখানে শেখানো হচ্ছে, সমকামিতা প্রাকৃতিক এবং নৈতিকভাবে গ্রহণযোগ্য। কোন শিক্ষক কিংবা কোন স্কুল কর্তৃপক্ষ তাতে আপত্তি জানাতে পারবে না। শিশুদেরকে শিক্ষা দেয়া হচ্ছে, পিতামাতার সম্পর্ককে প্রশ্ন করার অধিকার তাদের রয়েছে। কিন্তু কোন শিশু বা পিতামাতা সমকামিতাকে প্রশ্ন করতে পারবে না। সরকার এ ব্যাপারে কঠোরতা আরোপ করেছে যে, স্কুল কারিকুলাম সংস্কারের বিরোধীতায় কোন ধর্মীয় যুক্তি গ্রাহ্য করা হবে না। পরবর্তী বছর আরো খারাপ হবে, যখন বেসরকারি স্কুলগুলিতে তা চালু করা হবে এবং মুসলিম স্কুলগুলিকেও তা মানতে হবে অন্যথায় তাদেরকে মামলা-মুকাদ্দামার মুখোমুখি হতে হবে।* দাজ্জালীয় আধুনিক নারীবিপ্লব সমাজ-কাঠামোকে বদলানোর প্রস্তাব করছে। যার ফলস্বরূপ, নারী ও পুরুষের মধ্যাকার যৌন ও সামাজিক সম্পর্ককে আজ নতুনভাবে গঠন এবং নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করা হচ্ছে।

- **লোকেরা জনসম্মুখে গাধার ন্যায় যৌনমিলন করবে।** যৌনমিলনের পরিষ্কার দৃশ্যসম্বলিত বিকৃত পর্ণোগ্রাফি আজ এতটাই সহজলভ্য যে, তা ইন্টারনেটে *Yahoo* এবং *Hotmail webpage*, স্যাটেলাইট টেলিভিশন ইত্যাদিতে কেবল বোতাম টিপার ব্যাপার। সমগ্র পৃথিবীর শহরগুলিতে রাস্তার পাশে অবস্থিত

ভিডিও দোকানগুলিতে তা সহজেই পাওয়া যায়। আর এসব হঠাৎ করেই ঘটে যায় নি। বরঞ্চ এটা নাটকীয়ভাবে এই ভবিষ্যদ্‌বাণীকে সত্য বলে প্রতীয়মান করেছে। ভবিষ্যদ্‌বাণীটিতে বলা হয়েছে, এমন একটা সময় আসবে যখন দাজ্জালের নিয়ন্ত্রিত লোকেরা গোপনভাবে যৌনমিলন করার বদলে প্রকাশ্যে যৌনমিলন করবে। পশ্চিমা সভ্যতার বড় শহরগুলিতে জনবহুল স্থান যেমন পার্ক অথবা মোটরগাড়িতে তো তা অহরহই সংঘঠিত হচ্ছে। যা এই ভবিষ্যদ্‌বাণীর বাস্তবরূপ। সেদিন খুব বেশি দূরে নয় যখন মুম্বাই, দুবাই, করাচি, জাকার্তা, আনকারা ইত্যাদি শহরগুলি পর্ণোগ্রাফিতে প্লাবিত হবে। আর সেখানকার যুবকেরা এই **তামাশা**তে লিপ্ত হবে (একাজে লিপ্ত হওয়া কিন্তু এখন ব্যাপকভাবে আরম্ভ হয়ে গেছে)। পাঠকদেরকে এখানে একটু থামতে হবে এবং একটি আন্দোলনকে পর্যবেক্ষণ করতে হবে, যার মাধ্যমে নারীদের স্বল্প পোশাকের জায়গায় **রগরগে** পোশাক (বিভিন্ন জনবহুল অনুষ্টান যেমন ফুটবল খেলার মাঠে সাময়িক নগ্নতা) স্থান করে নিয়েছে। এরপর এই আন্দোলন সামনে অগ্রসর হতে থাকবে যতক্ষণ না জনসম্মুখে যৌনমিলনকে মেনে নেয়া হয়েছে। যৌনবিপ্লবের স্বভাবসুলভ যৌনলালসা এবং যৌনসংযোজন সম্ভবত জনসম্মুখে যৌনমিলনের প্রতি তাদের এই আগ্রহকে ব্যাখ্যা করবে। চালবাজিপূর্ণ শয়তানি প্রক্রিয়া সুলভ **জেনেটিক্যালি রিইঞ্জিনিয়ারড** খাদ্য ও পানি এবং সেই সাথে হরমোনযুক্ত ড্রাগ (যেমন, *Viagra* ভায়েগ্রা) সম্ভবত এই অনিয়ন্ত্রিত যৌনক্ষুধাকে ব্যাখ্যা করতে পারবে।

- **ক্রীতদাসী মহিলা তার কর্ত্রীকে জন্ম দেবে।** এটি এমন একটা সময়ের দিকে ইঙ্গিত করছে যা ইতিহাসের শেষ অধ্যায়ে সংঘঠিত হবে। স্থায়ী দারিদ্র্য ও দুঃখের মাধ্যমে নারীদের গর্ভ ক্রীতদাসে পরিণত হবে। দাজ্জালীয় নারীবিপ্লবের ফলে সৃষ্ট বন্ধ্যা নারীদের সন্তান জন্ম দেবার জন্যে এই গর্ভগুলি তখন ফ্যাক্টরিতে পরিণত হবে। রিবা ভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, যাতে সুদের বিনিময়ে অর্থ ধার দেয়া হয় এবং সম্পূর্ণ জালিয়াতির উপর প্রতিষ্ঠিত *non-redeemable* **বিনিময়ের অযোগ্য** মুদ্রা যা সর্বদা তার মূল্যমান হারাতে থাকে, সেই কাগজি মুদ্রার অর্থনীতি ইতোমধ্যেই অধিকাংশ মানবতাকে স্থায়ী দারিদ্র্যের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে ফেলেছে। অন্যদিকে এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সমাজের উচ্চবিত্তদের ধন সম্পদকে ক্রমশ বৃদ্ধি করছে। রিবা ভিত্তিক এই

অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উৎপত্তি ঘটেছে আধুনিক পশ্চিমা সভ্যতাতে। এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ইতোমধ্যেই সমগ্র মানবজাতিকে তার ফাঁদে ফেলেছে। উপরন্তু, দাজ্জালীয় নারীবিপ্লব নারীদেরকে বন্ধ্যা বানিয়ে দিয়েছে, কারণ সমাজে তারা পুরুষের ভূমিকাকে আয়ত্ত করতে চাইছে। ফলস্বরূপ তারা গর্ভধারণকে পেছনে ফেলে দিয়েছে। আর (যখন মা হতে ইচ্ছে হয়) তখন তাদেরকে (বিকল্প মায়ের) গর্ভ ভাড়া করতে হয়। গরিব এই *surrogate mother* **বিকল্প মা**য়েরা সন্তান জন্ম দেয়ার জন্যে মজুরী পায়। অতঃপর তারা আবার তাদের দাসত্বে ফিরে যায়। আর তার কন্যা **ক্রীতদাসদের মনিব** শ্রেণীতে চলে যায়। যারা ক্রীতদাসদের শাসন করে। মূলত এভাবেই ক্রীতদাসী মহিলা তার মহিলা কর্ত্রীকে জন্ম দেয়।

- **নগ্ন শরীর খালি পায়ের বেদুইনরা একে অপরের সাথে উঁচু ভবন তৈরীর প্রতিযোগিতা করবে।** ইতোমধ্যেই সমগ্র পৃথিবী ম্যানহাটন মডেলের গগনচুম্বি ইমারত তৈরীর প্রজেক্টকে অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে অনুসরণ করে চলেছে। এই কাজটি তারা এমন অন্ধভাবে করছে যেন মানুষের সাফল্য ও সম্মানের প্রতীক এই উঁচু ভবন। অইউরোপীয়দের বিশ্বাস, এই উঁচু ভবনসমূহ তাদের মর্যাদা বাড়াচ্ছে। তারা বুঝাতে চাইছে যে, তাদের কুয়ালালামপুরের **পেট্রোনাস** টুইন টাওয়ার, সিউলের **সংদো ইনচিওন** টাওয়ার, দুবাইয়ের **বুরুজ** ইত্যাদি ভবনগুলি এখন আধুনিক পশ্চিমা ইউরোপীয় বিশ্বের **উন্নত সমাজের** সমতুল্য এবং তারা এখন আর গরিব নয়, নয় মধ্যযুগীয় পশ্চাদপদ জাতি। মূলত এসব লোকদের জ্ঞানগত অবস্থা অনেকটা **নগ্ন শরীর খালি পা বিশিষ্ট বেদুইন**দের মতো। নবী মুস্তফা (সাঃ)-এর সময়কার বেদুইনদেরকে কখনো কখনো **নগ্ন শরীর খালি পা বিশিষ্ট বেদুইন** বলা হতো। কুয়েত, কাতার, আমিরাত, সৌদি আরবে আজ তারা একে অপরের সাথে নিজেদের বিল্ডিংয়ের উচ্চতা বৃদ্ধির প্রতিযোগিতায় মগ্ন রয়েছে, যা এই ভবিষ্যদ্‌বাণীকে আক্ষরিকভাবে বাস্তবায়িত করেছে।
- **সবচেয়ে মন্দ লোকেরা নেতা হবে এবং যে কোন গোত্রের সবচেয়ে মন্দ ব্যক্তিটি হবে গোত্রের নেতা। লোকজন তাদের মেনে চলবে, তাদের নেতৃত্বের সম্মানে নয় বরং তাদের দ্বারা সংঘঠিত খারাপ পরিণতির ভয়ে।** সমগ্র বিশ্বে এমনকি আমাদের ক্যারিবিয় দ্বীপপুঞ্জেও এই ভবিষ্যদ্‌বাণী

ইতোমধ্যেই বাস্তবায়িত হয়েছে। যাই হোক পৃথিবীর কোথাও এটি এতটা পরিষ্কারভাবে ঘটে নি, যতটা ঘটেছে যুক্তরাষ্ট্রে।

- নবী (সাঃ) বললেন: **আমি তোমাদের ছাদে বৃষ্টির ন্যায় হার্‌জ পড়তে দেখছি।** তারা জিজ্ঞাসা করলেন: **'হার্‌জ কি?'** তিনি উত্তরে বললেন, হত্যা ও গণহত্যা। তিনি (সাঃ) ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছেন, হত্যা, গণহত্যার আধিক্য শেষ যুগে এতটাই নিরবিচ্ছিন্ন এবং কান্ডজ্ঞানহীনভাবে হবে যে, **নিহত ব্যক্তি জানবে না কেন তাকে হত্যা করা হয়েছে, আর যে হত্যা করছে সেও জানবে না কেন সে হত্যা করছে।** তিনি আরো ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছেন, **প্রতিটি অতিক্রান্ত দিন থেকে সামনে আসা নতুন দিনটি আরো মন্দ হবে।** আজকের বিশ্বে ধ্বংসাত্মক অপরাধ দিনদিন বৃদ্ধিই পাচ্ছে। কোন সরকার ব্যবস্থাই তা রোধ করতে পারছে না। হত্যা এবং গণহত্যাকে মদদ দেয়ার পেছনে পশ্চিমা সভ্যতার, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের, সুখ্যাতি রয়েছে।

এইসব ভবিষ্যদ্‌বাণীর পাশাপাশি আরো অনেক ভবিষ্যদ্‌বাণী রয়েছে যা শেষ সময়ের আলামত হিসেবে সংঘঠিত হবে। কিন্তু এক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হলো, জেরুযালেম ও পবিত্রভূমির নিয়তি। তাই, কুমারী মরিয়মের পুত্র ঈসার (আল্লাহ্‌ তা'আলার করুণা ও রহমত তাদের উভয়ের প্রতি বর্ষিত হউক) অলৌকিক প্রত্যাবর্তন সম্পর্কে নবী (সাঃ) ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছেন:

> আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী (সাঃ) বলেছেন: "আল্লাহ্‌র শপথ যার হাতে আমার প্রাণ, অবশ্যই মরিয়মের পুত্র {ঈসা (আঃ)} তোমাদের মাঝে ফিরে আসবেন এবং মানবজাতির মাঝে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করবেন (শাসক হিসেবে), ক্রুশ ভেঙ্গে ফেলবেন, শুকর হত্যা করবেন এবং জিযিয়া কর (ন্যায় যুদ্ধে আটককৃত শত্রু এবং তাদের ভূমি থেকে জরিমানাস্বরূপ যে কর আদায় করা হয়, সেটা) থাকবে না। ধনসম্পদের পরিমাণ এতটাই বেড়ে যাবে যে কেউ তা গ্রহণ করবে না এবং (নামাযে) আল্লাহ্‌ তা'আলার প্রতি একটি সিজদাহ নিবেদন করাটা হবে দুনিয়া এবং এর মাঝে যা আছে তা থেকে উত্তম।" আবু হুরাইরা আরো বলেন: "তুমি ইচ্ছা করলে এই আয়াতটি পাঠ করতে পারো":
>
> وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا
>
> **তাঁর** মৃত্যুর পূর্বে আহলে কিতাবদের মাঝে এমন একজনও (ইহুদি বা খ্রিস্টান) বাকি থাকবে না যে তাঁর {ঈসা (আঃ)-এর} মৃত্যুর পূর্বে তাঁর প্রতি ঈমান (অর্থাৎ

ঈসা (আঃ) যে আল্লাহ্‌র রসূল এবং একজন মানুষ, এই বিশ্বাস) না আনবে, এবং বিচারের দিনে তিনি তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবেন। — নিসা ৪:১৫৯।

[সহীহ বুখারী]

বেশ কিছু আজব ঘটনা নিয়ে আমরা এখন আলোচনা করবো, যা বিশ্বে ক্রমশ ঘটে চলেছে। ঘটনাগুলি পবিত্রভূমির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। **শেষ সময়ের আলামতের** ব্যাপারে নবী (সাঃ)-এর ভবিষ্যদ্‌বাণী এবং বিশেষভাবে **দাজ্জালের লোকবল** অর্থাৎ ইয়াজুজ ও মাজুজের ব্যাপারে নবী (সাঃ)-এর ভবিষ্যদ্‌বাণীর আশ্রয় গ্রহণ ব্যতীত এই সব আজব ঘটনার ব্যাখ্যা প্রদান করাটা অসম্ভব।

পবিত্রভূমির তথাকথিত **স্বাধীনতা** অর্জিত হয়েছে অস্ত্রের মাধ্যমে। আর এটা ইউরো খ্রিস্টানদের **ক্রুসেড** নামক সেই *Holy Wars* দিয়ে আরম্ভ হয়েছিল। ১০০০ হাজার বছর পর ১৯১৭ সালে ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনী যখন উসমানিয় বাহিনীকে পরাজিত করে তখন সেই *Holy Wars*-এর সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। ব্রিটিশ জেনারেল আলেনবি বিজয়ীর বেশে জেরুযালেমে প্রবেশ করেন এবং ঘোষণা করেন, "*today the Crusades have ended* আজ ক্রুসেডের সমাপ্তি হলো"। পবিত্রভূমিকে **স্বাধীনতা** প্রদানের পরিবর্তে একে আসলে দখল করা হয়েছে। ইউরোপীয় ক্রুসেডাররা ইসলাম এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে আজও সেই যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। ইঙ্গ-মার্কিন ইহুদি সেনাবাহিনী ইরাকে ও আফগানিস্তানে স্বয়ং উপস্থিত থেকে, এবং সোমালিয়া, সৌদি আরব, পাকিস্তান, লেবালন, জর্দান, মিসর ও অন্যান্য দেশে প্রক্সির মাধ্যমে তাদের সেই *Holy Wars* চালিয়ে যাচ্ছে।

- পবিত্রভূমি তাদের, এই দাবী নিয়ে পবিত্রভূমিতে বনি-ইসরাঈলি ইহুদিদের প্রত্যাবর্তন হয়েছে। [এরা ইউরোপীয় **খাযার** ইহুদিদের থেকে আলাদা; **খাযার** ইহুদিদের ইব্রাহীম (আঃ)-এর সাথে কোন রক্তসম্পর্ক নেই]। ২০০০ বছর আগে পবিত্রভূমি থেকে বনি-ইসরাঈলি ইহুদিরা বহিষ্কৃত হয়। তাদের উপর ঐশ্বরিক নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়, পবিত্রভূমি তাদের এই দাবী নিয়ে তারা কখনো এই শহরে (পবিত্রভূমিতে) ফিরে আসতে পারবে না (এবং এই ঐশ্বরিক নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকবে শেষ সময় নিকটবর্তী হওয়া পর্যন্ত এবং ইয়াজুজ ও মাজুজের মুক্তি পর্যন্ত)। পবিত্রভূমির দাবী এবং তা পুনরায় দখল করতে গিয়ে সেখানকার নিরীহ অইহুদি ফিলিস্তিনিদের তারা নির্মম, জঘন্য এবং বর্বরীয় অত্যাচারের যাঁতিকলে আটকে দিয়েছে।

- পবিত্রভূমিতে পুনরায় ইসরাঈলি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নবী দাউদ (আঃ) ও সুলায়মান (আঃ) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত পবিত্র ইসরাঈল রাষ্ট্র ২০০০ বছর পূর্বে আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ বলে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছিল। এই পবিত্র রাষ্ট্রটি ঈশ্বর প্রদত্ত সত্য এবং ন্যায়বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। সেই পবিত্র রাষ্ট্রটি এখন একটি ভন্ড প্রতারক ইসরাঈলি রাষ্ট্র দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছে। আর এই ভন্ড প্রতারক রাষ্ট্রের ভিত্তি হলো ঈশ্বরহীনতা, মিথ্যা, প্রতারণা এবং ক্রমবর্ধমান অত্যাচারের স্টিমরোলার।
- চলমান অত্যাচারপূর্ণ যুদ্ধ এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক যুলুম নির্যাতনের মাধ্যমে পশ্চিমা সভ্যতার আন্দোলন পরপর তিনটি **নিয়ন্তা রাষ্ট্র** দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে এবং হবে। প্রথমটি ছিল *Pax Britannica* অর্থাৎ ব্রিটেন যখন পৃথিবীর নিয়ন্তা রাষ্ট্র ছিল। এরপর আসে *Pax Americana* অর্থাৎ যখন পৃথিবীর দ্বিতীয় নিয়ন্তা রাষ্ট্র হিসেবে আমেরিকার উদয় হয়েছে। বিশ্ব সবশেষে আসন্ন *Pax Judaica*-র জন্যে অপেক্ষা করছে, যার মাধ্যমে ভন্ড ইসরাঈলি রাষ্ট্রটি হবে এরূপ তৃতীয় এবং শেষ **নিয়ন্তা রাষ্ট্র**। যুক্তরাষ্ট্র যখন ব্রিটেনের স্থলাভিসিক্ত হয়, পৃথিবী তখন পরপর দু'টি বিশ্বযুদ্ধ প্রত্যক্ষ করে। একইভাবে পৃথিবী আজ সকল যুদ্ধের সেরা যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করছে যেটা চালাচ্ছে ইসরাঈল (যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ন্যাটো এবং অন্যান্যদের সহায়তায়)। এর মাধ্যমে ইসরাঈল বিশ্বের **নিয়ন্তা রাষ্ট্র** হিসেবে চূড়ান্তভাবে আমেরিকাকে স্থলাভিষিক্ত করবে। ইসরাঈল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কেবলমাত্র ইহুদিদের বসবাসের জন্যে এই মিথ্যাটি সম্পূর্ণরূপে ফাঁস হয়ে যাবে, যখন ইসরাঈল হবে বিশ্বের **নিয়ন্তা রাষ্ট্র**।
- পবিত্রভূমিকে মুক্ত করার জন্যে ইউরোপ সুদীর্ঘ ১০০০ বছর ধরে সংগ্রাম চালিয়ে এসেছে যেন একটি সাম্রাজ্যবাদী ইসরাঈলি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা যায়। আমরা বিশ্বাস করি যে, ইরান ও পাকিস্তানের পরমাণু ক্ষমতাকে ধ্বংস করাটাই হলো এই **মহাযুদ্ধের** প্রাথমিক উদ্দেশ্য। এই পথ ধরেই আরবদের ধ্বংসের পথ খুলে যাবে (সপ্তম অধ্যায় দেখুন)। উত্তর পাকিস্তান, সমগ্র ইরান, ইরাক ও আফগানিস্তান ভৌগোলিকভাবে প্রাচীন খোরাসান অঞ্চলের সীমানাভুক্ত। নবী (সাঃ)-এর কথা অনুযায়ী সেখান থেকে এমন এক মুসলিম সেনাবাহিনীর আবির্ভাব ঘটবে যারা অপ্রতিরোধ্যভাবে জেরুযালেমের দিকে এগিয়ে চলবে এবং তাদের পথে অবস্থিত সকল অত্যাচারিত দেশকে স্বাধীন

করে দিবে। ইসরাঈল যখন সেই মহাযুদ্ধ আরম্ভ করবে, তখন সে কেবল সুয়েজ খালকেই দখল করবে না, বরং সেই সাথে পারস্য উপসাগরের তেলও দখল করবে, এবং ঠিক সেই সময়ে তারা সুবিধামতো তেলের মূল্য বাড়িয়ে দেবে। এরফলে মার্কিন ডলারে ক্রমশ ধ্বস নেমে আসবে (কারণ, তেলের মূল্য এবং বাণিজ্য মার্কিন ডলারের সাথে সম্পৃক্ত)। ইসরাঈল বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে তখন এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করবে যেন সে আমেরিকার স্থলাভিষিক্ত হয়ে যায়।

- মার্কিন ডলারে ধ্বস এবং তার সম্ভাব্য বিলুপ্তি ইসরাঈলের জন্যে এক মহা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, কারণ এর পথ ধরেই বিশ্বের সকল *non-redeemable* **বিনিময়ের অযোগ্য** কাগজি মুদ্রা একই পরিণতি বরণ করবে। ইহুদি নিয়ন্ত্রিত বিশ্ব ব্যাংকিং ও ইলেকট্রনিক মুদ্রা তখন কাগজি মুদ্রার স্থান দখল করে নেবে। এর ফলে পৃথিবী নতুন এক মুদ্রা ব্যবস্থার দিকে অগ্রসর হবে। এ ব্যবস্থায় নামবিহীনভাবে অর্থের লেনদেন এবং বিনিময় করা যাবে না। প্রতিটি অর্থনৈতিক লেনদেন এবং কারবার ইলেকট্রনিক হস্তক্ষেপ ও সেই সাথে সন্ত্রাসবিরোধী আইনের অধীনে পরিচালিত হবে, যেন বিশ্বের সকল মুদ্রার উপর ইসরাঈলি দমনপীড়ন নীতি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। এভাবে, মানবজাতির উপর অশুভ *মেসনিক* একনায়কতন্ত্রকে চাপিয়ে দেবার পথ প্রশস্ত হবে। ইসরাঈল যখন বিশ্বকে শাসন করবে সে সময় তাদের ঘোষিত **ইতিহাসের মেসিয়ানিক সমাপ্তি**কে যুক্তিযুক্ত প্রমাণ করার জন্যে পশ্চিমা ধর্মনিরপেক্ষ পন্ডিতবর্গ, সেই সাথে রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক রাঘব বোয়ালেরা, এক আজব, রহস্যময় জ্ঞানপাপে লিপ্ত হবে। জেরুযালেম থেকে বিশ্ব শাসনকারী এক শাসকের আবির্ভাব না হওয়া পর্যন্ত তারা এই কাজ করতে বাধ্য থাকবে। সেই শাসক নিজেকে মসীহ হিসেবে ঘোষণা করবে কিন্তু সে হবে আসলে ভন্ড মসীহ দাজ্জাল।
- উপরে যা বর্ণিত হয়েছে এবং সামনে যা ঘটতে যাচ্ছে তার সবকটিকে বাস্তবায়িত করার পেছনে নায়কদ্বয় হলো, ইউরোপীয় ইহুদি ও ইউরোপীয় খ্রিস্টান। তাদের মধ্যাকার অতীতের দ্বন্দ্বমুখর এবং ঘৃণার সম্পর্ককে মিটিয়ে ফেলে তারা রহস্যময় এক ইহুদি-খ্রিস্টান চক্র তৈরী করেছে, যেটা আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ পশ্চিমা সভ্যতাকে জন্ম দিয়েছে। এটা এমন এক ঈশ্বরহীন ক্ষয়িষ্ণু সভ্যতা যেখানে একজন পুরুষ বৈধভাবে আরেকজন পুরুষকে বিবাহ

করতে পারে। এই সভ্যতা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও প্রযুক্তি দ্বারা বিশ্বকে মোহিত করে রেখেছে, যেটা বিশ্বের কালপ্রবাহকে বদলে দিয়েছে এবং মানবজীবনকে নতুন আঙ্গিকে গঠন করেছে।

ইহুদি-খ্রিস্টানদের মাঝে সংগঠিত এই রহস্যময় মিত্রতার পথ ধরে তৈরী হয়েছে **ইহুদি-খ্রিস্টান চক্র,** এটাকে ব্যাখ্যা করবে কোন্ জিনিস? ঈসা (আঃ)-কে পুজা করা খ্রিস্টানরা ঈসা (আঃ)-কে ক্রুশবিদ্ধ করার অপরাধে ইহুদিদেরকে দোষী সাবস্ত করেছিল। ইহুদিদের গর্বভরা এই কাজটিকে কুর'আন যথাযথভাবে সংরক্ষণ করেছে:

وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ

তারা গর্বভরে বলে, 'আমরা আল্লাহ্‌র নবী মরিয়ম পুত্র ঈসাকে ক্রুশবিদ্ধ করেছি (যেহেতু তারা তাঁকে মসীহ হিসেবে মানত না, না মানত তাঁকে আল্লাহ্‌র রসূল হিসেবে, এখানে তাদের বিদ্রূপাত্মক কথা প্রকাশ পাচ্ছে)।

[নিসা ৪:১৫৭]

এমন কিছু তো অবশ্যই রয়েছে, যা তাদের এই অবাক করা বন্ধুত্ব, একত্রীকরণ ও মিত্রতাকে কেবল ব্যাখ্যাই করবে না, সেই সাথে জনসম্মুখে ঘোষিত তাদের নতুন পরিচয় *allied powers* অর্থাৎ **মিত্রশক্তি**কেও ব্যাখ্যা করবে। এতে সন্দেহ নেই, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নাৎসিদের দ্বারা ইউরোপে ইহুদি হত্যার রহস্যময় ঘটনা (যাকে কখনো কখনো ইহুদি নির্মূল অভিযান *holocaust* হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়) এ ব্যাপারে বড় ধরনের একটা মনস্তাত্ত্বিক কারণ হিসেবে কাজ করেছে। এর ফলে, ইউরোপীয় খ্রিস্টান্‌রা নিজেদেরকে এই ঘটনার জন্যে সম্পূর্ণরূপে দোষী মনে করতে থাকে। এটাই তাদের ঐতিহাসিক মিত্রতাকে বেগবান করেছে। **নির্মূল অভিযান** বা *holocaust*-এর ব্যাপারে পশ্চিমা সভ্যতার নিয়ন্ত্রকেরা এতো আবেগপ্রবণ কেন? যারাই **৬০ লক্ষ ইহুদি নির্মূল অভিযানে** বৈধতা সম্পর্কে তাদের প্রশ্ন করেছে, এ ব্যাপারে তারা তাদেরকে নীরব পেয়েছে। তাদের এই অদ্ভুত আচরণের কারণে ৬০ লক্ষ ইহুদি নির্মূল অভিযানটি বৈধ না অবৈধ সেব্যাপারে তারা আর মাথা ঘামায় না। এই জাতি দু'টি অন্য কোন উপায়ে একে অন্যের সাথে মিশে গিয়ে দুর্বল হতে চায় না।

অনন্য ও গতিশীল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিপ্লব-সমৃদ্ধ আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ সভ্যতা তৈরী করার মাধ্যমে, ইউরোপে সংগঠিত রহস্যময় মিত্রতাটি বাকি বিশ্বকে চমকে দিয়েছে। এটা তাদেরকে নজিরবিহীন ক্ষমতার অধিকারী করেছে। **চক্রটি** তাদের নবউদ্ভাবিত ক্ষমতা বাকি অইউরোপীয় বিশ্বে আক্রমণ, দখল, অত্যাচার, দমন এবং

উপনিবেশি স্থাপনে ব্যবহার করছে। ইতিহাসে প্রথমবারের মতো, বিশ্বকে দু'টি জাতি শাসন করছে। অইউরোপীয় বিশেষ করে আরব ও মুসলিমদের উপর উদ্দেশ্যমূলকভাবে এই বর্বর আক্রমণ চালানো হয়েছে, পরবর্তীতে তাকে সভ্যতার সংঘাত হিসেবে চালিয়ে দেওয়া হয়েছে। সোমালিয়া, উত্তর পশ্চিম পাকিস্তান, লেবানন, আফগানিস্তান, ইরাক, ইরান, যেখানেই মুসলিম সভ্যতা রয়েছে, এবং যেখানেই এই অন্যায় যুলুমকে প্রতিরোধ করা হচ্ছে, সেখানেই এই অত্যাচার চলছে। একদিকে চলছে ক্রুসেডীয় নির্যাতন যার শিকার নিরীহ জনতা অর্থাৎ মুসলিম সভ্যতা, অন্যদিকে এই **ইহুদি-খ্রিস্টান চক্র** রহস্যজনকভাবে ইসরাঈলের পক্ষ নিয়ে পবিত্রভূমিতে যুলুম নির্যাতন চালাচ্ছে।

অইউরোপীয় বিশ্বকে তারা চতুরভাবে উপনিবেশ-মুক্ত করেছে, তবে সেই কাজটি করেছে তাদের নিয়মকানুনকে সে সব দেশে সফলভাবে প্রতিষ্ঠার পর। এর মাধ্যমে উপনিবেশ-মুক্ত বিশ্বকে তারা প্রক্সির মাধ্যমে (অর্থাৎ তাদের দালালদের মাধ্যমে) অত্যন্ত নিখুঁতভাবে নিয়ন্ত্রণ করছে। সেখান থেকেই তারা তাদের জিহাদ চালিয়ে যাচ্ছে।

এই প্রতিষ্ঠানগুলির একটি হলো, শির্কের উপর প্রতিষ্ঠিত আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। ইউরো ইহুদি-খ্রিস্টান সভ্যতা একদা ঈশ্বরের সার্বভৌমত্ব এবং তাঁর চূড়ান্ত ক্ষমতার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। ইউরো খ্রিস্টানরা, **ঈশ্বরের প্রতিনিধি স্বরূপ** অর্থাৎ রোমের গির্জা ও রাজার ঐশ্বরিক ক্ষমতার প্রতি ঈমান এনেছিল। কিন্তু ইউরোপীয় খ্রিস্টানদের মাঝে এক আজব এবং বৈপ্লবিক পরিবর্তন সংঘঠিত হয়, যার ফলে ইব্রাহীমের ঈশ্বরের সার্বভৌমত্বকে সেখানে আর মেনে নেওয়া হয় না। ঈশ্বরের ক্ষমতা এবং তাঁর আইনকে চূড়ান্ত হিসেবে এই সভ্যতা নাকোচ করে দিলো। ফলে, **আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র** স্বীকৃতি পেল সার্বভৌম হিসেবে, যা শির্ক। এই রাষ্ট্রের ক্ষমতা এবং আইনকে চূড়ান্ত হিসেবে মেনে নেয়া হলো, যা ছিল শির্ক। ইব্রাহীমের ঈশ্বরের ঘোষণাকৃত হারামকে হালাল করার ক্ষমতা এই রাষ্ট্রের রয়েছে। এই কাজে তারা অনেক দূর এগিয়ে গেছে, আর এটাও শির্ক।

অন্যদিকে ইহুদি সভ্যতা দাউদ এবং সুলায়মান (আঃ) কর্তৃক নির্মিত পবিত্র ইসরাঈলি রাষ্ট্রের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই রাষ্ট্রে ঈশ্বরের সার্বভৌমত্ব এবং তাঁর ক্ষমতা ও আইনই ছিল চূড়ান্ত। ইউরোপীয় ইহুদিদেরকে এবং সেই সাথে আল্লাহ্ তা'আলার সাথে বিদ্রোহী আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে যখন তারা গ্রহণ করলো, রাষ্ট্রের এই ধারণা তখন বাতিল হয়ে যায়। পবিত্র কুর'আন সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছে, যেমন সূরা কাহাফ (১৮:২৬), বনী ইসরাঈল (১৭:১১১),

الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

যার অধিকারে রয়েছে আসমান এবং পৃথিবীর রাজত্ব।

[ফুরকান ২৫:০২]

এখানে পরিষ্কারভাবে বলে দেয়া হয়েছে যে, সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার এবং এতে তিনি কাউকেও অংশীদার করেন না। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রিয় ব্যবস্থায় মানবজাতিকে বন্দি করার পর ইহুদি-খ্রিস্টান সভ্যতা এই ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলিকে *United Nations Organization* বা **জাতিসংঘের** (যা *League of Nations*-এর পরে প্রতিষ্ঠিত হয়) মাধ্যমে আটকে ফেলেছে। নিজেদের ইচ্ছামতো বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণের জন্যে জাতিসংঘের গঠনকাঠামোকে তারা তাদের মনমতো বানিয়ে নিয়েছে।

উপরে বর্ণিত এই সমস্ত ঘটনাকে ব্যাখ্যা করে **শেষ সময়ের আলামত,** যার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে দাজ্জাল এবং ইয়াজুজ ও মাজুজের বিবরণ।

এই প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে আরও একটি হলো, *non-redeemable* অর্থাৎ **বিনিময়ের অযোগ্য** কাগজি মুদ্রার অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, যা অত্যন্ত সুচতুরভাবে উদ্ভাবিত হয়েছে এবং কৌশলে উপনিবেশ-মুক্ত বিশ্বের উপর চাপানো হয়েছে। জনগণ তাদের শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যেন বিদ্রোহ না করে সেটা নিশ্চিত করার জন্যে, এক্ষেত্রে তারা তাদের বোগাস ও সম্পূর্ণ জালিয়াতিপূর্ণ মুদ্রাব্যবস্থাকে ব্যবহার করে। যারা এ ব্যবস্থাকে মেনে নিয়েছে এবং সহায়তা করেছে তারা ধনী হয়ে গেছে। এর ফলস্বরূপ কিছু মুসলিম দাজ্জালের **আগুনে** নিক্ষিপ্ত হয়েছে, আর অন্যরা তার **ঠান্ডা নদীতে** আনন্দ সুখে লিপ্ত রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, সোমালিয়া, বাংলাদেশ, ইন্দোনেশিয়ার কিছু মুসলিম দাজ্জালের বিরোধিতা করায় তাদের উপর নেমে এসেছে দরিদ্রকরণ প্রক্রিয়া এবং চরম দারিদ্র্য। অপরদিকে, বিশ্বাসঘাতক উচ্চবিত্ত শ্রেণীর তথাকথিত মুসলিমরা পশ্চিমের খরিদদারে পরিণত হয়েছে এবং ইসলামের শত্রুদের সাথে মিলেমিশে কাজ করছে। ফলস্বরূপ তারা কেবল ধনী থেকে আরও ধনী হয়ে চলেছে।

ব্রিটেন যখন আধুনিক বিশ্বের প্রথম **নিয়ন্তা রাষ্ট্র** ছিল তখন আন্তর্জাতিক মুদ্রা ছিল **ব্রিটিশ স্টার্লিং পাউন্ড**। বিশ্বের মুদ্রাব্যবস্থার উপর দীর্ঘ নিয়ন্ত্রণ ব্রিটেনকে বিশ্বের বাণিজ্যিক রাজধানীতে পরিণত করে, এবং বিশ্বকে শাসন করার ক্ষেত্রে এক তাৎপর্যময় ভূমিকা পালন করে। এরপর যুক্তরাষ্ট্র নিয়ন্তা রাষ্ট্র হিসেবে ব্রিটেনের জায়গা দখল করে এবং তার স্বাভাবিক ফলস্বরূপ আন্তর্জাতিক মুদ্রা হিসাবে মার্কিন ডলার ব্রিটিশ স্টার্লিং

পাউন্ডের জায়গা নিয়ে নেয়। মুদ্রাব্যবস্থার উপর তখন থেকে যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ চলে আসছে যা তাদেরকে বিশ্বের বাণিজ্যিক রাজধানীতে পরিণত করেছে এবং বিশ্বকে শাসন করার ক্ষেত্রে একই রূপ তাৎপর্যময় ভূমিকা পালন করছে।

শেষ সময়ের আলামতের ব্যাপারে নবী (সাঃ)-এর ভবিষ্যদ্‌বাণীর যুক্তিভিত্তিক গবেষণা আমাদেরকে এই ইঙ্গিত প্রদান করছে যে, শীঘ্রই তৃতীয় আরেকটি **নিয়ন্তা রাষ্ট্রে**র আবির্ভাব ঘটতে যাচ্ছে যেটা যুক্তরাষ্ট্রের জায়গা দখল করে নিবে। কিন্তু সেটা হতে গেলে মার্কিন ডলারের পরিবর্তে নতুন মুদ্রাব্যবস্থার আবির্ভাব হতে হবে।

কেন্দ্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত বিশ্ব ব্যাংকিং ব্যবস্থা সম্বলিত ক্যাশবিহীন নতুন এক ইলেক্ট্রনিক মুদ্রাব্যবস্থার আবির্ভাব ঘটতে যাচ্ছে। ব্যাংকিং ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রকেরা ইসরাঈলের গোপন এজেন্ডাকে এগিয়ে নেবার জন্যে ক্যাশহীন মুদ্রার উপর তাদের অনন্য এবং নজিরবিহীন নিয়ন্ত্রণকে ব্যবহার করবে। ফলস্বরূপ, ইসরাঈল বিশ্বের তৃতীয় এবং শেষ **নিয়ন্তা রাষ্ট্র** হিসেবে সামনে আসবে। ইসরাঈলি মুদ্রা শেকেল-এর মূল্য ইতোমধ্যেই নজিরবিহীনভাবে বেড়ে চলেছে, যেহেতু এখন ডলারে ধ্বস নামছে।

২০০৮ সালের গোড়ার দিকে, বিশ্বের সম্ভাব্য মুদ্রা অর্থাৎ ইসরাঈলি শেকেলের সাথে প্রতিযোগিতায় শক্তিশালী মুদ্রা ইউরোও কঠিন সময় পার করেছে। বিশ্বের কেন্দ্রে পরিণত হবার এটা যে একটি আলামত সেটি উপলব্ধি করে ইসরাঈলিরা এখন জেগে উঠতে শুরু করেছে।

মুদ্রাব্যবস্থাতে উপরে বর্ণিত জালিয়াতি এবং ধাপে ধাপে এক নতুন মুদ্রাব্যবস্থার জন্ম, খুব শীঘ্রই ইসরাঈলকে বিশ্ব শাসনের কেন্দ্রে পৌঁছে দেবে। **শেষ সময়ের আলামতে**র অন্তর্গত **দাজ্জাল** এবং সেই সাথে ইয়াজুজ ও মাজুজের দিকে ইঙ্গিত করা ব্যতীত এই ব্যাপারটিকে কখনোই ব্যাখ্যা করা যাবে না।

এরূপ আরো একটি প্রতিষ্ঠান হলো, ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাব্যবস্থা যার শীর্ষে রয়েছে আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়গুলি। শিক্ষার ধর্মনিরপেক্ষিকরণ প্রক্রিয়া বিশ্বপ্রকৃতি এবং বাস্তবতাকে ধর্মনিরপেক্ষভাবে ব্যাখ্যা করতে উদ্বুদ্ধ করে। **শেষ সময়ের আলামত** বিষয়টির আলোচনা সেখানে তো একেবারে বেমানান। শেষ সময়ের অস্তিত্বকে আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ মানবজাতি বিশ্বাস করে না বলেই তাদের নিকট **শেষ সময়ের আলামত** বিষয়টি একেবারেই অর্থহীন।

কুর'আন ধর্মনিরপেক্ষ এই ব্রেইনওয়াশ বা মগজধোলাইকে উল্লেখ করেছে। সূরা কাহাফে এর উল্লেখ রয়েছে আর এটাই হচ্ছে সেই সূরা যেখান থেকে ইয়াজুজ ও মাজুজ বিষয়টির সূচনা হয়েছে। শেষ দিন ও মৃত্যুর পরের জীবন সম্পর্কে উদ্ভট চিন্তার অধিকারী ধর্মনিরপেক্ষ মানসিকতার এক ব্যক্তির কাহিনী এই সূরাটিতে আলোচিত হয়েছে। ধনসম্পদের অহমিকায় লোকটি এতটাই দুর্নীতিপরায়ণ হয়ে উঠেছিল যে, সে নিজেকে **বিশেষ কেউ** *'somebody'* ভাবতে আরম্ভ করেছিল। দরিদ্রতার জন্যে গরিব লোকটিকে সে **মূল্যহীন ব্যক্তি** *'nobody'* হিসেবে আখ্যায়িত করেছিল। ধনী লোকটি শেষ দিন সম্পর্কে বলে:

وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا

আমি মনে করি না যে শেষ সময় আসবে, এমনকি যদি (এসেও পড়ে), আর আমাকে আমার সৃষ্টিকর্তার নিকটে সম্মুখীন করানো হয় তা হলেও আমি আরো ভাল স্থানই পাবো।

[কাহাফ ১৮:৩৬; আরো দেখুন ফুসসিলাত ৪১:৫০ এবং সাবা ৩৪:০২]

শেষ সময় ও তার **আলামত** {যেখানে দাজ্জাল, ঈসা (আঃ), ইয়াজুজ ও মাজুজ ইত্যাদি বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে} মু'মিনকে এই বিষয়গুলির প্রত্যাখানকারী ও চরম অবজ্ঞাকারী থেকে আলাদা করে দেয়, এবং সেই সকল ব্যক্তি থেকে আলাদা করে দেয় যারা (ঠাট্টাসহকারে) শেষ সময়ের ঘটনাগুলিকে দ্রুত ঘটতে দেখতে চায়। কুর'আন বলছে, আসলেই অধিকাংশ মানুষ শেষ দিনকে অবিশ্বাস করে:

يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيد

যারা একে অবিশ্বাস করে (ঠাট্টাসহকারে) তারা এর ঘটনাসমূহ দ্রুত দেখতে চায়। কিন্তু যারা মু'মিন তারা জানে এটা অবশ্যই সত্য। যারা শেষ দিনকে অস্বীকার করে তারা চরমভাবে পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে।

[শূরা ৪২:১৮]

إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ

নিশ্চিতভাবে শেষ দিন আসবে এতে কোন রকমের সন্দেহ নেই, যদিও অধিকাংশ মানুষই তা অবিশ্বাস করে।

[গাফির ৪০:৫৯]

ধর্মীয় বিশ্বাসকে ধ্বংস করে ফেলার জন্যে ইউরোপীয় ধর্মনিরপেক্ষতা এবং বস্তুবাদ একত্রে জোটবদ্ধ হয়েছে। শেষ দিনের উপর বিশ্বাসের প্রতি সেজন্যেই তারা আঘাত হেনেছে। ইউরোপের সাথে একজোট হয়ে তথাকথিত উপনিবেশ-মুক্ত বিশ্ব ঈশ্বরহীন এক সমাজব্যবস্থা তৈরীর জন্যে কাজ করছে। বিশ্বায়নের ধীরগতির কিন্তু নিশ্চিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য একটাই – মানবজাতিকে একটি ঈশ্বরহীন সমাজে পরিণত করা। এ কারণেই অইউরোপীয় বিশ্ব ধর্মীয় আচার-আচরণকে পিছনে ফেলে দিতে আরম্ভ করেছে এবং তার পরিবর্তে ধর্মনিরপেক্ষ, ক্ষয়িষ্ণু ও ঈশ্বরহীন পশ্চিমা জীবনধারাকে গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষ পশ্চিমা সভ্যতাকে বাস্তবে নিয়ে আসার কারিগর, সেই রহস্যময় ইউরোপীয় **ইহুদি-খ্রিস্টান চক্রের** জন্য এটা এক মহা অর্জন।

কিন্তু সভ্যতার সবচেয়ে অভূতপূর্ব ঘটনাটি সংঘঠিত হচ্ছে অন্যত্র। সমগ্র মানবজাতিকে দমন এবং ক্ষয়িষ্ণু ঈশ্বরহীন এক বিশ্ব সমাজব্যবস্থার মাধ্যমে শোষণের আড়ালে পরিচালিত হচ্ছে এই অভূতপূর্ব ঘটনাটি। ইহুদিদের জন্যে পবিত্রভূমিকে মুক্ত করা, সেখানে তাদের ফিরিয়ে আনা, এই ভূমি তাদের বলে দাবী করা, পবিত্রভূমিতে ইসরাঈলি রাষ্ট্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা, বিশ্বের **নিয়ন্তা রাষ্ট্রে** পরিণত হওয়া পর্যন্ত তাকে সাহায্য ও সহায়তা প্রদান করা, ইত্যাদি কাজে লিপ্ত রয়েছে এই রহস্যময় ইউরোপীয় **ইহুদি-খ্রিস্টান চক্র**।

আধুনিক যুগে শেষ সময়ের আলামত বিষয়টি ইসলামের সত্যতার দাবীকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করছে, কেননা ইসলাম ইউরোপে ইহুদি এবং খ্রিস্টানদের মাঝে সংগঠিত রহস্যময় **মিত্রতাকে** ব্যাখ্যার পাশাপাশি ধর্মনিরপেক্ষ, ক্ষয়িষ্ণু এবং ঈশ্বরহীন পশ্চিমা সভ্যতার জন্মকেও ব্যাখ্যা করে। দাজ্জাল এবং ইয়াজুজ ও মাজুজই ইহুদি এবং খ্রিস্টানদের মধ্যে সংগঠিত **মিত্রতাকে** ব্যাখ্যা করে। পবিত্রভূমির প্রতি ইউরোপীয়দের অবাক করা মোহকে ইসলামই ব্যাখ্যা করে।

যেহেতু সামনে যা ঘটতে যাচ্ছে তার পূর্বাভাস দেবার ক্ষমতা ইসলামের রয়েছে, অতএব ইসলামের সত্যতার দাবী আরো দৃঢ়ভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। বিশেষ করে ইসরাঈলি রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে **সকল কথা ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা** কুর'আনের রয়েছে, কুর'আনই সেটা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেছে:

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ

আমরা এই কিতাব নাযিল করেছি যাতে রয়েছে সকল বিষয়ের ব্যাখ্যা। আর রয়েছে মুসলিমদের জন্যে হেদায়েত, রহমত, এবং সুসংবাদ।

[নাহ্‌ল ১৬:৮৯]

ইসলামি ফিরকা পর্যবেক্ষণ

বর্তমানে এমন অনেকে রয়েছেন যারা ফিরকাবাজির ঢোল বাজাচ্ছেন আর জোর দিয়ে দাবী করছেন, কেবল তারাই সঠিক পথপ্রাপ্ত মু'মিনদের দল। তারা ফিরকাবাজির প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে উসকে দিতে আনন্দ পান, বিশেষ করে পথভ্রষ্ট সুফী সম্প্রদায়গুলি। তুচ্ছ বিষয় নিয়ে পরস্পরের চুল ছেড়াছেড়ি চলছে। নিতান্তই গুরুত্বহীন বিষয়গুলিকে তুলে আনা হচ্ছে। প্রতিদ্বন্দ্বি ফিরকারা যেভাবে সত্যের দাবী করে, এই বইটি সরাসরি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে এবং তাদেরকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে, পারলে তারা **আধুনিক যুগে শেষ সময়ের আলামত** অর্থাৎ **দাজ্জাল** এবং **ইয়াজুজ ও মাজুজ** বিষয়টির উপর জ্ঞানপূর্ণ কাজ করে আনুন।

এমন অনেক পাঠক থাকতে পারেন যাদের ইসলামি ফিরকা সম্পর্কে কোন ধারণাই নেই। সে জন্যে ফিরকা সম্পর্কে তাদেরকে অন্ততপক্ষে কিছুটা জানানো প্রয়োজন। অনেক পাঠকই ইসলামি ফিরকাগুলিকে সনাক্ত করতে আগ্রহী। কেননা নবী (সাঃ) ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছেন, ইসলামে বিভিন্ন ফিরকা আবির্ভূত হবে। সেই সাথে বলে গেছেন, তাদের থেকে দূরে থাকতে। তাই মুসলিমদের জন্যে এমন একটা মানদন্ড থাকা প্রয়োজন যার মাধ্যমে তারা এইসব ফিরকাগুলিকে সনাক্ত করতে পারবে। **শেষ সময়ের আলামত** বিষয়টি এবং এই আলামতের প্রতি সাড়া দেবার পদ্ধতিটাই এরূপ একটা মানদন্ড। **দাজ্জাল** এবং **ইয়াজুজ ও মাজুজ** নিশ্চিতভাবে **শেষ সময়ের আলামত** বিষয়টির অন্তর্ভূত। সঙ্গত কারণেই বিষয়টি ইসলামি ফিরকাগুলিকে যাচাই করার জন্য উপযুক্ত হাতিয়ার।

শি'আ ফিরকা

নবী (সাঃ) মৃত্যুর কিছু কাল পরেই শি'আ ফিরকার জন্ম। এর মাধ্যমেই ইসলাম ধর্মে ফিরকাবাজির আবির্ভাব ঘটে। নবী (সাঃ)-এর ভবিষ্যদ্‌বাণীর মাঝে যে বিশ্বাসটিকে তারা সযত্নে লালন করেছে তা হলো, নবী (সাঃ)-এর বংশ থেকে ইমাম

মাহদী নামের একজনের আবির্ভাব হবে। ইসলামের বিরুদ্ধে যারা যুদ্ধ করে তিনি তাদের বিরুদ্ধে মুসলিমদেরকে বিজয়ী করবেন। এরূপ ঘটনা যে ঘটবে সেটা নবী (সাঃ) তাঁর ভবিষ্যদ্‌বাণীতে বলেছেন এবং শি'আ ও সুন্নী উভয়েই তা কঠোরভাবে বিশ্বাস করে। শি'আরা আরো বিশ্বাস করে যে, ইসলাম সম্পর্কে তাদের দাবীকে ইমাম আল-মাহদীর আগমন বৈধতা প্রদান করবে।

যাই হোক নবী (সাঃ) পরিষ্কারভাবে বলে গেছেন, প্রকৃত মসীহ মরিয়ম পুত্র ঈসা (আঃ)-এর প্রত্যাবর্তনের সমসাময়িককালে ইমাম মাহদীর আগমন ঘটবে। তিনি বলেছেন:

كيف انتم إذا نزل ابن مريم فيكم و إمامكم منكم

তোমাদের কি অবস্থা হবে (কিরূপ আশ্চর্যপূর্ণ সময় তোমাদের জন্যে আসবে) যখন মরিয়ম পুত্র {ঈসা (আঃ)} তোমাদের মাঝে প্রত্যাবর্তন করবেন এবং তোমাদের ইমাম (ইমাম আল-মাহদী) হবেন তোমাদের মধ্য থেকে।

[সহীহ বুখারী]

মুসলিমদের ইমাম মুসলিমদের মধ্য থেকে হবে এই ভবিষ্যদ্‌বাণী ইঙ্গিত করছে যে, সেই সময়ের কিছু কাল আগে মুসলিমরা অমুসলিমদের দ্বারা শাসিত হবে। অন্যকথায়, মুসলিমরা তাদের নিজেদেরকে শাসন করার স্বাধীনতাটুকুও হারিয়ে ফেলবে। অবশ্যই আমরা দেখতে পাচ্ছি **খিলাফত** পরবর্তী সময়ে সুন্নী বিশ্ব আজ (কার্যত) ইউরোপীয় ইহুদি ও খ্রিস্টানদের দ্বারা শাসিত হচ্ছে। সেসব দেশের তথাকথিত মুসলিম শাসককেরা পশ্চিমাদের তাবেদারে পরিণত হয়েছে। তাদের এই ভয়ানক থাবা থেকে বাঁচতে পারা, এবং ইহুদি-খ্রিস্টানদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ ছিন্ন করে নিজেদেরকে শাসন করার স্বাধীনতাটুকু অর্জন করা এখন সুন্নী রাষ্ট্রগুলির পক্ষে অসম্ভব।

অন্যদিকে, শি'আ ইরান দাবী করছে যে, সফল ইরানী ইসলামিক বিপ্লব তাদেরকে বিশ্ব শাসনকারী অমুসলিমদের নিয়ন্ত্রণ ও তাদের নাগপাশ থেকে মুক্ত করেছে। যতক্ষণ পর্যন্ত, শি'আ ইরান পশ্চিমাদের বিরোধিতা বজায় রাখবে (ইমাম আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ আল-খোমেনি যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধিতা করেছিলেন, তাই তারা তাঁকে **মহা শয়তান** *Great Satan* বলেছিল) এবং সফলভাবে নিজেদেরকে শাসন করার বিষয়টি ধরে রাখবে, ততদিন শি'আরা নিজেদের শাসন করার জন্যে তাদের মধ্যাকার বৈধ ইমাম বা নেতার আনুগত্যকে মেনে নিবে। এর নিহিতার্থ হলো, ইমাম আল-মাহদীর আগমন এবং ঈসা

(আঃ)-এর প্রত্যাবর্তন সম্পর্কিত উপরের হাদীস অনুসারে শি'আদের সত্যের দাবীটি অবশ্যই সুস্পষ্ট হতে হবে।

এই হাদীসটি পরিষ্কার করছে যে, ইমাম আল-মাহদীর আগমন ততক্ষণ পর্যন্ত সম্ভব হবে না যতক্ষণ না ঈসা (আঃ)-এর প্রত্যাবর্তনের সময় নিকটবর্তী হচ্ছে। কিন্তু ঈসা (আঃ) প্রত্যাবর্তন করতে পারবেন না যতক্ষণ না দাজ্জাল প্রকৃত মসীহের ভূমিকায় অভিনয় সম্পন্ন করছে। দাজ্জাল তার অভিনয়ের মিশন সম্পন্ন করতে পারবে না যতক্ষণ না পবিত্রভূমি ইহুদিদের জন্যে মুক্ত করা হচ্ছে এবং এই পবিত্রভূমি তাদের, এই দাবী নিয়ে নির্বাসিত ইহুদিরা সেখানে ফিরে না আসছে।

সূরা আম্বিয়ার ৯৫-৯৬ আয়াতে কুর'আন নিজেই ঘোষণা করেছে, একটা **শহর** থেকে তাদেরকে বহিষ্কার করা হয়েছে, (আমরা সেই শহরটিকে জেরুযালেম হিসেবে চিহ্নিত করেছি) এবং সেখানে তারা শুধু তখনই ফিরে আসতে পারবে যখন দু'টো জিনিস সংঘঠিত হবে:

- ইয়াজুজ ও মাজুজদেরকে মুক্ত করে দেয়া হবে এবং
- তারা সকল দিকে ছড়িয়ে পড়বে।

পবিত্রভূমি তাদের, এই দাবী নিয়ে ইসরাঈলি ইহুদিরা এখন জেরুযালেমে ফিরে এসেছে। এটি খুবই স্পষ্ট যে, **ইয়াজুজ ও মাজুজ** এবং সেই সাথে **দাজ্জালের** বিষয়টিকে উপলব্ধি ও মোকাবেলা থেকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করা শি'আদের সত্যের দাবীকে বাতিল করে দেবে। আধুনিক বিশ্বকে নাড়া দেয়া বিষয়গুলির উপর শি'আদের পান্ডিত্যপূর্ণ কাজের জন্যে বিশ্ব অপেক্ষা করছে।

আহমাদিয়া বা কাদিয়ানি

সমসাময়িক ইসলামি বিশ্বের পথভ্রষ্ট ফিরকার গ্যালাক্সিতে যে ফিরকাটি রহস্যজনকভাবে আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ সভ্যতা এবং ইসরাঈলি রাষ্ট্রের সুনজর অর্জন করেছে সেটি হলো, আহমাদিয়া আন্দোলন। চরম পথভ্রষ্ট এবং গোমরাহ ফিরকাটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, ইউরোপীয় সভ্যতার মাঝে যে ইয়াজুজ ও মাজুজ রয়েছে, এর প্রতিষ্ঠাতা মির্জা গোলাম আহমাদ তা সঠিকভাবে চিহ্নিত করেছেন। প্রকৃতপক্ষে, এই ভন্ড নবী আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আশ্চর্যজনকভাবে সঠিক ছিলেন। এ সমস্ত বাস্তবতা সত্ত্বেও তিনি আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার নিকটে এতটাই প্রসিদ্ধ ছিলেন যে, আজও

তার আন্দোলন তাদেরই মদদে সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। দাজ্জাল এবং সেই সাথে ইয়াজুজ ও মাজুজকে ভ্রান্তভাবে চিহ্নিত করার মাধ্যমে মির্জা গোলাম আহমাদ **শেষ সময়ের আলামত** বিষয়টিকে ঘোলাটে করে ফেলেছেন (দেখুন The Antichrist and Gog and Magog, মুহাম্মদ আলি, তারিখ বিহীন, *www.aaiil.com*)।

মরিয়ম পুত্র ঈসা (আঃ)-এর প্রত্যাবর্তন সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্‌বাণী তার মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়েছে, এই মিথ্যা দাবী তুলে মির্জা গোলাম আহমাদ বিশ্বকে অবাক করে দেন। প্রকৃত মসীহের প্রত্যাবর্তন সম্পর্কিত নবী (সাঃ)-এর ভবিষ্যদ্‌বাণীকে মেনে নেওয়ার পরিবর্তে উল্টো সে দাবী করেছে, কাশ্মিরে ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যু হয়েছে এবং সেখানেই তাঁকে সমাহিত করা হয়েছে, তিনি আর ফিরে আসবেন না। আসলে এই ভবিষ্যদ্‌বাণী তাকে (অর্থাৎ মির্জা গোলাম আহমাদকে) লক্ষ্য করেই করা হয়েছিল বলে সে দাবী করে। গোলাম আহমাদ এই দাবীর মাধ্যমে নির্লজ্জভাবে এই সত্যটিকে ভুলে যায় যে, সে একজন পাঞ্জাবী মহিলার সন্তান। নবী (সাঃ) পরিষ্কারভাবে বলেছেন যে, যে মসীহ প্রত্যাবর্তন করবেন তিনি হবেন কুমারি মরিয়মের পুত্র:

> ... ঠিক সেই সময়েই আল্লাহ্ মরিয়ম পুত্র ঈসা (আঃ)-কে প্রেরণ করবেন। দামেশকের পূর্ব দিকে সাদা মিনারে তিনি অবতরণ করবেন। তাঁর পরনে থাকবে দু'টুকরো কাপড়ে তৈরী পোশাক যা হালকা জাফরানি রঙের হবে। দু'জন ফেরেশতার ডানায় ভর করে তিনি নামবেন। যখন তিনি মাথা ঝুঁকাবেন তখন তাঁর মাথা থেকে স্বেদবিন্দু ঝরে পড়বে আর যখন তিনি মাথা উঠাবেন তখন তাঁর মাথা থেকে মুক্তার মতো স্বেদবিন্দু ঝরে পড়বে। তাঁর দেহের গন্ধ পাওয়ামাত্র প্রতিটি কাফির মারা যাবে, তাঁর নিশ্বাস ততদূর পৌঁছাবে যতদূর দৃষ্টি পৌঁছায় ...
>
> **[সহীহ মুসলিম]**

> হুযায়ফা ইবনে উসায়েদ গিফারী থেকে বর্ণিত: "আমরা আলোচনায় ব্যস্ত থাকা অবস্থায়, হঠাৎ আল্লাহ্‌র নবী (সাঃ) আমাদের কাছে আসলেন। তিনি বললেন: "তোমরা কি নিয়ে আলোচনা করছো?" সাহাবীগণ বললেন: 'আমরা শেষ সময় নিয়ে আলোচনা করছিলাম।' তখন তিনি বললেন: "*দশটি আলামত যতক্ষণ না দেখতে পাও ততক্ষণ শেষ সময় দেখতে পাবে না। তিনি ধোঁয়া, দাজ্জাল, [মাটির] জানোয়ার, পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়, মরিয়ম পুত্র ঈসা (আঃ)-এর আগমন, ইয়াজুজ ও মাজুজ এবং তিনটি স্থানে - পূর্বের কোন স্থানে, পশ্চিমের কোন স্থানে, এবং আরবদেশে - ভূমি ধ্বসের কথা উল্লেখ করেন, যার শেষে*

ইয়েমেন থেকে আগুন ছড়াতে থাকবে, ফলে মানুষ তাড়া খেয়ে তাদের মিলন স্থলে গিয়ে জড়ো হবে।"

[সহীহ মুসলিম]

আহমাদিয়ারা যদি সত্য ইসলাম ধারণ করে থাকে তাহলে তাদের উভয় দলের পন্ডিতদের উচিত হবে ২০০২ সালে প্রকাশিত *Jerusalem in the Qur'ān* বইটি সম্পর্কে তাদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা।

ওহাবী ফিরকা

আজব এবং পথভ্রষ্ট ফিরকাসমূহের মাঝে রহস্যময় আরেকটি ফিরকা হলো, ওহাবী ফিরকা। এই ফিরকাটির আবির্ভাব ঘটেছে আরবের নজদ অঞ্চল থেকে। এরা তাদের প্রতিদ্বন্দ্বি সকল মুসলিমদেরকে **মুশরিকুন** হিসেবে আখ্যায়িত করে এবং আরো ঘোষণা করে যে, সেসব লোকদেরকে হত্যা করাটা ওয়াজিব। নজদের এই ওহাবী ফিরকা সৌদি বংশের সাথে হাত মিলিয়ে, প্রথমত নজদ এবং পরে ইসলামের হৃদয়ভূমি আরবের হেজাজকে দখল করতে। তারা হেজাজ দখল করতে আগ্রহী হয় যেন সেখান থেকে শির্ককে - তারা যাকে **শির্ক** মনে করে - দূর করতে পারে এবং সেখানে সত্যিকারের ঈমান প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। এতে কৃতকার্য হয়ে, তারা সেখানের হাজার হাজার নিরীহ মুসলিমদেরকে হত্যা করে। তবে, রহস্যময় এই সৌদি ওহাবী চক্রের হীন উদ্দেশ্য পরিষ্কার হয়ে যায়, যখন তারা ষড়যন্ত্রমূলকভাবে আরবে একটি **ইঙ্গ-মার্কিন তাবেদার রাষ্ট্র** প্রতিষ্ঠা করে এবং ধৃষ্টতার সাথে তার নাম রাখে **সৌদি আরব**। এই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্যে তারা **দারুল ইসলাম** এবং সেই সাথে নবী (সাঃ)-এর প্রতিষ্ঠিত **খিলাফতকে** ধ্বংস করে দেয়। মূলত তারা দাজ্জাল কর্তৃক প্রতারিত হয়েছে। ইসলামের প্রতি তাদের এই বিশ্বাসঘাতকতা ইয়াজুজ ও মাজুজকে কুর'আনে বর্ণিত [আম্বিয়া ২১:৯৫-৯৬] সেই রহস্যময় কাজটি সম্পন্ন করতে সাহায্য করে। ঈমানদারদের সাথে ভ্রাতৃত্ব স্থাপনের পরিবর্তে সৌদি-ওহাবী চক্রটি মিলিত হয়েছে ইউরোপীয় **ইহুদি-খ্রিস্টান চক্রের** সাথে।

ইসলামের হৃদয়ভূমি নিয়ে এরূপ আনুষ্ঠানিক লেনদেন ইহুদি-খ্রিস্টান চক্রের জন্যে এতটাই গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে, একজন আমেরিকান প্রেসিডেন্ট সৌদি বাদশাহের সাথে একান্ত সাক্ষাতের জন্যে যুদ্ধজাহাজ নিয়ে চলে আসেন। মার্কিন রণতরী *Murphy* (মার্ফি) গোপনে বাদশাহ আবদুল আজিজ বিন সউদকে আরব বন্দর জেদ্দা থেকে মিসরের সুয়েজ খালের গ্রেট বিটার লেকে (বিখ্যাত তিক্ত হ্রদে) নিয়ে আসে। সেখানে

মার্কিন জাহাজ *Quincy* কুইন্সির ডেকে অপেক্ষা করছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট। ১৯৪৫ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারি এই দুই নেতা তাদের মধ্যাকার মিত্রতাকে চূড়ান্ত করেন। এই মিত্রতার তিক্ত ফল সৌদি ওহাবীরা ভোগ করে তিন বছর পর, যখন ইসরাঈলি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। আমেরিকা ইসরাঈলকে স্বীকৃতি প্রদানকারী প্রথম দেশ হওয়ায় গর্ববোধ করে।

বাস্তবতা হলো, সৌদি-মার্কিন এই মিত্রতা যে আজও টিকে আছে তাই নয়, বরং এটি আরও উন্নত হচ্ছে। ১৯৪৮ সালের আকস্মিক ঘটনা পরিষ্কারভাবে আমাদেরকে বলে দিচ্ছে যে, ইসলামের সাথে বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে সহযোগী ছিল এই **ওহাবী ফিরকা**।

যতক্ষণ পর্যন্ত এই **সৌদি ওহাবী চক্র** ইউরোপীয় **ইহুদি-খ্রিস্টান চক্রের** সাথে তাবেদার সম্পর্ক বজায় রাখছে ততক্ষণ পর্যন্ত কোন মুসলিম দেশ বা মুসলিম জামাতের জন্য এটা অসম্ভব যে, তারা **হিজাজ, হারামাইন** এবং **হজ্বের নিয়ন্ত্রণ** তাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেবে। ফলে, এই ভুঁইফোড় ফিরকাটি, (যারা দাবী করে যে সত্য ইসলাম শুধু তাদের কাছে রয়েছে), প্রধানত ইউরোপীয় ইহুদি-খ্রিস্টান চক্রের হাতে মুসলিম বিশ্বকে শাসন করার ক্ষমতা তুলে দিয়েছে। (দেখুন, The Caliphate the Hejaz and the Saudi-Wahhabi Nation-State, www.imranhosein.org)।

বুখারিতে বর্ণিত একটি হাদীসে নবী (সাঃ) নজ্‌দের এরূপ বিশ্বাসঘাতকতার আগাম পূর্বাভাস দিয়েছিলেন। তাতে রয়েছে, নজ্‌দ থেকে আবির্ভূত হবে:

الزلازل و الفتن وبهايطلع قرن الشيطان

ভূমিকম্প, ফিতনা ফ্যাসাদ এবং শয়তানের **'ক্বারন'** (শিং)।
[সৌদি বংশ এবং ওহাবী ফিরকা উভয়েই নজ্‌দ থেকে আবির্ভূত]

[সহীহ বুখারী]

নজ্‌দের ভৌগোলিক সীমানা নিয়ে অনেক মতভেদ রয়েছে, অনেকের মতে তা আরবের বাহিরে ইরাকে অবস্থিত। কিন্তু নবী (সাঃ)-এর ভবিষ্যদ্‌বাণী যে সত্য তার অকাট্য প্রমাণ রয়েছে। আমেরিকা ও ইসরাঈলের হাত থেকে নিজেদের ভূমিকে রক্ষার জন্যে ইরাকের সাহসী মুসলিমরা অস্ত্র নিয়ে জিহাদ করেছে। অন্যদিকে সৌদি আরবের নজ্‌দের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতারা নির্লজ্জভাবে ধর্মের নামে অত্যাচারীদের সাথে তাদের 'শয়তানি মিত্রতা'কে বজায় রেখেছে।

শেষ সময়ের সাথে সম্পৃক্ত কুর'আনের আয়াত এবং হাদীসের **আক্ষরিক ব্যাখ্যা** প্রদান করতে হবে, আধুনিক যুগে এটাই হচ্ছে সৌদি ওহাবীদের **এক অদ্ভূত** আকিদা। আর এ ব্যাপারে তারা কঠোর। ফলস্বরূপ, (কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া) ধর্মীয় রূপক অর্থ, দাজ্জাল, ইয়াজুজ ও মাজুজের বাস্তবতাকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা ও মোকাবেলা করতে তারা অক্ষম। অপরদিকে, শি'আ ধর্মীয়পন্ডিতরা কুর'আন ও হাদীসের ধর্মীয় রূপক অর্থকে ব্যাখ্যা করতে বেশ আগ্রহী। এ কারণেই, এই বইয়ে প্রদানকৃত বিভিন্ন ব্যাখ্যাকে গ্রহণ করার ব্যাপারে অন্যদের তুলনায় আমরা শি'আদেরকে বেশি আগ্রহী পাবো।

তাবলীগ জামা'আত (জামা'আতে তাবলীগ)

আরেকটি আজব ও রহস্যময় ভারতীয় ফিরকা হলো তাবলীগ জামা'আত। এরা তাদের দলভূক্তদেরকে **তাবলীগের সাথী** হিসেবে আখ্যায়িত করে। মানুষদেরকে তারা নবী (সাঃ)-এর **গুরুত্ববিহীন সুন্নাহ**র দিকে (যার অধিকাংশই বাতিল এবং জাল সুন্নাহ - অনুবাদক) আহ্বান ও পরিচালিত করে। তাদের দলে এমন অনেকই রয়েছেন, বাহ্যিকভাবে যারা বেশ ধার্মিক জীবনযাপন করে থাকেন।

অরাজনৈতিক এই ফিরকাটির ক্ষেত্রে সবচেয়ে আজব ও রহস্যময় ব্যাপার হলো, আরব এবং মুসলিমরা ৯/১১-র ঘটনা ঘটিয়েছে, আমেরিকান সরকারের এই মিথ্যা দাবীকে প্রশ্নবিদ্ধ করে, এমন কোন সংলাপ বা আলোচনাতে অংশগ্রহণের পরিবর্তে তারা বরাবরের মতোই এ ব্যাপারে অনাগ্রহী। নবী (সাঃ) পরিষ্কারভাবে বলেছেন, মুসলিমদেরকে ভিন্ন এক পন্থায় অত্যাচারের মোকাবেলা করতে হবে। **দাজ্জাল** সম্পর্কে তিনি বলেছেন:

> নওয়াস বিন সাম'আন থেকে বর্ণিত, নবী (সাঃ) বলেছেন: "আমি জীবিত থাকা অবস্থায় যদি তার আবির্ভাব ঘটে তাহলে, তোমাদের পক্ষ নিয়ে আমি তার বিরুদ্ধে মোকাবেলা করবো। আমি জীবিত না থাকা অবস্থায় যদি তার আবির্ভাব হয় তবে তোমরা প্রত্যেকে তার বিরুদ্ধে মোকাবেলা করবে।"
>
> [সহীহ মুসলিম]

আল্লাহ্ তা'আলার মসজিদগুলিকে নিজেদের দখলে আনার মাধ্যমে এবং অন্যদেরকে সেখানে ইসলামের প্রচার, শিক্ষা দিতে কঠোরভাবে বাধা দেওয়ার মাধ্যমে এই ফিরকার লোকেরা ইসলামের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। জ্ঞানচর্চার জন্য অন্য কাউকে তারা মসজিদ ব্যবহার করতে দেয় না। ধর্মনিরপেক্ষ আধুনিক পশ্চিমা সভ্যতা

কর্তৃক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং নানাপন্থায় মুসলিমদের উপর পরিচালিত অত্যাচারের ব্যাপারে এই ফিরকাটি **বালির মধ্যে মাথা লুকিয়ে রাখার** ভূমিকা অবলম্বন করেছে। তাদের ভুল কর্মপদ্ধতির জন্যে তারা যে আধুনিক যুগে দাজ্জাল এবং সেই সাথে ইয়াজুজ ও মাজুজের বাস্তবতাকে বুঝতে পারেনি শুধু তাই নয়, তাদের পলিসি এবং উসূল হিসেবে অথবা ঝামেলা বা আপদ মনে করে এই বিষয়টিকে তারা বর্জন করেছে।

চিন্তার বিষয় হলো, ইসলামের শত্রুদের এই রহস্যময় ফিরকা সম্পর্কে একমাত্র চিন্তা যে এদের মধ্যে (*Malcolm X*) ম্যালকম এক্স-এর মতো অনুপ্রাণিত আরো অনেক মুসলমান ঢুকে পড়তে পারে। কেননা, যেসব মুসলিমরা **গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাহ**কে আঁকড়ে ধরেছে এবং আধুনিক যুগে ইউরোপীয় **ইহুদি-খ্রিস্টান চক্রে**র অন্যায় যুদ্ধের বিরুদ্ধে এবং তাদের বর্ণবাদ এবং অন্যায় নির্যাতনের বিরুদ্ধে নির্ভীকতার সাথে জিহাদ করছে, তাদের নিয়ে তারা ঠিকই চিন্তিত।

তবে, তাবলীগ জামা'আতের পন্ডিতরা **আধুনিক যুগে শেষ সময়ের আলামত** বিষয়টির উপর কাজ করবেন, বিশ্ব সেই অপেক্ষা করছে।

আধুনিক ইসলামপন্থী

আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ পশ্চিমা সভ্যতার বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত অর্জন এবং রাজনৈতিক, সামরিক ক্ষমতা ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি দেখে এই ফিরকাটি মুগ্ধ হয়ে গেছে। এই সভ্যতার ক্ষমতা এবং অর্জনকে তারা স্বীকৃতি প্রদান করে এবং ধর্মনিরপেক্ষ পশ্চিমা সভ্যতা সত্যের যে দাবী করে তাকে বৈধ হিসেবে মেনে নেয়। এমনকি তাদের অনেকে তো দাবীই করে বসেছে, ধর্মনিরপেক্ষ পশ্চিমা সভ্যতা নাকি ইসলামেরই ফসল এবং ইসলামের বিকশিত সকল ভাল জিনিসকে নাকি এই সভ্যতা ধারণ করে। খিলাফত পরবর্তী তুরস্কে এই ফিরকার আত্মপ্রকাশ ঘটে।

আধুনিক ইসলামপন্থীরা ইসলামকে এতটাই আধুনিক দেখতে চায় যে, মুসলিমরা পশ্চিমা জীবন দর্শনের রাজনৈতিক শির্ককে, অর্থনৈতিক এবং মুদ্রাব্যবস্থার সুদ বা **রিবা**কে, নারীবিপ্লব এবং অন্যান্য বিষয়কে সম্পূর্ণভাবে মেনে নেয়। **আধুনিক ইসলামপন্থী**রা ইসরাঈলি রাষ্ট্রের সাথে মিত্রতা ও বন্ধুত্ব বজায় রাখে।

আধুনিক তুরস্ক যা করেছে পাকিস্তানের মোশাররফের আধুনিক রাজত্বকালও ঠিক একই কাজ করেছে। পবিত্রভূমিতে চলমান অত্যাচার ও নির্যাতনের ব্যাপারে এরা নিজেদের সুবিধার খাতিরে চুপ রয়েছে।

অন্যায় যুদ্ধ, বর্বর অমানুষিক নির্যাতন এবং জন্মলগ্ন থেকেই অবৈধভাবে রক্তস্রোত বইয়ে দিতে ইসরাঈলের রেকর্ড রয়েছে, তারপরও তারা একে সমর্থন করে আসছে। আহমেদিয়াদের সাথে সংঘাতের জন্যে এরা ইসলামের মূলস্রোতধারাকে পর্যন্ত সমালোচনা করে। যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া ইত্যাদি রাষ্ট্রে বসবাসকারী আধুনিকপন্থী মুসলমানেরা নিজেদেরকে পশ্চিমা হিসেবে আখ্যায়িত করে।

আমেরিকা ও ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনী যারা ইরাক ও আফগানিস্তানে নির্মম অত্যাচার চালাচ্ছে সেই সৈন্যবাহিনীতে পর্যন্ত যোগ দিতে তারা আগ্রহী। ভাবখানা এমন যে, সেটা **আমাদের** সেনাবাহিনী (মুসলিম সেনাবাহিনী)। তারা অনেকটা স্পঞ্জের মতো, পশ্চিমাদের কাছ থেকে যাই আসে তার সবকিছুকেই তারা লুফে নেয়। জিহাদের প্রতি অনীহা, নিন্দা এবং মুজাহিদদেরকে পথভ্রষ্ট মনে করা, এসব ব্যাপার থেকে খুব সহজেই এদেরকে সনাক্ত করা যায়। তারা **ইসলামিস্ট**, **ইসলামিজ্‌ম** পরিভাষা ব্যবহার করে এবং **মোল্লা, সনাতনপন্থী ইসলামি**, **ইসলামি মৌলবাদী**দের চরম নিন্দা করে। অক্সফোর্ড শিক্ষিতা বেনজির ভুট্টো ছিলেন ইসলামি আধুনিকতার এরূপ একটা উৎপাদন।

মুসলিমদের সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের বিরোধীতা করার ব্যাপারে তারা লেকচার দিতে বেশ আগ্রহী, সেকারণে এরা আমেরিকায় ৯/১১ সন্ত্রাসী হামলার জন্যে উল্টো মুসলিমদেরকেই দায়ী করে। এর মাধ্যমে তারা বিশ্ব শাসনকারী **ইহুদি-খ্রিস্টান চক্রে**র অশুভ এজেন্ডাকে সহায়তা করছে। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সন্ত্রাসী রাষ্ট্রকে এরা সন্ত্রাসী মনে করে না, এবং জনসম্মুখে তাদের নিন্দা করে না। পবিত্রভূমির গাজাতে নির্মম গণহত্যা চালনাকারী এবং সেখানে নিরীহ ফিলিস্তিনি মুসলিম এবং খ্রিস্টানদের উপর নির্মম অত্যাচারকে বৃদ্ধিকারী ইসরাঈল, যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও ইউরোপের সমালোচনা যদি কখনো তারা করে তবে তো তাদের এই আধুনিক প্লাটফর্ম এবং পশ্চিমাদের সাথে মিত্রতা আর টিকে থাকবে না।

আমেরিকাতে পরিচালিত ৯/১১-র সন্ত্রাসী হামলার অফিসিয়াল ব্যাখ্যা অনেক আমেরিকানই আর বিশ্বাস করে না (তাদের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলেছে)। কিন্তু আধুনিকপন্থীরা এধরনের বিবেকবান আমেরিকানদের সাথে যোগ না দেয়ার জন্যে নিজেদের চোখ কানকে পর্যন্ত বন্ধ করে রেখেছে।

এই পথভ্রষ্ট **আধুনিক ইসলামপন্থী**রা বুঝতে পারে না যে মুসলিম এবং পশ্চিমা সভ্যতা একে অপরের কাছ থেকে উপকৃত হয়েছে ঠিকই, কিন্তু আধুনিক পশ্চিমা সভ্যতার ভিত্তিই হলো ইসলামের বিরোধিতা করা। ইসলাম ধর্মের ভিত্তি **সত্যে**র উপর, পরিপূর্ণ নৈতিকতার উপর এবং মহাবিশ্বের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার উপর যা বস্তুবাদী সভ্যতার সকল যুক্তিকে খন্ডন করে। বস্তুবাদের উর্ধ্বে আরও বাস্তবতা রয়েছে, ইসলামের এই বিশ্বাসকে প্রতিদ্বন্দ্বি ঈশ্বরহীন, ক্ষয়িষ্ণু সভ্যতা অস্বীকার করেছে এবং তাদের নিজস্ব ধর্মনিরপেক্ষ মূল্যবোধ তৈরী করে যাচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ, সেখানে সমকামীতাকে (*homosexuality* এবং *lesbianism*-কে) নৈতিকভাবে খারাপ মনে করা হয় না। **সত্যে**র সাথে ঈশ্বরহীনতা, ক্ষয়িষ্ণুতা, আপেক্ষিক মূল্যবোধ এবং দার্শনিক বস্তুবাদের কোন প্রকার আপোষ নেই। কিন্তু এই সকল বাতিল আদর্শের সাথে আপোষ করার মধ্যেই লুক্কায়িত রয়েছে ইসলামি আধুনিকতাবাদীদের বিশ্বাসঘাতকতা।

দাজ্জাল যে আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ পশ্চিমা সভ্যতাকে বাস্তবে রূপ দেয়ার প্রধান পরিকল্পনাকারী, এই বাস্তবতাকে লেখক চিহ্নিত করেছেন। দাজ্জালের কপালের দু'চোখের মাঝে **কাফির** كافر শব্দটি লেখা রয়েছে। সে হিসেবে এই সভ্যতার মুখে অমোচনীয়ভাবে এই **কাফির** كافر শব্দটি খোদাই করা রয়েছে।

পশ্চিমা রাষ্ট্র যেমন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ইত্যাদিতে এই আধুনিকতাবাদীরা শক্তভাবে তাদের খুঁটি গেড়ে বসেছে। তারা মুসলিম বিশ্বের মধ্যেও মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। উদাহরণস্বরূপ, মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আহমাদ আবদুল্লাহ বাদাবী তার **ইসলাম হাজারী** আন্দোলনের মাধ্যমে ইসলামি আধুনিকতাকে সমুন্নত করেছেন।

বাতিল ফিরকাগুলির একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো, **আধুনিক যুগে শেষ সময়ের আলামত** বিষয়টির প্রতি অনীহা প্রদর্শন করা। যদি ইয়াজুজ ও মাজুজের মুক্তি হয়নি তাহলে **যুলক্বার্নাইনের লৌহ প্রাচীর** আজও দাড়িয়ে থাকার কথা। তাহলে, এই সমস্ত আধুনিকতাবাদীরা বাকি মুসলিম বিশ্বের মতো **যুলক্বার্নাইনের লৌহ প্রাচীর**কে চিহ্নিত করতে কোন আগ্রহ প্রদর্শন করে না কেন?

বাতিল ফিরকাদের আরেকটি স্বভাব হলো, যেসব মুসলিমরা বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত **ইহসান** বা **তাসাউফের** (ইসলামি আধ্যাত্মিকতার) চর্চা করে, এরা তাদের হেয় প্রতিপন্ন করে। বাস্তবিক পক্ষে ইহসান এমন একটা পথ এবং সংগ্রাম যা পরিশেষে মানুষকে **নুরুল্লাহ বা আল্লাহ্‌র নুর** প্রদান করে। এর ফলে সে **দু'চোখ'** (অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন

পর্যবেক্ষণ এবং বাহ্যিক পর্যবেক্ষণ) দ্বারা দেখার ক্ষমতা অর্জন করে, অপর দিকে **দাজ্জাল** ও তার অনুসারিরা কেবল **এক চোখ** (অর্থাৎ বাহ্যিক চোখ) দিয়ে দেখে।

বিশ্ব এই সমস্ত ইসলামি আধুনিকপন্থিদের কাছ থেকে **আধুনিক যুগে শেষ সময়ের আলামত** বিষয়টির উপর পান্ডিত্যপূর্ণ কাজের অপেক্ষা করছে।

গোঁড়ামী বিশিষ্ট সূফী ফিরকা

আমরা সবশেষে আধুনিক যুগের গোঁড়া সুফীদের উল্লেখ করবো, যারা অসাধারণ ভাষায় ইসলামিক আধ্যাত্মিকতার বর্ণনা লিখে মানুষের মন জয় করেন। তারপরেও তারা আজবভাবে এতটাই অন্ধ যে উপরে বর্ণিত বাস্তবতাসমূহকে চিহ্নিত করতে পারছেন না, অথবা এব্যাপারে রহস্যজনকভাবে নিরবতা পালন করছেন। সৌদি-মার্কিন রাজ্যে ইসলামের শত্রুদের দ্বারা পরিচালিত হজ্ব যে তার অধিকাংশ বৈধতা হারিয়ে ফেলেছে, এই ব্যাপারটি তাদেরকে নাড়া দেয় না। তারা আধুনিক *non-redeemable* বা বিনিময়ের অযোগ্য কাগজি মুদ্রা এবং সেই সাথে ক্যাশবিহীন ইলেকট্রনিক মুদ্রা (যা কাগজি মুদ্রার জায়গা নিতে যাচ্ছে, সেটা) যে বোগাস, জালিয়াতি, প্রতারণায় ভরা এবং সে কারণে সেটা যে হারাম তাও বুঝতে পারছেন না। তারা তথাকথিত শরীয়াহ সম্মত ইসলামি অর্থনীতির আসল স্বরূপ সনাক্ত করতে পারছেন না, যেমন মুদারাবা লেনদেন যাকে ইসলামি অর্থনীতির তথাকথিত খুঁটি বলা হয়, যা বাস্তবিক পক্ষে কেনাবেচার আড়ালে সুদের উপর চলে। আর তারা আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের নির্বাচনে ভোট দেয়া যে শির্ক তাও চিহ্নিত করতে পারছেন না। আর এই তালিকায় রয়েছে আরও অনেক কিছু যার কোনটিকেই তারা চিহ্নিত করতে পারছেন না। এরপরেও তারা নিজেদের সম্পর্কে অনেক উঁচু ধারণা পোষণ করেন, আর মনে করেন অন্যেরা ফেরকায় বিভক্ত হয়ে ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত রয়েছেন।

সবচেয়ে আশ্চর্যপূর্ণ ব্যাপার হলো, সমসাময়িক মুসলিম বিশ্বের উপর পশ্চিমা রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে তারা সংগ্রাম (জিহাদ) করছেন না, এমনকি কলমের মাধ্যমেও নয়। এরপরেও কিছু তথাকথিত সুফী নিজেদেরকে **রক্ষণশীল মুসলিম** হিসেবে দাবী করেন। আর অন্যদেরকে তারা আনন্দের সাথে ফিরকাবাজীতে লিপ্ত থাকার জন্যে দায়ী করেন। আজকের আজব ও রহস্যময় যুগকে কুর'আন ও হাদীসের মাধ্যমে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা যে রাখে, ইসলামিক জ্ঞানবিজ্ঞান কেবল তার সত্যতার দাবীকেই মেনে নিবে, এবং সেই সাথে তাকে সকল গোঁড়া এবং

ফিরকাবাজিপূর্ণ ইসলামি পান্ডিত্য থেকে আলাদা করে দিবে। **আধুনিক যুগে শেষ সময়ের আলামত** বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করতে ইসলামিক জ্ঞানবিজ্ঞান এক নতুন উদ্দীপনা জাগিয়ে তুলবে, যা সেই সকল মুসলিমকে সাহায্য করবে যারা সব ধরনের নকল ফিরকা থেকে সত্যিকারের ঈমানকে আলাদা করতে আগ্রহী।

সবশেষে আমি পাঠকদেরকে মনে করিয়ে দিতে চাই, **শেষ সময়ের** অনেক **আলামতই পবিত্রভূমিতে** ক্রমবর্ধমান অত্যাচারের সাথে সরাসরি সম্পর্ক রাখে। প্রতারক ইউরো-ইসরাঈলি রাষ্ট্রের হয়ে বিশ্ব শাসনকারী ঈশ্বরহীন, ক্ষয়িষ্ণু সভ্যতার অত্যাচারের বিরুদ্ধে যারা অব্যাহতভাবে প্রতিরোধ করে যাচ্ছে তাদেরকেই প্রকৃত মুসলিম এবং ফিরকাপ্রবণ মুসলিমদের মধ্যে প্রভেদকারী হিসাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। আজকের যুগে পবিত্রভূমিতে চলমান ঘটনাসমূহের ব্যাখ্যাকারী **শেষ সময়ের আলামতকে** কুর'আন এবং হাদীসের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা যাদের রয়েছে এবং এর প্রতি যারা সঠিকভাবে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে থাকে মূলত তারাই হিদায়াত প্রাপ্ত মুসলিম সম্প্রদায় (জামা'আত)। ফলশ্রুতিতে, পবিত্রভূমিতে মিথ্যা, অন্যায় এবং নির্মম নির্যাতনের উপর সত্য এবং ন্যায় বিজয়ী হবে, এটি উপলব্ধির মাধ্যমেই এই দলের লোকেরা নির্ভীকতার সাথে জিহাদ চালায়।

দুই - গবেষণার পদ্ধতি

কুর'আনের সকল হুকুম পালনীয়। সেই সাথে একই বিষয়ে পুনরাবৃত্তিগুলিকে একত্র করে মূলনীতি গঠন করার প্রয়োজন রয়েছে। এটাকে পবিত্র কুর'আনে অর্থপ্রকাশের পদ্ধতি বলা যেতে পারে। এরই মধ্যে নিহিত রয়েছে *ব্যাখ্যা উদঘাটনের নিয়মনীতি*।

(ড. মাওলানা ফজলুর রহমান আনসারি: *Qur'anic Foundations and Structure of Muslim Society* [প্রথম খন্ড, পৃ-১৯২])

নবী (সাঃ) বলেছেন: ***পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়*** (طلوع الشمس من مغربها) শেষ সময়ের একটি আলামত (সহীহ মুসলিম)। এই আলামতটি কতগুলি প্রশ্নের জন্ম দেয়। যেমন:

- প্রতিদিন যে **সূর্যটি** পূর্ব দিক থেকে উদিত হয়, সেই **সূর্যটিই** কি একদিন পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে, নাকি তা অন্য কোন **সূর্য?**
- আক্ষরিক অর্থেই কি **সূর্য** একদিন পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে নাকি ধর্মীয় রূপক হিসাবে ঘটনাটিকে ব্যাখ্যা করতে হবে?
- সত্যিই পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় হবে, নাকি ওটা হবে দৃষ্টিভ্রম?
- **পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় হবে** এই আলামতটির কি একের অধিক অর্থ থাকতে পারে, যার সবটিই ঘটতে পারে? উদাহরণস্বরূপ, একে রূপকভাবে ভুয়া পশ্চিমা-সভ্যতার সূর্যোদয় হিসেবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে, যার প্রস্তাব লেখক দিয়েছেন। সেই সাথে সত্যিকার অর্থে পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় হতে পারে, যদি বস্তুজগতকে ভিন্ন একটি বিশ্বে বা গাইর-আল-আরদ্বে পরিণত করা হয় (দেখুন সূরা ইব্রাহীম, ১৪:৪৮)।

নবী (সাঃ)-এর ভবিষ্যদ্‌বাণীর ব্যাখ্যা হিসেবে, কুর'আনে বর্ণিত **সূর্যের** পরিবর্তে অন্য কোন **সূর্যের** ধারণাকে আমরা কোন দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছাড়াই বাদ দিয়ে দিবো, কারণ এরূপ ধারণা বিভ্রান্তিকর। আর ঠিক একই কারণে দৃষ্টিভ্রম তত্ত্বকেও বাতিল করে দিবো।

কুর'আন বলছে **সূর্য** পূর্ব দিক থেকে উদিত হয় (সূরা বাকারাহ, ২:২৫৮)। বাহ্যিক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে এটা তো নিশ্চিতভাবেই প্রমাণিত, এমনকি আমাদের এই ক্যারিবিয়ান দ্বীপ ত্রিনিদাদ, যেখান থেকে এই বইটি লিখা হয়েছে, সেখান থেকেও তাই দেখা যায়।

সূরাটিতে যে **সূর্যের** কথা বলা হয়েছে তা অবশ্যই আকাশে দেখা আমাদের প্রতিদিনের **সূর্য**। কুর'আন আরো ঘোষণা করেছে যে, আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই (সূরা রূম, ৩০:৩০)। কুর'আনের এই ঘোষণার ফল দাঁড়াচ্ছে এই যে, যে **সূর্য** প্রতিদিন পূর্ব দিক থেকে উদিত হয় সে **সূর্য** কখনো আক্ষরিকভাবে পশ্চিম দিক থেকে উদিত হতে পারে না।

এক আল্লাহ্র উপাসনা সম্পর্কে **ইব্রাহীম** (আঃ) এক বাদশাকে এভাবে চ্যালেঞ্জ করেন: "আমার প্রতিপালক **সূর্যকে** পূর্ব দিক থেকে উদিত করেন। পারলে তুমি তাকে পশ্চিম দিক থেকে উদিত করো!" এখানে কুর'আনের আয়াতটি রয়েছে:

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

তুমি কি তার (সেই বাদশাহের) সম্পর্কে অবগত নও যে ইব্রাহীমের সাথে তার প্রতিপালক সম্পর্কে বিতর্ক করে, (শুধুমাত্র) আল্লাহ্ তা'আলা তাকে রাষ্ট্র ক্ষমতা প্রদান করেছেন এ জন্যে? ইব্রাহীম বললো: "আমার প্রতিপালক তো তিনিই যিনি জীবন এবং মৃত্যু দিয়ে থাকেন।" (বাদশাহ) উত্তরে বললো: "আমিও তো জীবন ও মৃত্যু দেই।" ইব্রাহীম বললো: "আমার প্রতিপালক সূর্যকে পূর্ব দিক থেকে উদিত করেন। পারলে তুমি তাকে পশ্চিম দিক থেকে উদিত করো!"। সত্যকে অস্বীকারকারী ব্যক্তিটি হতভম্ব হয়ে গেল। আল্লাহ্ তা'আলা সে সব লোকদেরকে পথ দেখান না যারা (স্বেচ্ছায়) পাপ কাজ করে।

[বাকারাহ ২:২৫৮]

কুর'আন সুস্পষ্টভাবে এখানে ঘোষণা করছে:

- আল্লাহ্ তা'আলা **সূর্যকে** পূর্ব দিক থেকে উদিত করেন এবং
- আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই।

একটা হাদীস রয়েছে যাকে সাধারণত ব্যাখ্যা করা হয়, **সূর্য** (অর্থাৎ সেই **সূর্য** যা কুর'আনে বর্ণিত হয়েছে) আক্ষরিকভাবে একদিন পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে। সাধারণভাবে এটা মেনে নেওয়া হয়েছে যে, এই হাদীসটিতে বর্ণিত **পশ্চিমা সূর্যোদয়**টিই হবে নবী (সাঃ)-এর ভবিষ্যদ্‌বাণী করা **শেষ সময়ের আলামতে**র একটা আলামত।

> আবু যর (রাঃ) থেকে বর্ণিত: আমি মসজিদে প্রবেশ করলাম আর নবী (সাঃ) সেখানে বসা ছিলেন। সূর্য তখন অস্ত গেল নবী (সাঃ) প্রশ্ন করলেন: "হে আবু যর! তুমি কি জান এটি (সূর্য) কোথায় যায়? আমি বললাম,'আল্লাহ্‌ ও তাঁর নবীই (সাঃ) বেশি জানেন'। তিনি বললেন: "এটি সিজদাহ করে এবং অনুমতি প্রার্থনা করে তাকে অনুমতি দেয়া হয় এবং (একদিন) তাকে আদেশ করা হবে সে যেখান দিয়ে এসেছে, সেখানেই যেন ফিরে যায়। এটি তখন পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে"। নবী (সাঃ) তিলাওয়াত করলেন,
>
> وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا
>
> সূর্য তার নিজস্ব কক্ষ পথে বিচরণ করে (৩৬:৩৮)। আর সেই সাথে আবদুল্লাহও তিলাওয়াত করলো।
>
> [সহীহ বুখারী]

হাদীসের শুদ্ধতা কুর'আন-নির্ভর, কুর'আন হাদীস-নির্ভর নয়

ঈসা (আঃ)-এর আবির্ভাবের আগে পশ্চিমা সূর্যোদয় হবে। এই হাদীসটির আক্ষরিক ব্যাখ্যার সাথে কুর'আনের আয়াতের মাঝে আপাত সংঘর্ষ রয়েছে। কিন্তু আসলে কোন সংর্ঘষ নেই। সেটা বের করাটাই আমাদের প্রথম পদক্ষেপ হবে। এরূপ সংঘর্ষের ক্ষেত্রে হাদীসের ভুল ব্যাখ্যাকে মেনে নেওয়ার পরিবর্তে আমরা দৃঢ়ভাবে কুর'আনকে আঁকড়ে ধরে থাকবো। এই পদ্ধতিটি মাওলানা ড. ফজলুর রহমান আনসারি (রঃ) লিপিবদ্ধ করেছেন এবং একে স্বীকৃতি প্রদান করেছেন: "কুর'আনের কার্যপদ্ধতিই হল এটি হাদীসের বিশুদ্ধতার বিচার করবে, এর উল্টোটা হবে না।" (*Qur'anic Foundations and Structure of Muslim Society* প্রথম খন্ড, পৃ-২৪)।

আমরা মেনে নিয়েছি যে, পশ্চিমা সূর্যোদয়ের এই ঘটনাটি সংঘঠিত হবে বিশ্বের পরিসমাপ্তির সময়। কেননা মহান আল্লাহ্‌ তা'আলা নিজেই ঘোষণা করেছেন, পৃথিবী ও আসমানে সে সময় একটা তাব্‌দীল বা পরিবর্তন সংঘঠিত হবে:

يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ

সে দিন আমি পৃথিবীকে একটা ভিন্ন পৃথিবী দ্বারা পরিবর্তন করে দেব এবং আসমানকেও। তাদেরকে (মানুষ) আল্লাহ্‌র সামনে হাজির করা হবে, যিনি একক, মহা শক্তিশালী।

[ইব্রাহীম ১৪:৪৮]

বলা বাহুল্য, আক্ষরিক অর্থে বিশ্বের পরিসমাপ্তির সময়ে সংঘঠিত হওয়া **পশ্চিমা সূর্যোদয়**ের সাথে আর যাই হোক ইতিহাসের পরিসমাপ্তির কোন সম্পর্ক নেই। **ইতিহাসের পরিসমাপ্তি**র মূল বিষয়টিই হচ্ছে, মরিয়ম পুত্র ঈসা (আঃ)-এর অলৌকিক প্রত্যাবর্তন। (পরবর্তী অধ্যায়ে **বিশ্বের পরিসমাপ্তি** এবং **ইতিহাসের পরিসমাপ্তি**র মধ্যাকার পার্থক্য দেখুন)। সে হিসেবে আক্ষরিক **পশ্চিমা সূর্যোদয়**ের ঘটনাটি শেষ সময়ের ১০টি আলামতের একটি হিসেবে বিবেচিত হতে পারে না। দ্বিতীয়ত, **পশ্চিমা সূর্যোদয়**ের ঘটনা খুব সম্ভবত উপরে বর্ণিত তাব্‌দীলের সময়ে অর্থাৎ আসমান ও পৃথিবী পরিবর্তনের সময়ে সংঘঠিত হবে, তার আগে এটা সংঘঠিত হতে পারে না। কেননা আল্লাহ্‌ তা'আলাই তো পবিত্র কুর'আনে ঘোষণা করেছেন, তাঁর সৃষ্টির কোনরূপ পরিবর্তন নেই। তিনি বলেছেন:

لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ

আল্লাহ্‌র সৃষ্টির মধ্যে কোন রদবদল নেই।

[রূম ৩০:৩০]

আমরা বরাবরের মতোই মনে করি, **পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়** আলামতটি একটি রূপক। বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত বিপ্লবের মাধ্যমে আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ পশ্চিমা সভ্যতার আবির্ভাব এবং সমগ্র বিশ্বের উপর এর ক্রমবর্ধমান আধিপত্যকে আমরা (আপাতদৃষ্টিতে) **পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়**ের প্রতীক হিসেবে সনাক্ত করেছি, এবং এটাই **শেষ সময়**ের একটি বড় আলামত। অবশ্য আল্লাহ্‌ই বেশি জানেন!

পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়ের বিষয়টি রূপক হলে **শেষ সময়ের আলামতে**র অন্যান্য আলামতগুলিও রূপক হতে পারে আর কুর'আন এবং হাদীসের এই রূপক বর্ণনাগুলিকে ব্যাখ্যার জন্যে আমাদের একটি কর্মপদ্ধতির প্রয়োজন।

কুর'আন বলছে তাঁর আয়াতসমূহ *মুহকাম* এবং *মুতাশাবিহাত* দ্বারা গঠিত:

هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ

তিনিই সেই সত্তা যিনি (হে মুহাম্মাদ!) তোমার উপর কিতাব (কুর'আন) নাযিল করেছেন। এতে রয়েছে মুহকাম আয়াত যা কিতাবের মূল অংশ, সেই সাথে রয়েছে মুতাশাবিহাত আয়াত। এখন যাদের অন্তর সত্য থেকে বিচ্যুত হয়েছে তারা কিতাবের **তাশাবুহ** রূপক অংশের (অপ)ব্যাখ্যার দিকে ধাবিত হয় যা তাদের সংশয় এবং ফিতনাকে প্রকাশ করে দেয়। কিন্তু আল্লাহ্, এবং সেই সাথে গভীর জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিরা, ব্যতীত এর (মুতাশাবিহাত আয়াতের) ব্যাখ্যা কেউই জানে না। তারা (জ্ঞানীরা) বলে: "আমরা এর প্রতি ঈমান আনলাম; সমগ্র কিতাব (মুহকাম এবং সেই সাথে মুতাশাবিহাত আয়াতসমূহ) আমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এসেছে"। কিন্তু যাদেরকে অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করা হয়েছে তারা ব্যতীত কেউই তা হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করে না।

[আলে ইমরান ৩:০৭]

উপরের আয়াতে অনেকেই আল্লাহ্ শব্দের পর জোর পূর্বক ***ওয়াক্‌ফে লাযেম*** (বিরতি চিহ্ন যা দাঁড়ির প্রায় সমান) বসান। এর ফলস্বরূপ, তারা মনে করেন যে, আল্লাহ্ ঘোষণা করছেন কেবল তিনি ব্যতীত আর কেউই পবিত্র কুর'আনের মুতাশাবিহাত আয়াতের ব্যাখ্যা জানে না। এটি নিঃসন্দেহে কিছু আয়াতর ক্ষেত্রে সত্য যেমন, কবে পৃথিবী ধ্বংস হবে ইত্যাদি বিষয় আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ জানে না। কিন্তু কুর'আনে অন্যান্য আয়াত রয়েছে যার ব্যাখ্যা জ্ঞানী ব্যক্তিরা করতে পারেন এবং তা বৈধ। এই আয়াতের ক্ষেত্রে ***ওয়াক্‌ফে লাযেম*** বা বিরতি চিহ্নটা বসানোটাই হবে ভুল। {আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) এবং আরো অনেক সাহাবী ও তাবেয়ীরা এই মতের সমর্থক। - অনুবাদক}।

পবিত্র কুর'আনে মুতাশাবিহাত আয়াতগুলি নাযিলের ঐশ্বরিক উদ্দেশ্যটা কি? আমাদের মত হলো, আল্লাহ্ই ভাল জানেন, এই কিতাব মু'মিনদেরকে এতটাই ঐশ্বরিক প্রজ্ঞা এবং অনুগ্রহ প্রদান করেছে যে, তারা এর মাধ্যমে এই আয়াতগুলির সঠিকব্যাখ্যা প্রদানকারী সত্যিকারের আলিমদেরকে সেই সকল ব্যক্তি থেকে আলাদা করতে পারবে যারা ফিতনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আয়াতগুলির অপব্যাখ্যা করে থাকে, যেমন গোলাম আহমেদ

কাদিয়ানী। সত্যিকার আলিমদের দ্বারা কুর'আনের এই আয়াতগুলির সঠিক ব্যাখ্যা করা কেবল ঐশ্বরিক অনুগ্রহেরই আলামত নয়, বরং সেই সাথে মু'মিনদেরকেও সেটা সাহায্য করে যেন তারা পথভ্রষ্ট, বাতিল ফিরকাগুলিকে সনাক্ত করতে পারে এবং এদেরকে বর্জন করতে পারে।

অর্থপ্রকাশের পদ্ধতি বের করতে হবে

মুতাশাবিহাত আয়াতগুলিকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করার জন্যে মহান আল্লাহ্‌র জ্ঞানী বান্দাদেরকে অবশ্যই একটা কর্মপদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে যেন, যে কোন বিষয়ের উপর আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আসা কুর'আনিয় হেদায়াতকে "সামগ্রিক বিষয়" হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। এটা এক মূল্যবান বিষয় কেননা উপরের আয়াত সেটাই ঘোষণা করছে,

كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا

সমগ্র কিতাবটি (অথবা নির্দিষ্ট কোন বিষয়ের বেলায় আসা সামগ্রিক ঐশ্বরিক পথনির্দেশটি) এসেছে আমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে।

ফলস্বরূপ, কোন বিষয়ের খন্ডিত **অংশ** তখনই উপলব্ধি করা সম্ভব হবে যখন **সামগ্রিক বিষয়**টিকে (মুহকাম ও মুতাশাবিহাত) একত্রে ধরে রাখা হবে।

প্রসঙ্গবিহীন কুর'আনের কোন একাকি আয়াত এবং প্রসঙ্গবিহীন একাকি কোন হাদীস নিয়ে গবেষণা করে, সেই বিষয়ের উপসংহারে পৌঁছানোতে যে বিপদ রয়েছে, সে ব্যাপারে কুর'আন সূক্ষ্মভাবে সতর্কবাণী পেশ করছে। 'পৃথিবীতে খলীফা (সার্বভৌম শাসক, সরকার, বা রাজার স্থলাভিষিক্ত কোন ভাইসরয় বা উপশাসক) পাঠানো হবে', ফিরিশতাদের নিকটে করা সেই ঐশ্বরিক ঘোষণা সম্বলিত আয়াতটিতে এই কাজ (সতর্কবাণী) করা হয়েছে (বাকারাহ, ২:৩০)। কুর'আন আমাদেরকে জানাচ্ছে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা ফিরিশতাদেরকে আদমের সামনে সিজদাহ করার আদেশ দেন, "তারা (সবাই) সেটা পালন করলো, *ইল্লা* ইবলিশ।" মুহাম্মাদ আসাদ (রঃ) কৃত আয়াতটির তরজমাটি হলো:

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ

যখন আমরা ফিরিশতাদেরকে বললাম, "আদমের সামনে তোমরা সিজদাহ করো"। তারা সবাই সিজদাহ করলো, ইবলিশ ব্যতীত। সে অস্বীকার করলো এবং অহংকার প্রদর্শন করলো। আর এভাবেই সে সত্যের অস্বীকারকারীদের একজনে পরিণত হলো।

[বাকারাহ ২:৩৪]

(ফা-সাজাদূ ইল্লা ইবলিস) আদম (আঃ)-কে ফিরিশতা কর্তৃক সিজদাহ করার আদেশ সম্বলিত আয়াতে শব্দ চয়নের ক্ষেত্রে আসলেই এক ঐশ্বরিক প্রজ্ঞা এবং সূক্ষ্ম গঠন কাঠামো বিরাজ করছে।

আরবীতে إِلَّا ইল্লা শব্দটি বা পরিভাষাটির অনেক অর্থ রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, যতক্ষণ না, ব্যতীত, কেবলমাত্র, পর্যন্ত নয়, নিশ্চিতভাবে নয়, কিন্তু, কিন্তু ... না, অপরপক্ষে ... নয়, শর্তযুক্ত যদি ... না, ইত্যাদি। **অর্থপ্রকাশের পদ্ধতি** বাদ দিয়ে প্রসঙ্গবিহীন একাকি একটি আয়াত নিয়ে গবেষণা করার ত্রুটিপূর্ণ পদ্ধতি ইল্লা শব্দটির অর্থ করবে **ব্যতীত**। এতে উপসংহার দাঁড়াবে, আদেশ প্রদানের সময় ইবলিশ ফিরিশতাদের অন্তর্ভূত ছিল। সে আদেশ মানতে অস্বীকৃতি জানিয়ে পথভ্রষ্ট এক ফিরিশিতাতে পরিণত হয়। প্রকৃতপক্ষে, একাকি আয়াতটিতে এমন কোন কিছুই নেই যা ইঙ্গিত করছে যে, সে ফিরিশতা নয়!

অপরপক্ষে, যখন বিষয়টির **সামগ্রিক বিষয়**টিকে একত্রে ধরে রাখা হয় বা অর্থপ্রকাশের পদ্ধতিটি সহ (উসুলু-আত-তাফসীর) গবেষণা করা হয়, তাহলে আসল উপসংহারটি শীঘ্রই প্রকাশিত হয়ে পড়বে। ফিরিশতাদের কোন স্বাধীন ইচ্ছা শক্তি নেই। তাদের পছন্দ করার কোন সামর্থ্য নেই যার ফলে যখনই মহান আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে কোন আদেশ করেন তারা তা মানতে বাধ্য। এর কোন ব্যতিক্রম নেই।

لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ

তাঁর কথার সামনে তারা কথা বলে না, বরং তারা তাঁর আদেশ অনুযায়ী কাজ করে।

[আম্বিয়া ২১:২৭; নাহ্ল ১৬:৫০]

ইবলিশ যদি ফিরিশতা হয় তবে কোন ব্যাপারে তার পছন্দ করার কোন অধিকার থাকবে না। নবী আদম (আঃ)-কে সিজদাহ করার ঐশ্বরিক আদেশটি তার পালন করতে হতো। সে আদেশ অমান্য করেছে যা প্রমাণ করে যে, তার **স্বাধীন ইচ্ছা**

শক্তি বা **পছন্দ** করার অধিকার রয়েছে। সে আসলে ফিরিশতাদের কেউ নয়। আদম (আঃ)-কে সিজদাহ করার ঐশ্বরিক আদেশ সম্বলিত আয়াতটির পুনরাবৃত্তি ঘটেছে:

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ

"যখন ফেরেশতাদেরকে বললাম, আদমকে সিজদাহ করো, তারা (সবাই) তা করল, ইবলিশ ছাড়া"; কিন্তু তারপর বলা হয়েছে, "সে জিন ছিল"।

[কাহাফ ১৮:৫০]

ইবলিশ কখনো ফিরিশতাই ছিল না, যে জন্যে সে পথভ্রষ্ট ফিরিশতাতে পরিণত হয়ে জিনে পরিণত হয়েছে, এটা ঠিক নয়। আসলে আল্লাহ্‌র সৃষ্টির মধ্যে কোন রদবদল নেই:

لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ

আল্লাহ্‌র সৃষ্টির মধ্যে কোন রদবদল নেই, "লা তাবদীলা লি খালকিল্লাহ"।

[রূম ৩০:৩০]

আমাদের উপসংহার হলো, সূরা বাকারার ৩৪নং আয়াতটি ঐশ্বরিকভাবেই এমন প্রজ্ঞার সাথে বিন্যস্ত হয়েছে যা কুর'আন অধ্যয়নের সঠিক পদ্ধতির দিকে সরাসরি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে, অর্থাৎ কোন আয়াত বা হাদীসকে একাকি বিচ্ছিন্নভাবে অধ্যয়ন করো না বরং সেটা যে সামগ্রিকের অংশ সেই সামগ্রিকের গবেষণা করো এবং তারপর অর্থ বের করো।

মাওলানা ড. আনসারি (রঃ) বলেছেন যে, অর্থপ্রকাশের পদ্ধতি হিসেবে সামগ্রিক বিষয়টিকে একত্রে ধরে রাখলেই বিষয়টির সম্পূর্ণ অর্থ বোধগম্য হয়।

> ধারাবাহিকতার পাশাপাশি কুর'আনের অনেক স্থানে পুনরাবৃত্তি হয়েছে ... যা আমাদেরকে তত্ত্বগত বোধগম্যতা প্রদান করে। পবিত্র কুর'আনে এটা অতি স্বাভাবিকভাবে এসেছে। এমনকি ধর্মীয় সচেতনতা অত্যন্ত যত্নের সাথে এখানে উপস্থাপিত হয়েছে। কুর'আনিক হুকুম বের করার ক্ষেত্রে কুর'আনের পুনরাবৃত্তি একটি সর্বোত্তম পদ্ধতি তুলে ধরে। এটা আয়াতগুলির এককভাবে শিক্ষাদানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বরং এটি একটি মূলনীতি। (মূলনীতিটি হলো) জ্ঞানগর্ভ কাঠামোর অংশ হিসেবে কুর'আনের সকল আয়াত একে অপরের সাথে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। এরই মাধ্যমে পবিত্র কুর'আনে, অর্থপ্রকাশের একটি পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে এবং সেই সাথে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেই পদ্ধতির *ব্যাখ্যা*

উদঘাটনের কৌশল। — ড. মাওলানা ফজলুর রহমান আনসারি: *Qur'anic Foundations and Structure of Muslim Society;* প্রথম খন্ড, পৃ-১৯২।

সমগ্র কুর'আনের অর্থপ্রকাশের পদ্ধতিকে একত্রে ধরে রাখাটা, জ্ঞানের পথে সুদীর্ঘ ও নিবেদিতভাবে চলা এবং অন্তর্জ্ঞানলব্ধ আধ্যাত্মিক দৃষ্টি ব্যতীত সম্ভব নয়। আর অন্তর্জ্ঞানলব্ধ আধ্যাত্মিক দৃষ্টি অর্জন ততক্ষণ পর্যন্ত সম্ভব নয় যতক্ষণ না সে মহান আল্লাহ্ তা'আলার দেয়া নুরের মাধ্যমে না দেখছে। এভাবে বুঝতে পারার চাবিকাঠি মহান আল্লাহ্ তা'আলা নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন। তিনি তাঁর এই নুর ও কুর'আনের বিশেষ আয়াতকে ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা সেসব জ্ঞানী বান্দাদেরকে প্রদান করেন, যাদের তিনি পছন্দ করেন। যখন এভাবে ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়, স্বাভাবিকভাবে তা সত্য হিসেবে বিবেচিত হয়। এই ব্যাখ্যাটা প্রথমবার কে দিল সেটা বিবেচনার কোন বিষয় নয়।

সমগ্র কুর'আনের অর্থপ্রকাশের পদ্ধতিকে একত্রে ধরে রাখার ক্ষমতা সম্পন্ন যোগ্য আলিম এযুগে পাওয়া বেশ কঠিন। প্রায় নিশ্চিতভাবে এই লেখক এখনো তাদের একজন নন। তবে, আমরা এই বিষয়টির সাথে সম্পৃক্ত অর্থপ্রকাশের পদ্ধতি অর্জনের চেষ্টা করছি। এই গবেষণার জন্যে আমাদের প্রয়োজন **শেষ সময়ের আলামত** বিষয়টির সাথে সম্পৃক্ত অর্থপ্রকাশের পদ্ধতিকে চিহ্নিত করা যেটা সামগ্রিকভাবে সকল তথ্য উপাত্তকে একত্রিত করবে এবং তাদের মাঝে সামঞ্জস্য ও সমন্বয় সাধন করবে।

ফলস্বরূপ, অর্থপ্রকাশের পদ্ধতির মাধ্যমে বিষয়টির উপর কুর'আন ও হাদীস থেকে আমরা যে মূল তথ্য উপাত্ত পাবো, আপাত দৃষ্টিতে যে সমস্ত হাদীস তার সাথে দ্বন্দ্বযুক্ত ও বিরোধময় হবে সেগুলিকে আমরা চিহ্নিত করতে সক্ষম হবো। কুর'আন যেহেতু ঘোষণা করেছে, এটা যদি ঐশ্বরিক না হতো তবে তাতে প্রচুর বৈপরীত্য, দ্বন্দ্ব ও মতভেদ পরিলক্ষিত হতো। এর মানে দাড়াচ্ছে, কুর'আনের মূলপাঠে কোন রকম (বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ) বৈপরীত্য নেই।

আমাদের কর্মপন্থা হচ্ছে, কুর'আন থেকে আমরা বিষয়টির উপর যে অর্থপ্রকাশের পদ্ধতি পাবো, তাকে আমরা সম্প্রসারিত করবো। তারপর 'শেষ সময়ের আলামত' বিষয়টির সাথে সম্পৃক্ত হাদীসগুলিকে একত্রিত করবো, যেগুলি কুর'আনের সাথে সামঞ্জস্যশীল। অতঃপর যে সব হাদীস বা হাদীসের ব্যাখ্যা আমাদের সম্প্রসারিত অর্থপ্রকাশের পদ্ধতির বিপরীত হবে আমরা সেগুলিকে বাদ দিয়ে দিবো।

আমাদের কর্মপন্থা থেকে ভিন্ন পন্থা যারা অবলম্বন করবে এবং তাদের গবেষণা থেকে সে সব হাদীসগুলিকে বাদ না দেবে তারা যে উপসংহারে পৌঁছাবে তা খুব সম্ভব আমাদের থেকে ভিন্ন হবে।

বিষয়টির উপর আমরা এমন একটা হাদীস পেয়েছি, যার ভিত্তিতে মনে করা হচ্ছে ঈসা (আঃ)-এর প্রত্যাবর্তন এবং তাঁর দ্বারা দাজ্জাল হত্যার পরে ইয়াজুজ ও মাজুজদের মুক্ত করে দেওয়া হবে, আগে নয়।

... এরকম একটা অবস্থায় আল্লাহ্ ঈসা (আঃ)-এর কাছে ওহী পাঠাবেন, "আমার বান্দাদের মাঝ থেকে এমন একটা দল সৃষ্ট করেছি যাদের সাথে যুদ্ধ করে কেউ জয়ী হতে পারবে না, তুমি (তোমার সাথিদের নিয়ে) তূর পাহাড়ের উপর চলে যাও ...।"

يبعث اللَّهُ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ

আল্লাহ্ তখন ইয়াজুজ ও মাজুজদের (**পাঠাবেন**) এবং তারা প্রতিটি উচ্চভূমি থেকে নেমে আসবে। তাদের প্রথম জন টাইবেরিয়াস হ্রদের (গ্যালিলী সাগর) পাশ দিয়ে যাবার সময় সেখান থেকে পানি পান করবে। আর, তাদের শেষ জন যখন সেই স্থান অতিক্রম করবে, সে বলবে একদা এখানে পানি ছিল ...।

[সহীহ মুসলিম]

বিচ্ছিন্ন এই হাদীসটির উপর ত্রুটিপূর্ণ গবেষণার ভিত্তিতে অনেকে এই উপসংহারে পৌঁছেছেন যে, ঈসা (আঃ)-এর প্রত্যাবর্তন এবং তাঁর দ্বারা দাজ্জাল হত্যার পরে, আগে নয়, ইয়াজুজ ও মাজুজদের মুক্ত করে দেওয়া হবে (এবং এর ফলে যুলক্বার্নাইন কর্তৃক নির্মিত প্রাচীরটিও ভেঙ্গে যাবে)। হাদীসটিতে يبعث পাঠানো বা প্রেরণ করা শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, يفتح মুক্তি দেওয়া শব্দটি কিন্তু ব্যবহৃত হয়নি।

এই বিষয়টির ক্ষেত্রে অর্থপ্রকাশের পদ্ধতি একত্রে ধরে রাখার মাধ্যমে আমরা এই উপসংহারে এসেছি যে, আল্লাহ্ কর্তৃক যুলক্বার্নাইনের প্রাচীরটি ধ্বংসের মাধ্যমে নবী (সাঃ)-এর জীবদ্দশায়ই ইয়াজুজ ও মাজুজের মুক্তি প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। তাদের মুক্তি পাওয়া তখন থেকে চলছে, এখনো চলছে এবং ঈসা (আঃ)-এর প্রত্যাবর্তন ও ইতিহাসের বিভিন্ন প্রেক্ষাপটের সাথে সম্পৃক্ততা রেখে এরা যুগের বিভিন্ন অধ্যায়ে নানা ভাগে মুক্তি পেতে থাকবে আর তাদের চূড়ান্ত মুক্তি হবে তখনই, যখন **গ্যালিলী হ্রদের** বা **কিনেরেট হ্রদের** পানি শুকিয়ে যাবে (উপরের হাদীস দেখুন)। পবিত্রভূমির আশেপাশে বিশ্ব তখন

ইয়াজুজ বনাম মাজুজের **মহা যুদ্ধ** মঞ্চায়িত হতে দেখবে। আমরা নিম্নের ঘটনাগুলিকে কিভাবে ব্যাখ্যা করবো:

- **জেরুযালেম শহর**-টিতে ইহুদিদের প্রত্যাবর্তন এবং এটা তাদের নিজেদের শহর বলে দাবী করা এবং পবিত্রভূমিতে ইসরাঈলি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা।
- **গ্যালিলী সাগরের** পানির উচ্চতা এখন এতটাই কম যে, হ্রদটি শুকিয়ে যাবার পূর্ববর্তী সময়টি খুবই নিকটবর্তী।
- **যুলক্বার্নাইনের লৌহ প্রাচীর**টি পৃথিবীর কোথাও আজও দাঁড়িয়ে আছে তার কোন বস্তুনিষ্ঠ প্রমাণ নেই।
- বরঞ্চ সহীহ বুখারী ও মুসলিমে নবী (সাঃ)-এর এক অভূতপূর্ব স্বপ্নের কথা বর্ণিত হয়েছে যেখানে, নবী (সাঃ) আমাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছেন, "যুলক্বার্নাইন কর্তৃত নির্মিত প্রাচীরটিতে একটি ছিদ্র তৈরী হয়েছে"। যেটা প্রমাণ করছে লৌহ নির্মিত প্রাচীরটির ঐশ্বরিক ধ্বংস সাধিত হয়েছে। ইয়াজুজ ও মাজুজের মুক্তি প্রক্রিয়া চূড়ান্তভাবে আরম্ভ হয়ে গেছে।
- বিশ্বব্যাপী ফ্যাসাদ (যা ধ্বংস এবং ক্ষতিসাধন করে), **ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ** এবং মুসলিমদের চলমান গোলামী, দাসত্ব ও নিধন যেটা মুসলিম বিশ্ব এবং সেই সাথে অমুসলিম বিশ্বের সে সব স্থানগুলিকে গ্রাস করে ফেলেছে যেখান থেকে আজকের বিশ্ব শাসনকারীদের বিরুদ্ধে বিরোধিতা আসতে পারে।

বাহ্যিক তথ্য উপাত্তের ভিত্তিতে কুর'আন ব্যাখ্যার পদ্ধতি

আমরা এটাও মনে করি যে, ঐশ্বরিক প্রজ্ঞা কুর'আনের কিছু কিছু আয়াতের কাঠামো এমনভাবে গঠন করা হয়েছে যে, সেগুলির অর্থ কুর'আনের বাহিরে অবস্থিত তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণের মাধ্যমেই বের করা সম্ভব। এর সবচেয়ে জ্বলন্ত উদাহরণ, সূরা আলে ইমরানের সেই আয়াত যেখানে আল্লাহ্ ঘোষণা করছেন:

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ

পবিত্র বাক্কাতে মানবজাতির জন্যে প্রথম ঘর নির্মিত হয়েছে (প্রকৃত প্রতিপালকের ইবাদতকল্পে) ...।

[আলে ইমরান ৩:৯৬]

সমস্ত সূত্র এ ব্যাপারে এক মত যে, **বাক্কা** নামটি মক্কা নগরীর পুরাতন নাম। এই আয়াতটি মক্কা নগরীর পুরাতন নাম বাক্কাকে উল্লেখ করেছে, যদিও কুর'আনের অন্যত্র মক্কা নামটি ব্যবহৃত হয়েছে:

وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةَ مِن بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا

তিনি মক্কা শহরে তাদের হাত তোমাদের থেকে এবং তোমাদের হাত তাদের থেকে সরিয়ে দিয়েছেন, যখন তিনি তোমাদেরকে তাদের উপর বিজয়ী করেছেন। তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ্ তা দেখেন।

[ফাত্হ ৪৮:২৪]

আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াতে (আলে ইমরান, ৩:৯৬) মক্কা নামটি ব্যবহারের পরিবর্তে কেন বাক্কা নামটিতে ফিরে গেলেন? বাইবেল অধ্যয়ন ব্যতীত এই প্রশ্নের উত্তর বের করা সম্ভব হবে না। যখন আমরা তা করবো তখন দেখতে পাবো যে, নিম্নে বর্ণিত সকল দলিল প্রমাণ রহস্যজনকভাবে বাইবেল থেকে উধাও হয়ে গেছে:

- ইব্রাহীম (আঃ)-এর কয়েক বারের আরব ভ্রমণ,
- আরবের জনমানবহীন উপত্যকায় হাজেরা এবং ইসমাইল উভয়কে রেখে আসা,
- জমজম ছিল আরবের জনমানবহীন উপত্যকার ঝর্ণা,
- আরবের জনমানবহীন উপত্যকাতে প্রথম মসজিদের নির্মাণ,
- ইব্রাহীম (আঃ) এবং ইসমাইল (আঃ) উভয়ে মিলে একটা ভবন নির্মাণ, যার অবস্থান ছিল আরবে,
- আরবদেশে আল্লাহ্র সেই ঘরে হজ্ব কায়েম করা,
- ইসমাইল ছিলেন কুরবানির জন্যে নির্দিষ্ট, এবং
- কুরবানির স্থল ছিল আরবে।

এসকল কথা মুছে ফেলা সত্যেও, বাইবেলে কিন্তু আজও **বাক্কা** নামটি উল্লেখিত আছে (নিচে দেখুন)। পাপের সাথে ঐশ্বরিক বাণীতে যারা পরিবর্তন আনতো এবং উপরের বিষয়গুলিকে যারা পরিবর্তন করেছে, **বাক্কা** নামটি তাদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। সম্ভবত মহান আল্লাহ্ তা'আলা এই নামটিকে তাদের চোখের আড়ালে রেখে

দিয়েছেন। এটা পরিষ্কার, কুর'আনে পুরাতন **বাক্কা** নামটি ব্যবহারের ঐশ্বরিক উদ্দেশ্য হচ্ছে, বিকৃত বাইবেলে আজও যে সত্য দলিলটি সংরক্ষিত রয়েছে তা প্রকাশ করে দেওয়া এবং বাইবেলের বিকৃত অংশকে প্রকাশ করা। যবুর ৮৪ (নতুন সংস্করণ):

১. কত চমৎকার **তোমাদের বাসস্থান!** হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর।
২. আমার অন্তর লালায়িত এমনকি অভিমানি হয় ঈশ্বরের অনুগ্রহের জন্যে। আমার মন এবং শরীর জীবন্ত ঈশ্বরের জন্যে কাঁদে।
৩. চড়ুই পাখিরা পর্যন্ত নিজেদের **নীড়** পেয়েছে এমনকি আবাবিলরাও নিজেদের নীড় তৈরী করেছে যেখানে সে তার যৌবন কাটাচ্ছে তোমার উপাসনালয়ের নিকটে! হে আমার সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, আমার বাদশাহ, আমার প্রতিপালক।
৪. যারা **তোমার বাসস্থানে** থাকে ধন্য তারা, তারা তোমাকে প্রশংসিত করে সীলোহ।
৫. ধন্য তারা যাদের শক্তি তোমার জন্যে নিবেদিত যারা তাদের মনকে **তীর্থযাত্রার** জন্যে তৈরী করেছে।
৬. যখন তারা **বাক্কার** উপত্যকা অতিক্রম করে তখন তারা তাকে **ঝর্ণার** স্থানে পরিণত করে ; শরৎকালও তার জলাশয়গুলিকে পূর্ণ করে দেয়।

'বাক্কার উপত্যকা', ***'ঝর্ণার'***, **'জলাশয়সমূহ'**, ***'তীর্থযাত্রার'***, ***'তোমার বাসস্থানে'***, **'নীড়'** এসবই সুস্পষ্টভাবে মক্কার কাবা বা বাইতুল্লাহকে (আল্লাহ্‌র ঘর) এবং জমজম কূপকে নির্দেশ করছে যা মক্কার একমাত্র ঝর্ণা ছিল, ইসমাইল (আঃ) এবং হাজেরা যখন পানির জন্যে হাহাকার করছিলেন এই ঝর্ণা থেকে তখন পানি নির্গত হয়েছিল।

অর্থের সামগ্রিকতা উপলব্ধি করার জন্যে উপরের আলোচিত সূরা আলে ইমরানের ৯৬নং আয়াতটির ব্যাখ্যা একটি মূলনীতি (উসূল-আত-তাফসীর) প্রতিষ্ঠা করেছে। (সেটা হচ্ছে) কুর'আনের বাহিরে অবস্থিত তথ্য উপাত্ত গবেষণা দ্বারাই কেবল এসব আয়াতের অর্থ বের করা সম্ভব হবে। কুর'আন নাযিলের সময় সে তথ্য উপাত্ত বিদ্যমান থাকুক কিংবা না থাকুক অথবা কুর'আন নাযিলের পর ইতিহাসের দীর্ঘ কাল অতিবাহিত হবার পর তা প্রকাশিত হোক তাতে কিছু যায় আসে না। কেননা কুর'আন নিজেই বলছে ঐশ্বরিক নিদর্শনকে সে প্রকাশ করবে, যেটা এই কিতাবের সত্যতা প্রমাণ করবে:

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

অচিরেই আমি তাদেরকে আমার নিদর্শন দেখাব (মহাবিশ্বের) সুদূর দিগন্তে ও (ইতিহাসের কাল প্রবাহসহ) তাদের নিজেদের মধ্যেও, যেন এটি তাদের নিকট পরিষ্কার হয়ে যায় যে, এই ওহীটি সত্য; এটি কি যথেষ্ট নয় যে তাদের প্রতিপালক সবকিছু প্রত্যক্ষ করছেন?

[ফুস্‌সিলাত ৪১:৫৩]

আমরা বলছি, **শেষ সময়ের আলামত** এমন একটা বিষয় যা কুর'আনের আয়াত থেকে সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করা ততক্ষণ পর্যন্ত সম্ভব হবে না যতক্ষণ না ইতিহাসের স্রোতধারায় সেসব ঘটনা প্রকাশিত হচ্ছে। পবিত্রভূমিতে ইহুদিদের প্রত্যাবর্তন এবং শহরটিকে নিজেদের শহর হিসেবে দাবী করা, সেখানে পুনরায় ইসরাঈলি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা, ইত্যাদি, এরকমই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এসব প্রকাশিত ঘটনাগুলির গভীর পর্যবেক্ষণের মাধ্যমেই এই বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত কুর'আনের আয়াতগুলিকে উপলব্ধি করা যাবে।

অন্যান্য ধর্মগ্রন্থে ইয়াজুজ ও মাজুজ

সবশেষে, আমাদের কর্মপন্থা হচ্ছে, পূর্ববর্তী ধর্মগ্রন্থসমূহে ইয়াজুজ ও মাজুজের সাথে সম্পৃক্ত যাবতীয় বর্ণনাকে এড়িয়ে যাওয়া। তাই এ বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত কুর'আনের আয়াত এবং নবী (সাঃ)-এর হাদীসের মাঝে নিজেদেরকে সীমাবদ্ধ রেখেছি। বিষয়টিকে সহজ করার জন্যে আমরা এরূপ করেছি যেন আমাদের পাঠক বইটি পড়ার সময় কোন অপ্রয়োজনীয় জটিলতার সম্মুখীন না হন।

কুর'আন এবং সেই সাথে এর সহায়ক হিসেবে নবী (সাঃ)-এর প্রদান করা তথ্য উপাত্তকে বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিষয়টিকে ভালভাবে উপলব্ধি করার পরই একজন উৎসাহী পাঠক অন্যান্য ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত তথ্য উপাত্তকে অতিরিক্ত বর্ণনা হিসেবে তার গবেষণাতে অন্তর্ভূত করতে পারেন। বাইবেল এবং সেই সাথে হিন্দু ধর্মগ্রন্থ যেমন কলকি পুরাণে (কল্কা এবং বিকল্কার উল্লেখ রয়েছে যারা কলকির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে) উল্লেখিত বর্ণনাগুলিকে খুব সতর্কতার সাথে গবেষণা এবং পর্যবেক্ষণ করতে হবে। কুর'আন ও হাদীস থেকে প্রাপ্ত অর্থপ্রকাশের পদ্ধতির সাথে তা কতটুকু সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং কতটুকু

বিরোধযুক্ত তা সনাক্ত করতে হবে। কেবলমাত্র তখনই, এ সমস্ত তথ্য উপাত্ত বৈধ হিসেবে বিষয়টির সাথে অতিরিক্ত প্রমাণ হিসেবে বিবেচিত হবে।

www.islamfind.wordpress.com

তিন - পরিভাষাসমূহের ব্যাখ্যা

এর উদাহরণ হিসেবে কুর'আনের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ আয়াতটিকে উল্লেখ করা যেতে পারে, যেখানে কেউ বা কোন কিছুকে সা'আর ***ইল্‌ম*** (জ্ঞান) বা ***আলাম*** (চিহ্ন) হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। সে হিসেবে এই কেউ বা কোন কিছুই হচ্ছে সেই আসল চাবিকাঠি, যা শেষ সময়কে, এবং সেই সাথে কখন সা'আ আসবে, তাকে চিহ্নিত করবে এবং উভয় জিনিসকেই খুলে দিবে। আমাদের বিষয়টির সাথে সম্পৃক্ত ***অর্থপ্রকাশের পদ্ধতি***কে আমরা এই ইল্‌ম বা আলাম থেকেই বের করেছি।

ইয়াজুজ ও মাজুজ বিষয়টি **সা'আর** (শেষ সময়) অন্তর্গত। এই পরিভাষাটির সাথে আরো অনেক পরিভাষার সম্পর্ক রয়েছে। **আধুনিক যুগে ইয়াজুজ ও মাজুজ** বিষয়টি ব্যাখ্যার পূর্বে সে সব পরিভাষাকেও ব্যাখ্যা করতে হবে এবং এদের মাঝে পার্থক্য নির্ণয় করতে হবে।

ইয়াওম আল-কিয়ামাহ কুর'আনে সাধারণত পুনরুত্থান দিবসকে (ইয়াওম আল বা'আস) বুঝায়। এটি সেই সাথে **হিসাব নিকাশের দিন**কে (ইয়াওম আদ-দীন) বুঝাতেও ব্যবহৃত হয়েছে। যাই হোক, পুনরুত্থান দিবস এবং **হিসাব নিকাশের দিনে**র আগে, এই বস্তুজগত প্রথমে ধ্বংস হবে যেটা **সা'আ** বা শেষ সময় হিসেবে পরিচিত। **সা'আ, ইয়াওম আল-বা'আস, ইয়াওম আল-কিয়ামাহ, ইয়াওম আদ-দীন** ইত্যাদি সকল পরিভাষাকে একসাথে ব্যক্ত করে এমন একটি পরিভাষা হচ্ছে **ইয়াওম আল-আখিরাহ** অথবা শেষ দিবস।

সা'আ বা শেষ সময়ের মাধ্যমে বস্তুজগত ধ্বংস হবার আগে অনেকগুলি আলামত প্রকাশ পাবে যেটা আল্লাহ্ তা'আলা স্থির করে রেখেছেন। এদের বলা হয় **আলামাতুস সা'আ** (শেষ সময়ের আলামত)। আর এদেরকে সচরাচর **'ছোট'** ও **'বড়'** আলামত হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

সে সমস্ত ছোট আলামতের মাঝে (যদিও লেখক এদের কোনটিকে ছোট হিসেবে বিবেচনা করেন না) রয়েছে, **নারীরা কাপড় পরিধান করবে তারপরেও তাদেরকে উলঙ্গ মনে হবে; মহিলারা পুরুষের ন্যায় কাপড় পরিধান করবে; পুরুষেরা মহিলাদের**

www.islamfind.wordpress.com

ন্যায় কাপড় পরিধান করবে; লোকেরা জনসম্মুখে গাধার ন্যায় যৌনমিলন করবে; সবচেয়ে মন্দ লোকেরা নেতা হবে এবং কোন গোত্রের সবচেয়ে মন্দ সদস্যটি হবে গোত্রের নেতা, লোকজন তাদের মেনে চলবে, তাদের নেতৃত্বের সম্মানে নয় বরং তাদের দ্বারা সংঘঠিত খারাপ পরিণতির ভয়ে। বড় আলামতগুলিকে বিবেচনা করা হয় এই বইয়ে পূর্বে উল্লেখিত হাদীসটির মাধ্যমে:

হুযায়ফা ইবনে উসায়েদ গিফারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত:

> আমরা আলোচনায় ব্যস্ত থাকা অবস্থায়, হঠাৎ আল্লাহ্‌র নবী (সাঃ) আমাদের কাছে আসলেন। তিনি বললেন: "তোমরা কি নিয়ে আলোচনা করছো?" সাহাবীগণ বললেন: "আমরা শেষ সময় নিয়ে আলোচনা করছিলাম"। তখন তিনি বললেন: "*দশটি আলামত যতক্ষণ না দেখতে পাও ততক্ষণ শেষ সময় দেখতে পাবে না।" এই বিষয়ে তিনি ধোঁয়া, দাজ্জাল, [মাটির] জানোয়ার, পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়, মরিয়ম পুত্র ঈসা (আঃ)-এর আগমন, ইয়াজুজ ও মাজুজ এবং তিনটি স্থানে যথা পূর্বের কোন স্থানে, পশ্চিমের কোন স্থানে, এবং আরবদেশে ভূমি ধ্বসের কথা উল্লেখ করেন, যার শেষে ইয়েমেন থেকে আগুন ছড়াতে থাকবে, ফলে মানুষ তাড়া খেয়ে তাদের মিলন স্থলে গিয়ে জড়ো হবে*।
>
> [সহীহ মুসলিম]

পাঠককে এটা মনে রাখতে হবে, এই দশটি আলামত যে কোন্ ক্রমে ঘটবে নবী (সাঃ)-এর কথা থেকে তার কোন প্রমাণ নেই। ফলে **মরিয়ম পুত্র ঈসা (আঃ)-এর প্রত্যাবর্তনের** পর ইয়াজুজ ও মাজুজের উল্লেখ করার মানে এই না যে, তাঁর মুক্তির পর এই বিশ্বে ইয়াজুজ ও মাজুজের মুক্তি হবে।

নবী (সাঃ) একবার একটা স্বপ্ন দেখেন যাতে তাঁর নিকট ওহী পাঠানো হয় যে, যুলক্বার্নাইন কর্তৃক নির্মিত প্রাচীরটিতে একটি ছিদ্র তৈরী হয়েছে। এই কথা থেকে প্রকাশ পায় যে, ইয়াজুজ ও মাজুজের মুক্তির ঐশ্বরিক প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়ে গেছে।

> জয়নব বিনতে জাহাশ (রাঃ) বলেন: " ... একদিন নবী (সাঃ) ভয়ার্ত অবস্থায় আমাদের নিকটবর্তী হলেন এবং বললেন: আল্লাহ্ ব্যতীত কারো উপাস্য হবার অধিকার নেই! আরবদের দুর্ভাগ্য, এক মহা অকল্যাণ তাদের কাছে আসছে। *(আজ)* ইয়াজুজ ও মাজুজের প্রাচীরে একটি ছিদ্রের সৃষ্টি হয়েছে। নবী (সাঃ) তাঁর তর্জনী আর বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়ে একটি বৃত্ত তৈরী করে দেখালেন।"

[সহীহ বুখারী ও মুসলিম]

জয়নব বিনতে জাহাশ (রাঃ) বলেন: " ... একদিন নবী (সাঃ) ভয়ার্ত অবস্থায় আমাদের নিকটবর্তী হলেন এবং বললেন: আল্লাহ্ ব্যতীত কারো উপাস্য হবার অধিকার নেই! আরবদের দুর্ভাগ্য, এক মহা অকল্যাণ তাদের কাছে আসছে। *(আজ)* ইয়াজুজ ও মাজুজের প্রাচীরে একটি ছিদ্রের সৃষ্টি হয়েছে। নবী (সাঃ) তাঁর তর্জনী আর বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়ে একটি বৃত্ত তৈরী করে দেখালেন। আমি বললাম, 'হে নবী (সাঃ) আমাদের ভিতর সৎলোক থাকা সত্ত্বেও কি আমরা ধ্বংস হয়ে যাবো?' নবী (সাঃ) বললেন, "হ্যাঁ! (এটি ঘটবে) যখন মন্দ লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে (জঞ্জাল, মন্দ, খারাপ আচরণ, যৌন স্বেচ্ছাচারিতা ইত্যাদি পৃথিবীকে ঢেকে ফেলবে)।" (এটি কেবল আরবদের উপর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক অত্যাচারই নয় বরং তারা সকল ক্ষেত্রে চরমভাবে ও নির্লজ্জভাবে অপদস্ত হবে)।

[সহীহ বুখারী]

নবী (সাঃ) একবার তাঁর তর্জনী এবং মধ্যমা আঙ্গুলকে একত্র করেন এবং ঘোষণা করেন:

بعثت انا و الساعة كهاتين

আমি এবং ইয়াওম আল-কিয়ামাহ এই দু'টির ন্যায়।

[সহীহ মুসলিম]

এই দু'টি ঘটনা থেকে বুঝা যায় যে, শেষ যুগ, যা **সা'আ** এবং **ইয়াওম আল-কিয়ামাহ**র মাধ্যমে শেষ হবে, নবী (সাঃ)-এর জীবদ্দশাতেই আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। এটা আরও প্রমাণ করে যে, **সা'আ**র (শেষ সময়ের) আলামতগুলি নবী (সাঃ)-এর যুগ থেকেই বিশ্বে প্রকাশ পেতে শুরু করেছে।

আমাদের বই *Jerusalem in the Qur'ān*-এ যুক্তি দেখিয়েছি যে, ভন্ড মসীহ দাজ্জালের মুক্তি নবী (সাঃ)-এর যুগেই সম্পাদিত হয়েছে। পৃথিবীতে তার ৪০ দিনের মধ্যে প্রথম দিন হবে 'এক বছরের সমান', দ্বিতীয় দিন হবে 'এক মাসের সমান', তৃতীয় দিন হবে 'এক সপ্তাহের সমান', আর বাকি দিনগুলি হবে 'তোমাদের দিনগুলির মত'। আরও দেখিয়েছি যে তার প্রথম দিনে ব্রিটেন ছিল তার সদর দফতর, দ্বিতীয় দিনে আমেরিকা ও তৃতীয় দিনে ইসরাঈল। তারপর যখন সে আমাদের 'দিনে' প্রবেশ করবে

তখন সে পূব দিক থেকে এক উড়ন্ত গাধায় চড়ে আসবে, অর্থাৎ তার বোমারু বিমান মদীনার পূবে অবস্থিত কোন বিমানবন্দর থেকে উড্ডয়ন করবে।

মানবজাতিকে বারবার সতর্ক করে কুর'আন বলছে, আল্লাহ্‌র প্রতি আসলে প্রকৃত ঈমান কে এনেছে আর কে আনেনি, সেটা দেখার জন্যে মানবজাতিকে ঐশ্বরিক পরীক্ষার সম্মুখীন হবে। এই পরীক্ষাগুলিকে কুর'আন *ফিতনা* হিসেবে উল্লেখ করেছে:

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

পরীক্ষা, দুর্দশা, মন্দ কাজের প্রতি আকর্ষণ থেকে সাবধান হও, এই পরীক্ষা কেবলমাত্র তোমাদের মধ্যাকার অত্যাচারী ও অন্যায়কারীদের জন্য নয় (বরং সকলের জন্য)। জেনে রাখো আল্লাহ্ আযাব প্রদানে কঠোর।

[আন্‌ফাল ৮:২৫]

মহান আল্লাহ্ তা'আলা আরো একটি সতর্কবাণীর ঘোষণা দিয়েছেন যা **ও'য়াদ** নামে পরিচিত। অর্থাৎ ঐশ্বরিক পূবার্ভাস যা আসন্ন ফিতনা সম্পর্কে সতর্ক করে দিবে। সুনির্দিষ্ট ঘটনা সম্পন্ন হবার পরপরই এই ফিতনা আসবে। উদাহরণস্বরূপ, কুর'আন তাৎপর্যপূর্ণভাবে ঘোষণা করছে, ইসরাঈলি জাতি ঠিক সে সময় এক বিশেষ পরীক্ষা ও মুসিবতের সম্মুখীন হবে যখন আল্লাহ্ তাদের বিরুদ্ধে এমন লোকদের পাঠাবেন, যারা তাদের উপর নির্মম অত্যাচার-নির্যাতন চালাবে। সবোর্চ্চ এই শাস্তি অব্যাহত থাকবে **ইয়াওম আল-কিয়ামাহ**র খুব নিকটবর্তী সময় পর্যন্ত।

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

তোমার প্রতিপালক তোমাকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি তাদের (ইসরাঈলি জাতির) বিরুদ্ধে এমন এক জাতির আবির্ভাব ঘটাবেন যারা কিয়ামত পর্যন্ত তাদের উপর নিকৃষ্ট ধরনের অত্যাচার-নির্যাতন চালাতে থাকবে। বস্তুত তোমার প্রতিপালক দ্রুত শাস্তি প্রদান করেন; তবুও তিনি ক্ষমাশীল এবং পরম দয়ালু।

[আ'রাফ ৭:১৬৭]

ইয়াজুজ ও মাজুজ ব্যতীত ঐশ্বরিকভাবে আবির্ভূত আর কেউই হতে পারে না, যাদের মিশন হচ্ছে ইসরাঈলি জাতিকে **ইয়াওম আল-কিয়ামাহ** পর্যন্ত শাস্তি প্রদান করা (তাদেরকে প্রতারিত করে জাহান্নামে পাঠানোর চেয়ে বড় শাস্তি আর কি হতে পারে)।

সা'আ বা শেষ সময় একটা নির্দিষ্ট সময়কাল যার শুরু ও শেষ রয়েছে। সেই সময় এমন সব ঘটনা ঘটবে যা ইতিহাসের ধারাকে সমাপ্তির দিকে নিয়ে যাবে। কেননা আমরা জানি যে, **ইতিহাসের সমাপ্তি** ঘটবে। **ইতিহাসের সমাপ্তি** বিশ্বকে সমাপ্তির দিকে নিয়ে যাবে, পৃথিবী তখন ইতিহাসের ক্রমধারায় **সত্য** ও **মিথ্যা**র মধ্যাকার চূড়ান্ত দ্বন্দ্বকে পর্যবেক্ষণ করবে। আর সেখানে **সত্য** তার সকল প্রতিদ্বন্দ্বির বিরুদ্ধে সর্বশেষ ও চূড়ান্ত বিজয় লাভ করবে।

বস্তু জগতের পরিসমাপ্তির মাধ্যমে **সা'আ**র সমাপ্তি ঘটবে। পাহাড় পর্বতসমূহ তুলার ন্যায় তখন এদিক ওদিক উড়তে থাকবে, মৃতরা কবর থেকে পুনরুত্থিত হবে। কুর'আন মানবজাতিকে সতর্ক করছে যে, যে ঘটনার মাধ্যমে বস্তুজগত ধ্বংস হবে সেটা সত্যিই এক ভয়ানক ব্যাপার হবে।

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ

হে মানবজাতি! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করো, কেননা শেষ সময়ের কম্পনটি হবে এক ভয়াবহ ঘটনা।

[হজ্জ ২২:০১]

বস্তুজগতের ধ্বংসের মাধ্যমে সা'আ তার চূড়ান্তে পৌঁছাবে, আর বিচার দিবসের দিকে অগ্রসর হয়ে কিয়ামত-দিবস তার চূড়ান্তে পৌঁছাবে। মানুষ সে সময় পুনরুত্থিত হবে এবং বিচারের সম্মুখীন হবে। **সত্য** হবে সে দিনের চলার পথ, যা সকল প্রতিদ্বন্দ্বির উপর বিজয়ী হবে।

এই বিচার দিবসে, প্রত্যেক মানুষের ঈমান ও আমল দাঁড়িপাল্লায় মাপা হবে, যেমনটি কুর'আনে আলোচিত হয়েছে। প্রত্যেককে তার আমলনামা দেয়া হবে এবং পড়তে আদেশ করা হবে। সবশেষে সকলকে একটি পুল অতিক্রম করতে আদেশ করা হবে, জান্নাতের দিকে তার মুখ থাকবে আর তার নিচে থাকবে জাহান্নাম। এটি এতই সংকীর্ণ ও এতটাই অন্ধকারপূর্ণ হবে যে, কেউ তার নিজের হাতও অন্তরের আলো (আত্মিক) ব্যতীত দেখতে পাবে না। যাদের অন্তরে আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান রয়েছে এবং যাদের আচরণ ভাল, আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে বিশেষ আলো প্রদান করবেন যা দিয়ে তারা দেখতে পাবে। এই আলো স্টক মার্কেটে বিক্রি হয় না!

সা'আ কবে সংঘঠিত হবে, সেটা আল্লাহ্ ছাড়া কেউ জানে না (অর্থাৎ **সা'আ**'র শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত, যার মাধ্যমে ইতিহাস চূড়ান্তে পৌঁছাবে, বস্তুজগত ধ্বংস হবে, পুনরুত্থান সংগঠিত হবে, এবং বিচার দিবস আসবে)।

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

(হে মুহাম্মাদ!) তারা তোমাকে শেষ সময় সম্পর্কে প্রশ্ন করে: "কখন এটি সংঘঠিত হবে?" (আক্ষরিকভাবে কখন এটি নোঙ্গর ফেলবে এবং যাত্রা শেষ করবে; যেহেতু এটি একটি পালতোলা জাহাজের ন্যায়)। বলো: "বস্তুত, এর সময় তো কেবল মহান আল্লাহ্র নিকটেই রয়েছে। নির্ধারিত সময়ে তিনিই তা প্রকাশ করবেন। সামাওয়াত এবং পৃথিবীর উপর এর ওজন খুব ভারি হবে। আর এটা তোমাদের উপর হঠাৎ আপতিত হবে।" তারা তোমাকে প্রশ্ন করছে (এই মনে করে) যেন তুমি এ ব্যাপারে খবর রাখ! বলো, "এ বিষয়ের জ্ঞান কেবল আল্লাহ্র নিকটে রয়েছে। যদিও অধিকাংশ লোক তা বিশ্বাস করে না।"

[আ'রাফ ৭:১৮৭]

ইতিহাসের সমাপ্তির পর থেকে **বস্তুজগতের সমাপ্তি**র আগ পর্যন্ত সময়টা কতটুকু সংক্ষিপ্ত বা দীর্ঘ হবে তাও কেউ জানে না। এটা কয়েকশত বছরের মতো হতে পারে। কিন্ত দ্বীন ইসলাম সুনির্দিষ্ট তথ্য প্রদানের মাধ্যমে বস্তুজগতের ধ্বংস এবং সেই সাথে **শেষ সময়ের আলামত** বিষয় দু'টিকে বর্ণনা করেছে, যা সা'আর মধ্যাকার সেই সময়টির নিকটবর্তীতাকে সনাক্ত করতে সাহায্য করেছে, অর্থাৎ যখন 'ইতিহাসের সমাপ্তি ঘটবে'। এটাই আমাদের বইয়ের আলোচ্য বিষয়।

বস্তুজগতের পরিসমাপ্তি

কুর'আন ঘোষণা করেছে, এই বস্তুজগত ধ্বংস হবে, একে ভিন্ন এবং নতুন কিছুতে পরিবর্তিত করা হবে:

يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ

একদিন এই time and space অর্থাৎ স্থান-কালের পৃথিবীকে ভিন্ন একটি পৃথিবীতে এবং সামাওয়াতকে ভিন্ন এক মহাকাশে রূপান্তরিত করা হবে, এবং তখন মানুষকে একচ্ছত্র শক্তিশালী আল্লাহ্‌র সামনে সারিবদ্ধ করা হবে।

[ইব্রাহীম ১৪:৪৮]

মানবজাতি তখন নতুন জীবন নিয়ে পুনরুত্থিত হবে:

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ

যারা সত্যকে অস্বীকার করে তারা (এবং এই মানসিকতার সকলে) বলে: "আমরা কি এমন এক ব্যক্তির সন্ধান দেবো যে তোমাদেরকে বলে যে, (মৃত্যুর পর) তোমরা যখন পুরোপুরি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে তখন নাকি তোমরা নতুনভাবে সৃজিত হবে।"

[সাবা ৩৪:০৭]

কুর'আন আরো ঘোষণা করছে, সে দিন পৃথিবী কথা বলবে এবং সকল গোপন বিষয় প্রকাশ করে দেবে:

يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا

সে দিন পৃথিবী তার সকল বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে।

[যিলযাল ৯৯:০৪]

এগারো সেপ্টেম্বরের ঘটনার হোতাদের ব্যাপারে ব্রিটিশ, আমেরিকান, ইসরাঈলি সরকারের সংবাদপত্র, রেড়িও টেলিভিশনে প্রচারিত খবরকে যে সব গরু-ছাগলের দল হজম করেছে, সে দিন তারা চরমভাবে হতবাক হয়ে যাবে যখন দেখবে, এই হামলাকারীরা এবং সেই সাথে লন্ডন, মাদ্রিদ, মুম্বাই ইত্যাদির উপর হামলাকারীরা আসলে ইসরাঈলি মোসাদ, আমেরিকান *CIA* এবং তাদের সহযোগী। অবশ্য সেদিন নিরীহ মুসলিমরা, যাদেরকে টার্গেট করা হচ্ছে, নির্যাতন করা হচ্ছে, নিপীড়ন করা হচ্ছে, ভীত সন্ত্রস্ত করা হচ্ছে গুয়ান্তানামো কারাগারে, আবু গারিব কারাগারে এবং নির্যাতন ও নিপীড়নের অন্য সব শৈল্পিক প্রতিষ্ঠানে, এবং যারা এই সন্ত্রাসী আক্রমণের অজুহাতে অন্যায় যুদ্ধ চালাচ্ছে, সেদিন যখন পৃথিবী কথা বলবে, তখন সেসব মুসলিমরা অবাক হবে না, অবাক হবে না যখন ষাট লক্ষ ইহুদি নির্মূলের সম্পূর্ণ এবং আসল ঘটনা প্রকাশ করে দেয়া হবে। বস্তুজগতের এই ধ্বংস মানকজাতির উপর হঠাৎ এসে যাবে:

وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

সামাওয়াত এবং পৃথিবীর গোপন জ্ঞান কেবল আল্লাহ্‌র নিকটেই রয়েছে। আর শেষ সময়ের ব্যাপারটি এ রকম হবে যে, (মনে হবে) তা চোখের পলকের ন্যায় কিংবা আরো নিকটবর্তী (অর্থাৎ আরো দ্রুত)। আর আল্লাহ্ তা'আলা সকল বিষয়ের উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান।

[নাহ্‌ল ১৬:৭৭]

নিচে বর্ণিত নবী (সাঃ)-এর হাদীসে সেই মুহূর্তের আকস্মিকতা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়:

কিয়ামত সংঘঠিত হবে যখন দু'জন লোক কাপড় মেলে ধরবে, কিন্তু না তারা তা বিক্রি করতে পারবে, না পারবে গুছিয়ে রাখতে (এই অবস্থায় শেষ সময় তাদেরকে আচ্ছন্ন করবে)। কিয়ামত সংঘঠিত হবে যখন একজন লোক তার উটনীর দুধ দোহাবে এবং দুধ বের করবে কিন্তু তা পান করার সময় পাবে না (এই অবস্থায় শেষ সময় তাকে আচ্ছন্ন করবে)। কিয়ামত সংঘঠিত হবে যখন কোন লোক তার পশুদের পানি খাওয়াবার জন্য চৌবাচ্চা মেরামত করবে কিন্তু সে কাজটা শেষ করতে পারবে না (এই অবস্থায় শেষ সময় তাকে আচ্ছন্ন করবে)। কিয়ামত সংঘঠিত হবে যখন একজন লোক মুখে লোকমা (খাবার) নিবে কিন্তু সে তা খেতে সক্ষম হবে না (এই অবস্থায় শেষ সময় তাকে আচ্ছন্ন করবে)।

[সহীহ বুখারী]

আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত; নবী (সাঃ) বলেছেন: "যখন শেষ সময় আসবে (সেটা এত দ্রুত হবে যে) এক ব্যক্তি তার উটনীর দুধ দোহাবে (কিন্তু দুধ) তার শিরার কিনারা থেকে বের হবার আগেই শেষ সময় এসে পড়বে; কিয়ামত সংঘঠিত হবে যখন দু'জন লোক কাপড় কেনা বেচাতে লিপ্ত হবে এবং তাদের দরকষাকষি শেষ করার আগেই শেষ সময় এসে পড়বে; এবং এক ব্যক্তি তার পশুপাখির জন্যে পানির বন্দোবস্ত করতে যাবে, কিন্তু সেই ফাঁকে শেষ সময় এসে পড়বে।"

[সহীহ মুসলিম]

বিশ্ব ইতিহাসের পরিসমাপ্তি

এব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি হলো, নিরেট **সত্যের** উপর প্রতিষ্ঠিত ধর্ম বা মতাদর্শটি তার প্রতিদ্বন্দ্বি অন্য সব ধর্ম ও মতাদর্শের উপর যখন সর্বশেষ ও চূড়ান্ত বিজয় লাভ করবে এবং গুরুত্বপূর্ণভাবে, **নিরেট সত্যটি** যখন মুসলমানদের মধ্যে অবস্থিত সকল ফিরকার উপর নিয়ন্ত্রণ লাভ করবে, **ইতিহাসের সমাপ্তি** ঠিক তখনই সংঘঠিত হবে। তিন তিনবার কুর'আনে একটি আয়াতের পুনরাবৃত্তি হয়েছে যেটা পরিষ্কারভাবে **ইতিহাসের সমাপ্তির** নির্দেশ করছে:

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ

তিনিই সেই সত্তা যিনি তাঁর রসূলকে পাঠিয়েছেন হেদায়েত (পৌঁছে দেবার কাজ) সহ এবং সত্য দ্বীন সহ, যেন (চূড়ান্তভাবে ইতিহাসের শেষ পর্যায়ে) তিনি ইহাকে সকল (মিথ্যা) ধর্ম (এবং মতাদর্শের) উপর বিজয়ী করতে পারেন; যদিও এটি তারা পছন্দ করবে না যারা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যদের উপর ঐশ্বরিক ক্ষমতা (সার্বভৌমত্ব, চূড়ান্ত আইন ইত্যাদি) আরোপ করে।

[তাওবাহ ৯:৩৩, সফ ৬১:০৯]

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا

তিনিই সেই সত্তা যিনি তাঁর রসূলকে পাঠিয়েছেন হেদায়েত (পৌঁছে দেবার কাজ) সহ এবং সত্য দ্বীন সহ, যেন (চূড়ান্তভাবে ইতিহাসের শেষ পর্যায়ে) তিনি ইহাকে সকল (মিথ্যা) ধর্ম (এবং মতাদর্শের) উপর বিজয়ী করতে পারেন, এবং আল্লাহ্ই সাক্ষী হিসাবে যথেষ্ঠ।

[ফাত্হ ৪৮:২৮]

সকল মতাদর্শের পক্ষ থেকে **"সত্য** আমাদের কাছে রয়েছে" এই দাবী করার মনোভাবটা তখনই প্রকাশ পেয়েছে, যখন আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ পশ্চিমা সভ্যতার জন্ম হয়। এই সভ্যতার মাধ্যমেই বিজয়ীর বেশে পশ্চিম দিক থেকে একটি **সূর্য** আবির্ভূত হয় এবং অত্যন্ত জোরালোভাবে ঘোষণা করে, এই সভ্যতার পূর্ববর্তী সকলের সত্যের দাবী বাতিল, রহিত ও গুরুত্বহীন। ঐতিহাসিক *Arnold Toynbee* (আরনল্ড টয়েনবী) খুবই নির্ভীকভাবে ঘোষণা করেছেন, "Western civilization is aiming at nothing less than the incorporation of all of mankind in a single great society and the

control of everything in the earth, air and sea ... " অর্থাৎ, "পশ্চিমা সভ্যতার একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে, সমগ্র মানবজাতিকে একটি মহাসমাজে" একীভূত করা এবং জলে, স্থলে এবং সমুদ্রে সমস্ত কিছু নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেয়া ...।"

[টয়েনবী, *Civilization on Trial*, পৃ-১৬৬]

এই সভ্যতা কেবল বিশ্বকেই নিয়ন্ত্রণ করছে না বরং অতি ধৃষ্টতার সাথে দাবী করছে যে, এরাই ইতিহাসকে সমাপ্তিতে নিয়ে যাবে। পশ্চিমা ইতিহাস দার্শনিক *Francis Fukuyama* (ফ্রান্সিস ফুকুইয়ামা) দাবী করেন, এই সভ্যতাই ইতিহাসের চূড়ান্ত পর্ব ও তার সমাপ্তির প্রতিনিধিত্ব করে, এমন কিছুই নেই (গোটা মানবজাতি ও ইসলামসহ) যা এই সভ্যতাকে চ্যালেঞ্জ করবে এবং এর প্রতিদ্বন্দ্বি সবার উপর এই সভ্যতার দাপটময় আধিপত্যকে প্রতিস্থাপিত করবে।

সে যাই হোক, ইতিহাসের আসল ঘটনা যা ইতিহাসের চূড়ান্ত পর্বের দিকে নিয়ে যাবে, সেই মরিয়ম পুত্র ঈসা (আঃ)-এর নাটকীয় প্রত্যাবর্তন সম্পর্কে ফুকুইয়ামা কিন্তু একেবারে বেখবর!

সত্যিকারভাবে হতবাক করা এই **পশ্চিমা সূর্যোদয়** যা নিয়মিতভাবে বিজয়ীর বেশে উদিত হচ্ছে, তার প্রতি এই দার্শনিকের বিস্মিত হওয়াকে এই লেখক মেনে নিয়েছেন। তা সত্ত্বেও এই লেখক একে **মিথ্যা সূর্যোদয়** হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। বাস্তবিক পক্ষেই এই **পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়** নবী (সাঃ)-এর ভবিষ্যদ্‌বাণীকৃত শেষ সময়ের একটি আলামতের বাস্তবায়ন। উপরের আয়াতটি পবিত্র কুর'আনে **তিন তিনবার** এসেছে যেটা ঐশ্বরিকভাবে নিশ্চয়তা প্রদান করছে, **ইতিহাসের সমাপ্তি** ঘটবে ভিন্নভাবে। এটা নির্ধারিত যে **ইতিহাসের সমাপ্তিতে**, ইসলাম আধুনিক পশ্চিমা ধর্মনিরপেক্ষ সভ্যতাকে এবং সেই সাথে প্রতিদ্বন্দ্বি সকল মতাদর্শকে পরাজিত করবে।

কুর'আনের আয়াত ও নবী (সাঃ)-এর ভবিষ্যদ্‌বাণী এ ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গিকে আমাদের জানিয়ে দিচ্ছে। তা হচ্ছে, চূড়ান্তভাবে সত্যের বিজয় ও তার ফলস্বরূপ, **ইতিহাসের সমাপ্তি** তখনই সংঘঠিত হবে যখন প্রকৃত মসীহ মরিয়ম পুত্র ঈসা (আঃ) এবং ইমাম আল-মাহদীর আগমন ঘটবে। তাঁরা উভয়েই **জেরুযালেম** থেকে বিশ্ব শাসন করবে। তাঁদের এই শাসন অন্য প্রতিদ্বন্দ্বিদের উপর ইসলাম ধর্মের সত্যতার দাবীকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবে। এই সময়টাকে ইসলাম **সা'আ**র বা শেষ সময়ের বড় বা চূড়ান্ত আলামত হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। আর এটা নবী (সাঃ)-এর ভবিষ্যদ্‌বাণীকৃত (দশটি) আলামতের মধ্যে অন্যতম।

প্রকৃত মসীহ মরিয়ম পুত্র ঈসা (আঃ)-এর নাটকীয় প্রত্যাবর্তন যেহেতু ইসলামের **সত্যতার** দাবীকে পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত করবে, তাই তাঁর এই আগমনের সাথে সাথেই **সা'আ** আরম্ভ হবে। আল্লাহ্ই ভাল জানেন। কিন্তু শেষ সময় ততক্ষণ পর্যন্ত শেষ হচ্ছে না যতক্ষণ এই বস্তুজগতের অস্তিত্ব টিকে থাকছে। তাই ঈসা (আঃ)-এর প্রত্যাবর্তনের আগে সংঘঠিত সকল আলামতকে **সা'আর** আগমনের পূর্বাভাস মনে করতে হবে।

এসব আলামতের কিছু কিছু তো সাধারণভাবেই বিদ্যমান রয়েছে। এ রকম নাটকীয় একটা উদাহরণ কুর'আনে সংরক্ষিত রয়েছে। মক্কার কাফিররা নবী (সাঃ)-কে উপহাস করে বলেছিল: "তুমি যদি আসলেই নবী হয়ে থাক তবে চাঁদকে খন্ডিত করে দেখাও আমরা তোমার প্রতি ঈমান আনবো।"

নবী (সাঃ) আল্লাহ্র কাছে তাঁকে মুজিযা দেখানোর ক্ষমতা প্রদানের জন্যে প্রার্থণা করলেন এবং চাঁদ খুব দ্রুতভাবে খন্ডিত হয়ে গেল। এর এক অংশ সাফা পর্বতে দেখা গেল এবং আরেক অংশ কাইকান পর্বতে দেখা গেল। কুর'আন এই ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করেছে এবং ঘোষণা করেছে, এটা একটি আলামত যাতে (বুঝা যাচ্ছে) **সা'আ** বা শেষ সময় নিকটবর্তী হয়ে গেছে।

اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ

শেষ সময় নিকটবর্তী হয়ে গেছে এবং চাঁদ খন্ডিত হয়ে গেছে।

[ক্বামার ৫৫:০১]

শেষ সময় বিষয়টিকে বুঝার চাবিকাঠি

সা'আ বা **শেষ সময়ের আলামত** সম্পর্কিত নানা তথ্য কুর'আন তার বিভিন্ন আয়াতে পেশ করেছে। সেই আয়াতগুলিকে ব্যাখ্যা করতে হবে। বিষয়টি ঘনিষ্টভাবে সেসব আয়াতের সাথে জড়িত, ফিতনাবাজরা যেগুলির অপব্যাখ্যা করার জোর প্রচেষ্টা চালায়। সেসব অপব্যাখ্যাকে যারা গ্রহণ করে তাদেরকে পথভ্রষ্ট করার জন্যে এরূপ কাজ তারা করে থাকে। এর উদাহরণ হিসেবে কুর'আনের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ আয়াতটিকে উল্লেখ করা যেতে পারে, যেখানে **কেউ** বা **কোন কিছু**-কে **সা'আর** ***ইল্‌ম*** (জ্ঞান) বা ***আলাম*** (চিহ্ন) হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। সে হিসেবে এই **কেউ** বা **কোন কিছুই** হচ্ছে সেই আসল চাবিকাঠি, যা শেষ সময় এবং সেই সাথে কখন সা'আ আসবে তাকে

চিহ্নিত করবে এবং উভয় জিনিসকেই প্রকাশ করে দিবে। আমরা মূল বিষয়টিকে ***অর্থপ্রকাশের পদ্ধতি*** ব্যবহার করে এই ইল্‌ম বা আলাম থেকেই বের করেছি।

وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ

এবং তিনি (অথবা এটি) হলো (আসন্ন) সময়ের (শেষ সময়ের) ইল্‌ম বা আলাম। অতএব (শেষ সময়) সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। আমাকে অনুসরণ করো, এটিই সরল পথ।

[যুখরুফ ৪৩:৬১]

অধিকাংশ কুর'আন তাফসীরকারক, **"সে"** সর্বনামটিকে ঈসা (আঃ) এবং তাঁর প্রত্যাবর্তন হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। আধুনিক কিছু তাফসীরকারক {যেমন মুহাম্মাদ আসাদ (রঃ)} এই ধারণাতে উপনীত হয়েছেন যে, ঈসা (আঃ) মারা গেছেন। এর ফলস্বরূপ, ঈসা (আঃ) আবার প্রত্যাবর্তন করবেন এই বিশ্বাসকে তারা প্রত্যাখ্যান করেছেন। (আমাদের সামনের বই *An Islamic View of the Return of Jesus*-এ আমরা বিষয়টি নিয়ে ইনশাআল্লাহ্ বিস্তারিত আলোচনা করবো)। তাদের দাবী হলো এখানে **সে** বা **ইহা** সর্বনামটিকে ঈসা (আঃ)-এর পরিবর্তে কুর'আনকে মনে করতে হবে।

আরবি ব্যাকরণ অনুসারে, এই **'সে'** বা **'ইহা'** সর্বনামটি তিনটি জিনিসকে নির্দেশ করতে পারে, সেগুলি হচ্ছে: **ব্যক্তি ঈসা (আঃ), ঈসা (আঃ)-এর ঘটনা** ও **কুর'আন**। কিন্তু যে প্রসঙ্গে সর্বনামটি ব্যবহৃত হয়েছে তা সুস্পষ্টভাবে ব্যক্তি ঈসা (আঃ)-কে নির্দেশ করছে। ঈসা (আঃ)-এর প্রত্যাবর্তন এবং (তার আগে) দাজ্জালের আবির্ভাব হচ্ছে সেই ঘটনা যা আমাদেরকে জানিয়ে দিবে যে **সা'আ** এসে গেছে।

ঈসা (আঃ)-এর ঘটনা এবং **কুর'আন** আমাদেরকে জানাতে পারবে না যে, **সা'আ** বা শেষ সময় এসে গেছে। মহান আল্লাহ্ কুর'আনে বারবার বলেছেন **সা'আ** কখন আসবে তার জ্ঞান কেবল তাঁর নিকটেই রয়েছে। অতএব কখন সা'আ আসবে **কুর'আন** তা আমাদেরকে জানাতে পারবে না। কেবল মাত্র প্রকৃত মসীহ ঈসা (আঃ)-এর প্রত্যাবর্তন এবং (এর আগে) ভন্ড মসীহ দাজ্জালের আবির্ভাব আমাদেরকে জানিয়ে দেবে যে, **সা'আ** এসে গেছে। ঘটনা দু'টি কেবল **আলাম** বা আলামতই নয় বরং এগুলি হচ্ছে, **সা'আর** বা শেষ সময়ের আসল **জ্ঞান (ইল্‌ম)**।

যে প্রসঙ্গে আয়াতগুলি এসেছে সেই প্রসঙ্গটি ভালভাবে পর্যালোচনা করলে আমরা নিশ্চিত হবো যে, **'সে'** সর্বনামটি ব্যক্তি ঈসা (আঃ)-কে নির্দেশ করছে। নিম্নের

অনুচ্ছেদটি লক্ষণীয়। পাঠককে খুব ভালভাবে সর্বনামের ব্যবহারের দিকে মনোযোগ দিতে হবে।

وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ

যখনই মরিয়ম পুত্রের (সাথে সম্পৃক্ত ঘটনাটিকে) দৃষ্টান্ত হিসেবে পেশ করা হলো (চিন্তভাবনার উদাহরণ হিসেবে), (হে মুহাম্মাদ!) তোমার সম্প্রদায়, তাঁর (বা এর) ব্যাপারে শোরগোল লাগিয়ে দিল।

[যুখরুফ ৪৩:৫৭]

وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ

তারা উত্তরে বললো, "কোনটি উত্তম, আমাদের উপাস্যরা নাকি সে {**সে** সর্বনামটি পরিষ্কারভাবে ঈসা (আঃ)-কে নির্দেশ করছে}?" তারা কেবল বিতর্কের জন্যে তোমার সামনে তাঁকে পেশ করে। মূলত এরা কলহপ্রিয় সম্প্রদায়।

[যুখরুফ ৪৩:৫৮]

إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ

নিশ্চয়ই সে {'সে' সর্বনামটি পরিষ্কারভাবে ঈসা (আঃ)-কে নির্দেশ করছে} বান্দা ব্যতীত আর কিছুই নয়। আমরা তাঁর উপর রহমত পাঠিয়েছি {এখানেও **সে** সর্বনামটি পরিষ্কারভাবে ঈসা (আঃ)-কে নির্দেশ করছে} এবং আমরা তাঁকে {আবারও **সে** সর্বনামটি পরিষ্কারভাবে ঈসা (আঃ)-কে নির্দেশ করছে} ইসরাঈলি লোকদের জন্যে দৃষ্টান্ত হিসেবে পেশ করেছি (তাদেরকে এই বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করতে হবে এবং এথেকে উপদেশ গ্রহণ করতে হবে)।

[যুখরুফ ৪৩:৫৯]

وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنكُم مَّلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ

আমরা যদি চাইতাম তবে তোমাদের পরিবর্তে আমি পৃথিবীতে ফিরিশতাদেরকে সৃষ্টি করে পাঠাতাম।

[যুখরুফ ৪৩:৬০]

وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ

এবং নিশ্চিতভাবে তিনি বা এটি {**সে** সর্বনামটি হয় ব্যক্তি ঈসা (আঃ) অথবা ঈসা (আঃ)-এর ঘটনা কে ইঙ্গিত করছে} হলো শেষ সময়কে জানার মাধ্যম। অতএব এটি সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই (এখানে ব্যবহৃত ها সর্বনামটি স্ত্রীলিঙ্গ তাই ইহা শেষ সময়কে নির্দেশ করছে)। আমাকে অনুসরণ করো, ইহাই সরল পথ।

[যুখরুফ ৪৩:৬১]

وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

শয়তান যেন তোমাকে (সত্যকে স্বীকৃতি দেয়া থেকে) বাধা দিতে না পারে; বস্তুত সে (**সে** সর্বনামটি পরিষ্কারভাবে শয়তানকে নির্দেশ করছে) তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

[যুখরুফ ৪৩:৬২]

وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُم بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُم بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ

আর যখন ঈসা (আঃ) সকল সত্য-প্রমাণ নিয়ে আসল এবং সে {**সে** সর্বনামটি পরিষ্কারভাবে ঈসা (আঃ)-কে নির্দেশ করছে} বললো,"আমি অবশ্যই তোমাদের নিকট হিকমত নিয়ে এসেছি এবং যে বিষয়ে (**সে** সর্বনামটি বিষয়টিকে নির্দেশ করছে) তোমরা মতভেদ করো তাকে পরিষ্কার করতে। অতএব তোমরা প্রতিপালক সম্পর্কে সচেতন হও এবং তাঁর প্রতি মনোযোগী হও।

[যুখরুফ ৪৩:৬৩]

إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ

বস্তুত আল্লাহ্ আমার এবং সেই সাথে তোমাদের প্রতিপালক। অতএব তাঁর (**সে** সর্বনামটি আল্লাহ্কে নির্দেশ করছে) ইবাদত করো এবং এটাই সরল পথ।

[যুখরুফ ৪৩:৬৪]

فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ

অতঃপর তোমাদের পর কিছু লোক এসে {ঈসা (আঃ)-এর পর যারা এসেছে তাদেরকে ইঙ্গিত করছে} ভিন্ন মত পোষণ করতে লাগল, অতএব যন্ত্রণাকর সেই দিনে যালিমদের জন্যে রয়েছে চরম দুঃখ (যা তাদের উপর আসবে)।

[যুখরুফ ৪৩:৬৫]

নবী (সাঃ)-এর ভবিষ্যদ্‌বাণী আমাদের জানাচ্ছে যে, ঈসা (আঃ)-এর প্রত্যাবর্তনের সময় সমস্ত পর্দা উঠে যাবে, যা **শেষ সময়ের আলামত** বিষয়টির উপলব্ধি এবং স্বীকৃতি প্রদানকে এখন পর্যন্ত মেঘের আড়ালে ঢেকে রেখেছে এবং তখন এটি সবাই মেনে নেবে যে, **সা'আ** এসে গেছে। নিচের এই বিষয়টি খেয়াল করুন:

> ... ঠিক সেই সময় আল্লাহ্‌ মরিয়ম পুত্র ঈসা (আঃ)-কে প্রেরণ করবেন। দামেশকের পূর্ব দিকে অবস্থিত এক সাদা মিনারে তিনি অবতরণ করবেন। তাঁর পরনে থাকবে দু'টুকরো কাপড়ে তৈরী পোশাক যা হালকা জাফরানি রঙে রঞ্জিত হবে। দু'জন ফেরেশতার ডানায় ভর করে তিনি নামবেন। যখন তিনি মাথা ঝুঁকাবেন তখন তাঁর মাথা থেকে স্বেদবিন্দু ঝরে পড়বে আর যখন তিনি মাথা উঠাবেন তখন তাঁর মাথা থেকে মুক্তার মতো স্বেদবিন্দু ঝরে পড়বে। তাঁর দেহের গন্ধ পাওয়ামাত্র প্রতিটি কাফির মারা যাবে, তার নিশ্বাস যতদূর দৃষ্টি পৌঁছায় ততদূর পৌঁছাবে ...।
>
> [সহীহ মুসলিম]

[বিঃ দ্রঃ ঈসা (আঃ)-এর অলৌকিক প্রত্যাবর্তন জেরুযালেমের পরিবর্তে দামেস্কে হবে - বিষয়টি লেখকের কাছে অবাক এবং আশ্চর্যকর]।

> যার হাতে আমার প্রাণ সেই স্বত্তার শপথ, মরিয়ম পুত্র ন্যায়বিচারক হিসেবে খুব শীঘ্রই তোমাদের মাঝে আসবেন। তিনি ক্রুশ ভেঙ্গে ফেলবেন, শুকরগুলিকে হত্যা করবেন, জিযিয়া রহিত করবেন, সেসময় ধন সম্পদের পরিমাণ এতটাই বেড়ে যাবে যে যাকাত নেওয়ার মতো কেউই থাকবে না, (আল্লাহ্‌র সামনে) একটি সিজদাহ দুনিয়া ও তার মাঝের যা কিছু আছে সবকিছু থেকে উত্তম হবে।
>
> [সহীহ বুখারী]

এটি পরিষ্কার, প্রকৃত মসীহ মরিয়ম-পুত্র ঈসা (আঃ)-এর প্রত্যাবর্তন সম্পূর্ণ ও দৃঢ়ভাবে ইসলামের **সত্যতার দাবী**কে বৈধতা প্রদান করবে। প্রকৃতপক্ষে, যারা এই বিষয়ের সাথে ভিন্ন মত পোষণ করেন তারা কুর'আনের আয়াতের যথাযথ গবেষণা করলে এ ব্যাপারটি চিহ্নিত করতে পারবেন যে, **শেষ সময়ের সকল আলামতগুলি** কোন না কোনভাবে ঈসা (আঃ) এবং তাঁর প্রত্যাবর্তনের সাথে সম্পর্কযুক্ত। অন্য কথায়, এই ঘটনার উপরেই **অর্থপ্রকাশের পদ্ধতি** প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

ঈসা (আঃ)-এর আবির্ভাব এবং সেই সাথে বস্তুজগতের পরিসমাপ্তি উভয় ঘটনাই হঠাৎ ও দ্রুত এসে পড়বে:

وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

সামাওয়াত এবং পৃথিবীর গোপন জ্ঞান কেবল আল্লাহ্‌র নিকটেই রয়েছে। আর শেষ সময়ের ব্যাপারটি এ রকম হবে যে, (মনে হবে) তা চোখের পলকের ন্যায় কিংবা আরো তড়িৎগতিতে ঘটে যাবে। আর আল্লাহ্ তা'আলা সকল বিষয়ের উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান।

[নাহ্‌ল ১৬:৭৭]

কুর'আন জোর দিয়ে ঘোষণা করেছে, ঈসা (আঃ) যখন প্রত্যাবর্তন করবেন প্রত্যেকটি খ্রিস্টান ও ইহুদি (যারা ইসলামের সত্যকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে), এবং এমন সকল ইহুদি ও খ্রিস্টান যারা তাঁর বিরুদ্ধে লড়াই করছে, তারা এরূপ আচরণের জন্যে এক ভয়াবহ মৃত্যুর সম্মুখীন হবে (যেহেতু ঈসা (আঃ) তাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ হিসাবে উপস্থিত হবেন), এবং ধ্বংস হবার পূর্বে (অর্থাৎ ভয়াবহ মৃত্যুমুখে যাবার আগে) তাদেরকে ঈসা (আঃ)-এর প্রতি (অর্থাৎ তাঁকে প্রকৃত মসীহ এবং আল্লাহ্‌র একজন প্রকৃত নবী হিসেবে) ঈমান এনে যেতে হবে।

وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا

আহলে কিতাবদের মধ্যে এমন একটি লোক থাকবে না যারা তাঁর মৃত্যুর পূর্বে তাঁর প্রতি ঈমান না এনে থাকবে এবং বিচার দিবসে তিনি তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবেন।

[আলে ইমরান ৪:১৫৯]

মৃত্যুর পূর্বে প্রত্যেকটি খ্রিস্টান ও ইহুদি তাঁর **প্রতি বা এটির** প্রতি ঈমান আনবে। এই ঘটনাটিকে কুর'আন খুব চমৎকারভাবে বর্ণনা করেছে। আয়াতটি সামনে অগ্রসর হয়ে ঘোষণা করছে, এই ঈমানের ঘোষণা দেওয়া সত্ত্বেও **তিনি বা এটি** তাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ হিসেবে বিচার দিবসে ব্যবহৃত হবে।

আয়াতটির ব্যাপারে অধিকাংশ তাফসীরকারের অভিমত হলো, ঈসা (আঃ)-এর বিরুদ্ধে লড়াইরত প্রত্যেকটি ইহুদি ও খ্রিস্টন তাঁর প্রত্যাবর্তনের সময় তাঁকে বিশ্বাস করতে বাধ্য হবে যেভাবে মুসলিমরা তাঁকে প্রকৃত মসীহ এবং আল্লাহ্‌র একজন প্রকৃত

নবী হিসেবে মান্য করে। আমেরিকার নিউ জার্সিতে ইহুদিদের একটি সিনাগগের মহাসমাবেশে ইহুদিদেরকে উদ্দেশ্য করে এই লেখক কুর'আনে বর্ণিত তাদের এই ভাগ্যকে জানিয়ে দেন, যা তাদের জন্যে অপেক্ষা করছে। এই সংবাদে তারা হতবাক হয়ে যায় এবং লেখকের বক্তৃতা শেষ হবার পর তাঁকে ঘিরে ধরে, এবং তারা কেন এরূপ অন্যায় পরিস্থিতির সম্মুখীন হবে তা ব্যাখ্যা করতে বলে। "আমরা যা প্রত্যাখ্যান করেছি তা মানতে আমাদের কেন বাধ্য করা হবে?" আমাদের প্রতিক্রিয়া হলো, সেদিন তাদের চোখ থেকে পর্দা সরিয়ে নেয়া হবে এবং তারা সরাসরি সত্যকে বুঝতে পারবে যেটাকে তারা জীবনভর প্রত্যাখ্যান করেছিল ও বিরোধিতা করেছিল।

সেই সময় এসে যাবার পর, অর্থাৎ ঈসা (আঃ) ফেরত আসার পর, তাঁকে স্বীকৃতি দেয়া বা তাঁর উপর ঈমান প্রদর্শন করার কোন মূল্য থাকবে না, কেননা তখন এই স্বীকৃতি ইহুদি ও খ্রিস্টানদেরকে এই ভয়াবহ পরিণাম থেকে রক্ষা করতে পারবে না। আমরা মনে করি এই সময়টিই সা'আর (অর্থাৎ শেষ সময়ের) আগমন বার্তা স্বরূপ। তবে আল্লাহ্ই ভাল জানেন। আমরা অবশ্য চূড়ান্তভাবে এটা বলতে পারি যে **তিনি {ঈসা (আঃ)} সা'আর ইল্ম** একথাই কুর'আনের ঘোষণা বলে দিচ্ছে, অর্থাৎ তাঁর আবির্ভাবের মাধ্যমেই **সা'আ** এসে পড়বে।

কুর'আন এরকম একটি নিদর্শনকে প্রকাশ করেছে যেখানে, বেশ কিছু (সবাই নয়) ইহুদি ও খ্রিস্টানদের স্বরূপ চিত্রায়িত হয়েছে। মৃত্যুর সময় তারা উপলব্ধি করবে যে, প্রকৃত ধর্ম ও আল্লাহ্র প্রকৃত বান্দাদের বিরুদ্ধে তারা যুদ্ধ চালাচ্ছে এবং এর ফলস্বরূপ তারা ভয়াবহ পরিণামের মুখোমুখি হতে যাচ্ছে। ঠিক একই পরিণতি ফিরাউনের হয়েছিল যখন সে ডুবে যাচ্ছিল। মৃত্যুর সময় তার চোখ থেকে পর্দা সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং সে সত্যকে মেনে নিয়েছিল। সত্যটা তার নিকট এত পরিষ্কার এবং স্পষ্ট ছিল যে, তা মেনে নেয়া ছাড়া তার আর কোন উপায় ছিল না। সত্যকে গ্রহণ করতে এবং মু'মিন হিসেবে মারা যেতে বড্ড দেরি হয়ে গিয়েছিল। এর পরিবর্তে ফিরাউনকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হয়েছিল।

কিন্তু মহান আল্লাহ্ তার দেহকে এমনভাবে সংরক্ষণ করে রাখেন যেন সেটা (যখন তা আবিস্কৃত হবে) তার পরবর্তী লোকদের জন্য একটা নিদর্শন হিসেবে কাজ করে। এর নিহিতার্থ হলো, যারা ফিরাউনের মতো জীবনযাপন করবে (অর্থাৎ সত্যকে প্রত্যাখ্যান করবে এবং মু'মিনদেরকে নির্যাতন করবে) তারাও ঠিক তার (ফিরাউন) মতো মৃত্যু বরণ করবে। আজকে যেসব খ্রিস্টান ও ইহুদিরা ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাচ্ছে

এবং মুসলিমদেরকে ভীত সন্ত্রস্ত করে রাখছে অথবা এরূপ যুদ্ধ ও সন্ত্রাসকে মদদ দিচ্ছে তারা ঈসা (আঃ)-এর আগমনের সময় ঠিক এভাবেই মারা যাবে।

فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ

আজ (যেহেতু ফিরাউন তুমি মারা যাচ্ছ) আমরা (সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে) তোমার দেহকে রক্ষা করবো যেন (তোমার মরদেহ যখন ইতিহাসের স্রোতে পুনরায় আবির্ভূত হবে) তখন সেটা তোমার পরে আসা লোকদের জন্যে (যারা তোমার মতো জীবনযাপন করে, এবং তোমারই মতো মৃত্যুবরণ করবে) একটা (সতর্কমূলক) নিদর্শন হবে। মনে রেখো অধিকাংশ লোকই আমার নিদর্শন থেকে বিমুখ।

[ইউনুস ১০:৯২]

আজকের বিশ্বের বাস্তবতাকে উপলব্ধি করতে হলে আমাদেরকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে, মহান আল্লাহ্ তাৎপর্যপূর্ণভাবে, ফিরাউনের দেহকে (১৮৯৭ সালে) ঠিক এমন সময় জনসমক্ষে নিয়ে আসেন যখন ইউরোপে যায়োনিস্ট আন্দোলনের গোড়াপত্তন হয়েছিল (অর্থাৎ সেই একই ১৮৯৭ সালে), আর রহস্যময় ইউরোপীয় **ইহুদি ও খ্রিস্টান চক্র** তৈরী হওয়ার সবশেষ যোগসাজশ সম্পন্ন হওয়া তখনও বাকি ছিল। দাজ্জাল কর্তৃক মুসলিমদের হাত থেকে পবিত্রভূমিকে **স্বাধীন** করা এবং সেখানে (ভন্ড) পবিত্র ইসরাঈলি রাষ্ট্র পুনপ্রতিষ্ঠা করাকে যখন সারা পৃথিবী দেখতে যাচ্ছে, ঠিক তখনই ফিরাউনের দেহটি আবির্ভূত হয়। ফিরাউনের দেহ পুনরায় উঠে আসা কেবল ঐশ্বরিক ঘোষণার বাস্তবায়নই নয় বরং সেই সাথে এটা **সা'আ** বা **শেষ সময়ের একটি আলামত**ও বটে।

ওয়া'দ আল-আখিরাহ (শেষ সতর্কবাণী)

কুর'আন একটি ঘটনাকে ***ওয়া'দ আল-আখিরাহ*** (শেষ সতর্কবাণী) হিসেবে আখ্যায়িত করেছে (অর্থাৎ মানবজাতির উপর সা'আ বা শেষ সময় এসে পড়ার পূর্বের 'শেষ সতর্কবাণী')। এই ***ওয়া'দ আল-আখিরাহ*** তখনই আসবে যখন ঐশ্বরিক আদেশবলে ইহুদিদেরকে পবিত্রভূমিতে ফিরিয়ে আনা হবে।

وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا

অতঃপর আমি বনী ইসরাঈলি লোকদেরকে বললাম: "তোমরা (ভবিষ্যতে) পৃথিবীতে (ছড়িয়ে ছিটিয়ে) বসবাস করবে কিন্তু (মনে রেখো) যখন শেষ

ঐশ্বরিক ঘোষণা আসবে আমরা তোমাদেরকে (পবিত্রভূমিতে) ফিরিয়ে আনবো (পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা থেকে)।

[ইসরা ১৭:১০৪]

ঐশ্বরিক আদেশবলে পবিত্রভূমি থেকে বহিষ্কারের প্রায় ২০০০ বছর পর ইয়াজুজ ও মাজুজের চূড়ান্ত প্রচেষ্টা ব্যতীত বনী ইসরাঈলিদের সেখানে ফিরিয়ে আনা সম্ভব ছিল না। সূরা আম্বিয়া থেকে এটা সুস্পষ্ট:

وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ

নিষেধাজ্ঞা জারি রয়েছে একটি শহরের উপর (জেরুযালেম) যাকে আমরা ধ্বংস করে দিয়েছি (এবং এর অধিবাসীরা সেখান থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে), ('এই শহর আমাদের', এই দাবী নিয়ে) তারা (অর্থাৎ সেখানের অধিবাসীরা) আর ফিরে আসতে পারবে না যতক্ষণ না ইয়াজুজ ও মাজুজকে মুক্ত করে দেয়া হচ্ছে এবং তারা সবদিকে ছড়িয়ে না পড়ছে (এভাবেই তারা ইয়াজুজ ও মাজুজীয় বিশ্বব্যবস্থা কায়েম করবে)।

[আম্বিয়া ৯৫-৯৬]

এটা স্পষ্ট থাকতে হবে যে, বিশ্বমঞ্চে ইয়াজুজ ও মাজুজের মুক্তি সহ শেষ সময়ের সকল আলামত সা'আ আসার আগেই সংঘঠিত হবে অর্থাৎ শেষ সময় আসার আগে এবং প্রকৃত মসীহ ঈসা (আঃ)-এর প্রত্যাবর্তনের পূর্বে। কেননা ঈসা (আঃ)-এর প্রত্যাবর্তনের পর সংঘঠিত কোন ঘটনা শেষ সময়ের আলামত হিসেবে বিবেচিত হতে পারে না। তাঁর প্রত্যাবর্তনের মাধ্যমে **সা'আ** যে এসে গেছে তা স্পষ্ট হয়ে যাবে এবং তা সহজেই উপলব্ধি করা যাবে। উপরন্তু, পবিত্রভূমিতে ইহুদিদের প্রত্যাবর্তন, যার ঐশ্বরিক পূর্বাভাস দেয়া হয়েছে এবং যাকে ***ওয়া'দ আল-আখিরাহ*** হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে, ইয়াজুজ মাজুজদের মুক্তি ব্যতীত সংঘঠিত হবে না।

এই বইটিতে পাহাড়সম প্রমাণ ও অকাট্য যুক্তি পেশ করা হয়েছে যে, ইয়াজুজ ও মাজুজকে বিশ্বমঞ্চে মুক্ত করে দেয়া হয়েছে। পাঠক সহীহ বুখারীতে বর্ণিত নবী (সাঃ)-এর ভবিষ্যদ্‌বাণীর দিকে নজর দিতে পারেন:

ليحجن هذا البيت و ليعتمرن بعد يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ

লোকেরা ইয়াজুজ ও মাজুজের মুক্তির পরও কাবাতে হজ্ব এবং উমরাহ পালন করতে থাকবে। ভবিষ্যদ্‌বাণী চলতে থাকে,

لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت

হজ্ব বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত সা'আ আসবে না (অর্থাৎ এক সময় হজ্ব বাতিল হয়ে যাবে অথবা বৈধ হজ্বের অস্তিত্ব থাকবে না)।

[সহীহ বুখারী]

অন্যকথায়, নবী (সাঃ) ঘোষণা করেছেন, যতক্ষণ না হজ্ব বাতিল হচ্ছে অর্থাৎ বৈধ হজ্বের অস্তিত্ব না থাকছে (যেমনটি ছিল আরবের পৌত্তলিক যুগে), ততক্ষণ পর্যন্ত সা'আ আসছে না। কিন্তু এটা খুবই স্পষ্ট যে, সা'আ আসার আরো আগে ইয়াজুজ ও মাজুজ মুক্তি পাবে, কোন ভাবেই এর পরে নয়।

এই কারণে, সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হাদীসটি, যেখানে বলা হয়েছে যে, প্রকৃত মসীহ ঈসা (আঃ)-এর প্রত্যাবর্তনের পর এবং ভন্ড মসীহ দাজ্জালকে হত্যার পরই ইয়াজুজ ও মাজুজকে বিশ্বে ছেড়ে দেয়া হবে, তার বিশুদ্ধতার ব্যাপারে এই বইয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে।

... এরকম একটা অবস্থায় আল্লাহ্ ঈসা (আঃ)-এর কাছে ওহী পাঠাবেন, "আমার বান্দাদের মাঝ থেকে এমন একটা দল সৃষ্টি করেছি যাদের সাথে যুদ্ধ করে কেউ জয়ী হতে পারবে না, তুমি (তোমার সাথিদের) তূর পাহাড়ের উপর নিয়ে যাও"

يبعث اللَّهُ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ

আল্লাহ্ তখন ইয়াজুজ ও মাজুজকে **পাঠাবেন**, তারা প্রতিটি উচ্চভূমি থেকে নেমে আসবে। তাদের প্রথম জন টাইবেরিয়াস হ্রদের (গ্যালিলী সাগর) পাশ দিয়ে যাবার সময় সেখান থেকে পানি পান করবে। তাদের শেষ জন যখন সেই স্থান অতিক্রম করবে, সে বলবে একদা এখানে পানি ছিল ...।

[সহীহ মুসলিম]

"ইয়াজুজ ও মাজুজকে কি বিশ্বে ছেড়ে দেয়া হয়েছে?" নামক অধ্যায়ে আমরা এই বিষয়টির আলোচনায় ফিরে যাবো। আমরা সেখানে বিষয়টি প্রত্যক্ষ করেছি যে, প্রকৃত মসীহ ঈসা (আঃ)-এর প্রত্যাবর্তনের পর ইয়াজুজ ও মাজুজকে এই বিশ্বে ছেড়ে দেয়া হবে এবং তাঁর প্রত্যাবর্তন নির্দেশ করবে যে শেষ সময় এসে গেছে। বাস্তব প্রমাণের সাথে এই ধারণা সাংঘর্ষিক। বাস্তব প্রমাণ হলো, গ্যালিলী সাগরের পানি শুকিয়ে

যাবার খুবই নিকটবর্তী এবং ইয়াজুজ ও মাজুজকে আটকে রাখার জন্যে নির্মিত লোহার প্রাচীরটির অস্তিত্ব কেউ কোথাও খুঁজে পায় নি। ইয়াজুজ ও মাজুজ বন্দি থাকলে প্রাচীরটি তো আজো পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে থাকত। এই বইটি আরো প্রমাণ করে দিচ্ছে, এই ধারণাটি কুর'আন ও হাদীস থেকে প্রাপ্ত ***অর্থপ্রকাশের পদ্ধতির*** সাথে সুস্পষ্টভাবে সাংঘর্ষিক, এবং সেই সাথে তাদের মুক্তির ব্যাপারে নবী (সাঃ)-এর করা অত্যন্ত পরিষ্কার এবং সুস্পষ্ট ঘোষণার সাথে সাংঘর্ষিক।

www.islamfind.wordpress.com

চার - ইয়াজুজ ও মাজুজ পরিচিতি

কুর'আন যেহেতু ঘোষণা করেছে, ঈসা (আঃ) সা'আর ইল্‌ম বা আলাম তাই আমাদের মত হচ্ছে, তাঁর প্রত্যাবর্তন হলো সা'আর শেষ দৃশ্যের পরিসমাপ্তি (গ্রান্ড ফিনালে)। ইয়াজুজ ও মাজুজের জীবনচিত্র বা হালচাল কেবল একে অপরের সাথে সম্পর্ক যুক্তই নয় বরং সেই সাথে প্রকৃত মসীহের প্রত্যাবর্তনের সাথেও সম্পর্কযুক্ত। আমরা যদি আজকের বিশ্বে ইয়াজুজ ও মাজুজের জীবনচিত্র বা হালচালের কোন অংশকে চিহ্নিত করতে পারি, তাহলে সেটা আমাদেরকে অন্যান্য পদচিহ্নগুলি চিহ্নিত করতে সহায়তা করবে। যা পরিশেষে আমাদেরকে শেষ দৃশ্যের দিকে পরিচালিত করবে।

দ্বিতীয়ত, আমরা যদি ইয়াজুজ ও মাজুজের জীবনচিত্র বা হালচালের কোন অংশকে কুর'আনে খুঁজে পাই তাহলে সেই বর্ণনাকে হাদীসে বর্ণিত অন্যান্য পদচিহ্নের উপর প্রাধান্য দিতে হবে।

ইয়াজুজ ও মাজুজ সম্পর্কে আমরা এই বইয়ে কতগুলি প্রশ্নের উত্তর প্রদান করবো:

- ইয়াজুজ ও মাজুজ কারা?
- ইয়াজুজ ও মাজুজকে কি বিশ্বে ছেড়ে দেয়া হয়েছে?
- ইয়াজুজ ও মাজুজকে বিশ্বে ছেড়ে দেয়া হলে তার পরিণতি কি?
- আমরা কি তাদের চিহ্নিত করতে পারি?
- ইয়াজুজ ও মাজুজের অবসান কিভাবে হবে?

এই অধ্যায়ে আমরা প্রথম প্রশ্নটির উত্তর প্রদান করবো।

আগেই আমরা উল্লেখ করেছি, নবী (সাঃ) তাঁর কিছু সাহাবীর সাথে দেখা করলেন যারা বসে ছিল এবং একটা বিষয় নিয়ে আলোচনায় মগ্ন ছিল। তিনি তাদের আলোচনা সম্পর্কে জানতে চাইলেন। তখন তাঁকে বলা হলো আলোচনাটি ছিল **সা'আর আলামত** নিয়ে। আল্লাহ্‌র একজন সত্য নবী হিসেবে তিনি ঘোষণা করলেন:

لا تقوم الساعة حتى ... (লা তাকুমুস সা'আ হাত্তা....)

এর মানে, শেষ সময় আসবে না যতক্ষণ না দশটি আলামত প্রকাশিত হচ্ছে। সেই দশটি আলামতের মধ্যে ইয়াজুজ ও মাজুজ রয়েছে।

নবী (সাঃ)-এর ভবিষ্যদ্‌বাণীর নিহিতার্থ হচ্ছে, **ইয়াজুজ ও মাজুজ, দাজ্জাল, পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়** ইত্যাদি ঘটনাগুলি বিশ্বে প্রথমে প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত **সা'আ** আসবে না। আর এ ঘটনাগুলি অবশ্যই **সা'আ**র আগে সংঘঠিত হবে। ফলস্বরূপ, প্রকাশমান এই ঘটনাগুলিকে সঠিকভাবে পর্যবেক্ষণ, সচেতন পাঠককে **সা'আ**র আসন্নতার ব্যাপারে একটা সময় সীমা উপলব্ধি করতে সহায়তা করে। এ কারণেই ইয়াজুজ ও মাজুজ-সহ কোন আলামতকেই আলাদাভাবে গবেষণা করা চলবে না, বরং সকল আলামতকে একটা সমগ্র হিসেবে বিবেচনা করতে হবে।

কুর'আন যেহেতু ঘোষণা করেছে, ঈসা (আঃ) **সা'আ**র ইল্‌ম তাই আমাদের মত হচ্ছে, তাঁর প্রত্যাবর্তন হলো **সা'আ**র শেষ দৃশ্যের পরিসমাপ্তি (গ্র্যান্ড ফিনালে)।

ইয়াজুজ ও মাজুজের জীবনচিত্র বা হালচাল কেবল একে অপরের সাথে সম্পর্কযুক্তই নয় বরং সেই সাথে প্রকৃত মসীহের প্রত্যাবর্তনের সাথেও সম্পর্কযুক্ত। আমরা যদি আজকের বিশ্বে ইয়াজুজ ও মাজুজের জীবনচিত্র বা হালচালের কোন অংশকে চিহ্নিত করতে পারি (অর্থাৎ একে একটি পদচিহ্ন হিসেবে উল্লেখ করতে পারি), তাহলে সেটা আমাদেরকে অন্যান্য পদচিহ্নগুলি চিহ্নিত করতে সহায়তা করবে। যা পরিশেষে আমাদেরকে শেষ দৃশ্যের দিকে পরিচালিত করবে।

দ্বিতীয়ত, আমরা যদি ইয়াজুজ ও মাজুজের জীবনচিত্র বা হালচালের কোন অংশকে কুর'আনে খুঁজে পাই তাহলে এই বর্ণনাকে হাদীসে বর্ণিত অন্যান্য পদচিহ্ন থেকে প্রাধান্য দিতে হবে।

ইয়াজুজ ও মাজুজ বিষয়টি এমনিতেই জটিল, এর ভুল ব্যাখ্যা মুসলিমদেরকে বিষয়টি উপলব্ধি করতে সমস্যায় ফেলতে পারে। জটিল এই বিষয়টিকে কুর'আন এবং হাদীসের যেসব স্থানে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, সেই আয়াতগুলিকে ব্যাখ্যা করতে হবে। এই আয়াতগুলির ভুল ব্যাখ্যার সম্ভাবনা রয়েছে। অতীতে এর ভুল ব্যাখ্যাই হয়েছে। 'মুতাশাবিহাত' আয়াতের বেলায় কুর'আন তাৎপর্যপূর্ণভাবে এই অপব্যাখ্যার দিকে ইঙ্গিত করেছে:

فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ

যাদের অন্তর সত্য থেকে বিচ্যুত হয়েছে তারা কিতাবের তাশাব্বুহ (রূপক) অংশের (অপ)ব্যাখ্যার দিকে ধাবিত হয়, যা তাদের সংশয় এবং ফিতনারই বহিঃপ্রকাশ।

[আলে ইমরান ৩:০৭]

আমাদের কর্মপন্থা হচ্ছে, আমরা প্রথমে কুর'আন থেকে (বিশেষ করে সূরা কাহাফ থেকে) ইয়াজুজ মাজুজের জীবনচিত্র বা জীবনআলেখ্য বের করবো। তারপরে, হাদীস থেকে তাদের জীবনচিত্র বা জীবনআলেখ্য বের করবো, যেন বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায়।

কুর'আনই ইয়াজুজ ও মাজুজের বিষয়টির অবতারণা করেছে

আসুন আমরা সূরা কাহাফের গুরুত্বপূর্ণ অনুচ্ছেদ (৮৩-১০১) নিয়ে গবেষণা করি, যেখানে ইয়াজুজ ও মাজুজের বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে।

কাহাফ ১৮:৮৩

وَيَسْأَلُونَكَ عَن ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا

তারা আপনাকে (হে মুহাম্মাদ!) যুলক্বার্নাইন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলুন, "আমি তোমাদের কাছে তাঁর কিছু কিছু অবস্থা বর্ণনা করব।"

তাফসীরঃ

আভিধানিকভাবে ذوالقرنين **যুলক্বার্নাইন** বলতে দুই 'শিংয়ের' অধিকারীকে বুঝায়। আরবি قَرْن **ক্বারন** বলতে **শিং** বুঝায়, তবে এর আরেক অর্থ হচ্ছে, **কাল** বা **যুগ**। কিন্তু কুর'আনে যতবার قَرْن **ক্বারন** শব্দটি এসেছে এটি শেষোক্ত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এর মানে হলো, সূরা কাহাফ এমন একটা বর্ণনা পেশ করছে যা **দু'টি যুগকে** প্রভাবিত করে। আমাদের মতামত হলো, এই দু'টি যুগের একটি যুগ ছিল অতীতে এবং আরেকটি যুগ হবে শেষ যুগ। যুগ দু'টি এতই ভিন্ন হবে যে তারা এক অপরের সম্পূর্ণ উল্টো হবে।

ইয়াসরিবের (বর্তমানে যার নাম মদিনা) ইহুদি র‍্যাবাইরা নবী (সাঃ)-কে সেই বিখ্যাত ভ্রমণকারী সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিল, যে পৃথিবীর দুই প্রান্ত ভ্রমণ করেছিল। তাদের ধারণা ছিল যে, যদি তিনি এই (সেই সাথে আরও দু'টি) প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন তবে এটি চূড়ান্তভাবে প্রমাণ করবে যে, তিনি আসলেই আল্লাহ্‌র সত্য নবী। কুর'আন এখানে সেই প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেছে।

কাহাফ ১৮:৮৪

إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا

আমি তাঁকে পৃথিবীতে (রাষ্ট্রিয় ক্ষমতা দিয়ে) প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম এবং তাঁকে ক্ষমতা দান করেছিলাম যেন তিনি যেখানে ইচ্ছা ভ্রমণ করতে পারেন ....।

তাফসীরঃ

যুলক্বার্নাইন ঈমানদার ছিলেন, তাঁর বিশ্ব-ব্যবস্থার (প্যাক্স ক্বার্ণাইন *Pax Qarnain*) রাজনৈতিক এবং সামরিক ক্ষমতা ছিল ঐশ্বরিক মদদপুষ্ট। এই বিশ্ব-ব্যবস্থার ভিত্তি ছিল ঈমানের উপর প্রতিষ্ঠিত। রাজনীতি এবং নৈতিকতার মাঝে কোন্ ধরনের সম্পর্ক বিদ্যমান থাকা উচিত? ঐশ্বরিক মদদপুষ্ট বিশ্ব-ব্যবস্থা যখন ঈমানের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে, তখন এটি কোন্ ধরনের বিশ্ব-ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করে এবং টিকিয়ে রাখে? সূরা কাহাফ আমাদেরকে সেই শিক্ষা দিচ্ছে এবং আমাদেরকে সহায়তা করছে **দ্বিতীয় ক্বার্ন**টিকে (দুই যুগের দ্বিতীয়টি) চিহ্নিত করতে, যা উপরে বর্ণিত বিশ্ব-ব্যবস্থার একেবারে উল্টো হবে। আমাদের মতে এই দুই যুগের দ্বিতীয়টি হলো, আজকের বিশ্ব-ব্যবস্থা, যাকে তৈরী করেছে আধুনিক ইউরোপীয় ইহুদি এবং খ্রিস্টান সভ্যতা।

কাহাফ ১৮:৮৫

فَأَتْبَعَ سَبَبًا

(এখানে তিনি কিভাবে তাঁর ক্ষমতাকে ব্যবহার করতেন তার একটা উদাহরণ রয়েছে) তিনি একটা পথ ধরলেন (পশ্চিম দিকে রওনা হওয়ার মাধ্যমে এবং সঠিক সমাপ্তির জন্য সঠিক পন্থা অবলম্বনের মাধ্যমে)।

কাহাফ ১৮:৮৬

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا

তিনি ভ্রমণ করলেন যতক্ষণ না তিনি সূর্যের অস্তাচলে পৌঁছলেন (যেহেতু সেখানে এরপর কোন ভূমি ছিল না তাই মনে হচ্ছিল এটিই পৃথিবীর শেষ প্রান্ত)। তখন তিনি সূর্যকে ঘোলা জলাশয়ে অস্ত যেতে দেখলেন এবং সেখানে তিনি এক সম্প্রদায়কে পেলেন। আমি বললাম, "হে যুলক্বার্নাইন! (তোমার অধিকার

রয়েছে) চাইলে তুমি এদেরকে শাস্তি দিতে পারো অথবা তাদের প্রতি দয়াময় হতে পারা।

তাফসীরঃ

নৈতিকতা এবং আধ্যাত্মিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক সভ্যতাকে তৈরী করা ও টিকিয়ে রাখার জন্যে রাষ্ট্রিয় ক্ষমতা ব্যবহৃত হতে পারে। সেই ব্যবস্থার ভিত্তি ঈমানের উপর হতে হবে। মূল্যবোধকে সহায়তা এবং উৎসাহিত করতে তা ব্যবহৃত হতে পারে। কিন্তু ঈমান না থাকলে ক্ষমতা অন্যায় ও নিপীড়নের কাজেও ব্যবহৃত হতে পারে। এই ঘটনাটির উদ্দেশ্য হলো, ক্ষমতা যখন ঈমানের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে তখন সেটা কিভাবে ব্যবহৃত হয় তা পরিষ্কারভাবে দেখিয়ে দেয়া!

বিভিন্ন সময়ের অনেক পন্ডিতেরা এই আয়াতে বর্ণিত ঘন কালো সাগরকে কৃষ্ণসাগর হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

কাহাফ ১৮:৮৭

قَالَ أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُّكْرًا

তিনি (উত্তরে) বললেন, "(আমরা আমাদের ক্ষমতাকে ব্যবহার করবো) সেই সকল ব্যক্তিকে শাস্তি দেবার জন্যে, যারা সীমালঙ্গন, নিপীড়ন ও অন্যায় জাতীয় অপরাধে দোষী হবে। এরপর সেই ব্যক্তি যখন তার পালনকর্তার কাছে ফিরে যাবে, তখন তিনি তাকে কঠোর শাস্তি দিবেন।"

তাফসীরঃ

ক্ষমতা যখন ঈমানের উপর নির্ভর করে তখন সেটা অত্যাচারীকে ন্যায়সংগতভাবে শাস্তি দিতে ব্যবহৃত হয়। অপরাধ ও দুর্নীতিপরায়ণ রাষ্ট্রে কখনও শান্তি ও সুখ থাকে না। ন্যায়কে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে যুলক্বার্নাইনের বিশ্ব-ব্যবস্থা পৃথিবীতে সর্বোচ্চ সুখ ও শান্তি স্থাপন করেছিল। আজকের বিশ্বেও তা হতে পারতো যদি মানবজাতি নবী (সাঃ)-কে মেনে নিত এবং তাঁকে মেনে চলত।

সূরা কাহাফে বর্ণিত **দুই যুগের** (ক্বার্ণাইন) দ্বিতীয়টিকে শেষ যুগ বা ফিতনার যুগ হিসেবে চিহ্নিত করাটা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়েছে।

দ্বিতীয় যুগটিতে মানবজাতি নবী (সাঃ)-কে প্রত্যাখ্যান করবে এবং তাঁর দেখানো পথে জীবনযাপন করবে না, এর ফলে তারা ঠিক যুলক্বার্নাইনের যুগের বিপরীত যুগের মুখোমুখি হবে, যেখানে ক্ষমতা ঈশ্বরহীনতার (বা ধর্মনিরপেক্ষতার) উপর প্রতিষ্ঠিত হবে, যেখানে অত্যাচারীকে শাস্তি প্রদানের পরিবর্তে এটি অন্যায়ভাবে নিরপরাধকে নির্যাতন করার কাজে ব্যবহৃত হবে। এরকম যুলুমের বিশ্ব-ব্যবস্থা থেকে শান্তি ও সুখ উধাও হয়ে যাওয়াটাই স্বাভাবিক।

কাহাফ ১৮:৮৮

وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَىٰ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا

এবং যে ঈমান আনে ও ভালকাজ করে তার বিনিময় হচ্ছে কল্যাণ (পরবর্তী জীবনে) এবং আমরা আমাদের ক্ষমতাকে ব্যবহার করে এটি নিশ্চিত করব যেন তার পার্থিব জীবন সহজ হয়ে যায়।

তাফসীরঃ

যখন রাষ্ট্রিয় ক্ষমতা ঈমানের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে, তখন যারা ঈমানের সাথে বসবাস করে এবং যাদের আচার আচরণ ভাল তাদেরকে সহায়তা এবং পুরস্কৃত করা হয়। এটিই সবচেয়ে ভাল বিশ্ব-ব্যবস্থা আর এতেই সর্বোচ্চ সুখ এবং শান্তি নিশ্চিত থাকে।

দ্বিতীয়ত, তিনি অন্যায়কারীকে এবং সীমালঙ্গনকারীকে শাস্তি দিতে তাঁর ক্ষমতা ব্যবহার করতেন, কিন্তু যারা ঈমানের সাথে বসবাস করতো এবং যাদের আচার আচরণ ভাল তাদেরকে সহায়তা এবং পুরস্কৃত করতেন। এটাই যুলক্বার্নাইনের বিশ্ব-ব্যবস্থা যা উপরে বর্ণিত হয়েছে। এভাবেই তিনি স্বর্গীয় জগত ও ন্যায় ব্যাবহারের মাঝে যে সামঞ্জস্যময় সম্পর্ক রয়েছে তা পরিষ্কারভাবে তুলে ধরেছেন।

সূরা কাহাফ একটি মূল্যবান সতর্কবাণী পেশ করেছে। যে দ্বিতীয় বিশ্ব-ব্যবস্থা সামনে আসবে তার ভিত্তি হবে ঈশ্বরহীনতা আর তা হবে নৈতিকতা এবং আধ্যাত্মিক শক্তি শূন্য। সুযোগ সন্ধান, সুবিধাবাদ, অত্যাচার, ঈশ্বরের প্রতি ঈমানকে অবজ্ঞা, ভাল আচার আচরণকে উপহাস, ইত্যাদি হবে এই বিশ্ব-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য। যারা নিষ্ঠার সাথে ধর্মীয় জীবন যাপন করে এই বিশ্ব-ব্যবস্থায় তাদেরকে টার্গেট করা এবং নির্যাতিত করা হবে। প্রকৃতপক্ষে এই ব্যবস্থা ইসলাম এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবে।

ফলস্বরূপ, এরূপ বিশ্ব-ব্যবস্থা যা উপরে বর্ণিত হয়েছে তার সাথে স্বর্গীয় জগতের যে অসামঞ্জস্য তা প্রকাশ পাবে। আর এটাই সেই বিশ্ব-ব্যবস্থা যার মাঝে আমরা বর্তমানে বসবাস করছি।

কাহাফ ১৮:৮৯

ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا

এরপর (আবার) তিনি সঠিক পন্থার মাধ্যমে উপায় অবলম্বন করলেন...।

তাফসীরঃ

তিনি কিভাবে তাঁর ক্ষমতাকে ব্যবহার করতেন এখানে তার আরেকটি উদাহরণ রয়েছে। আবার তিনি পূর্ব দিকে রওনা হলেন এবং সঠিক সমাপ্তির জন্য সঠিক পন্থা অবলম্বন করলেন।

কাহাফ ১৮:৯০

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَّمْ نَجْعَل لَّهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا

যতক্ষণ না তিনি (চূড়ান্তভাবে) সূর্যের উদয়াচলে পৌঁছলেন (অর্থাৎ তিনি পূবের একেবারে দূর-প্রান্তে চলে গেলেন; যেহেতু এরপর কোন ভূমি ছিল না তাই মনে হচ্ছিল এটিই পৃথিবীর শেষ প্রান্ত এবং এখান থেকেই সূর্য উদিত হয়)। তখন তিনি একে এমন এক সম্প্রদায়ের উপর উদিত হতে দেখলেন, যাদের জন্যে (সূর্য কিরণ, আবহাওয়া, পরিবেশ ইত্যাদি থেকে আত্মরক্ষার জন্যে) আমরা প্রাকৃতিক আড়াল ছাড়া কিছুই তৈরী করিনি।

তাফসীরঃ

এর মানে তিনি পূর্বদিকে ভ্রমণের সময় আরেকটি বড় সমুদ্রের মুখোমুখি হলেন যেমনটি তিনি পশ্চিমে হয়েছিলেন। আর এটি সেই সমুদ্র থেকে অনেক দূরে যেখান থেকে তিনি সূর্যকে উদিত হতে দেখেছেন। পশ্চিমের সেই সমুদ্রটি যদি কৃষ্ণসাগর হয় তবে পূর্বেরটি হবে কাস্পিয়ান সাগর।

সূরা কাহাফ আমাদের ক্ষমতার দ্বিতীয় ব্যবহার সম্পর্কে শিক্ষা প্রদান করছে। যেমন, বিশাল পরিমাণ তেল সম্পদ আহরণের পথে যদি আদিম জনগোষ্ঠি বাধা হয়ে দাড়াতো, তাহলে যুলক্বার্নাইন কিভাবে তাঁর ক্ষমতাকে ব্যবহার করতেন?

যেহেতু তাদের দেশে (কাস্পিয়ান অঞ্চলে) বিপুল পরিমাণ তেল সম্পদ মজুদ রয়েছে, তিনি কোন্‌টিকে প্রাধান্য দিতেন, তেলের বস্তুগত মূল্যকে নাকি মানবাধিকারকে, যদিও তারা গরিব আদিম জনগোষ্ঠি ছিল? তিনি কি কাস্পিয়ানের তেল সম্পদ দখলের জন্যে যুদ্ধ লাগিয়েছিলেন, ব্যাপক ধ্বংসলীলা চালিয়েছিলেন, নাকি তিনি মানবাধিকারকে তেলের লোভের উপর প্রাধান্য দিয়েছিলেন?

এই আয়াত আরো দেখিয়ে দিচ্ছে, এই সমস্ত অঞ্চলে বসবাসরত জনগোষ্ঠির জন্য প্রকৃতি যা দিয়েছে তা ব্যতীত অন্যান্য জিনিস (যেমন বায়ুদূষণ, পরমাণু বর্জ্য ইত্যাদি) থেকেও সুরক্ষার প্রয়োজন ছিল।

কাহাফ ১৮:৯১

كَذَٰلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا

এভাবেই (তিনি তাদের সাথে দেখা করলেন আর বুদ্ধিমত্তা ও দয়ার সাথে তিনি তাদেরকে ছেড়ে দিলেন এবং তাদের স্বাভাবিক জীবনে তিনি কোন বিঘ্নতা সৃষ্টি করলেন না); এবং আমরা (মহান আল্লাহ্ তা'আলা) আমাদের জ্ঞানের মাধ্যমে তাঁর অবস্থা (ও তাঁর প্রতিক্রিয়া) সম্পর্কে জ্ঞাত রয়েছি।

তাফসীরঃ

ক্ষমতার ভিত্তি যখন ঈমানের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে তখন সেখানে ন্যায়নীতি, প্রজ্ঞা, সহমর্মিতা এবং সজীব বিবেককে লালন করা হয়। যারা স্বেচ্ছায় আদিম অথবা যাযাবর জীবনযাপন করে (যেমনটি ছিল ইউরোপীয় সভ্যতা আসার আগে উত্তর আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া ইত্যাদি দেশের অধিবাসীরা করতো), তাদের জীবনযাত্রাকে এই রাষ্ট্র ব্যবস্থা আধুনিকায়ন, শিল্পায়ন, সম্পদ আহরণ ইত্যাদির নামে বিঘ্নিত করার চেষ্টা করে না এবং তাকে চালিয়ে নিতেও বাধা প্রদান করে না।

দুই ক্বার্‌নের (দুই যুগ) দ্বিতীয় ক্বার্‌ন (দ্বিতীয় যুগ) সম্পর্কে সূরা কাহাফ একটি কঠোর সতর্কবাণী পেশ করেছে। সে সময় যারা ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করবে তারা হবে বাস্তবিক পক্ষে ঈশ্বরবিমুখ। তারা এমন ভাবে কাজ করবে যা হবে যুলক্বার্নাইনের সম্পূর্ণ উল্টো।

তারা নিজেদের স্বার্থ ব্যতীত (এটি যখন তাদের সুবিধার সাথে খাপ খাবে) ন্যায়নীতি, প্রজ্ঞা, সহমর্মিতা এবং সজীব বিবেককে লালন করবে না। তারা নিষ্ঠুরভাবে

অন্যান্য জাতির সম্পদকে গ্রাস করবে যদিও এর চেয়ে মূল্যবান সম্পদ তাদের অধিকারে রয়েছে। তারা তাদের জীবনযাত্রাকে অন্যের উপর চাপিয়ে দিবে। তারা নির্দয়ভাবে আদিম জনগোষ্ঠিকে এবং তাদের জীবনযাত্রাকে আক্রমণ করবে।

তারা মানবাধিকারের নামে ঈশ্বরবিমুখ আধুনিকতা, বিশ্বায়ন, অর্থনৈতিক প্রয়োজন ইত্যাদিকে চাপাতে থাকবে। উপরন্তু, স্বেচ্ছায় যারা যাযাবর অর্থনৈতিক জীবনযাপন করে, তাদেরকে আক্রমণ এবং ধ্বংস করবে, এবং অবর্ণনীয় নির্যাতনের শিকারে পরিণত করবে। উত্তর আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা এবং বাকি পৃথিবীর বেশিরভাগ স্থানে সহজ সরল জনগোষ্ঠী এই নির্মম ভাগ্যকে বরণ করেছে। কাস্পিয়ান অববাহিকার তেল সমৃদ্ধ অঞ্চল সেই একই ভাগ্যের জন্যে এখন অপেক্ষা করছে।

যুলক্বার্নাইন সম্ভবত জানতেন যে, القرنان **দুই ক্বার্নে**র দ্বিতীয়টি হবে এমন একটা যুগ যখন এই পূর্বাঞ্চলকে নিয়ে বড় ধরনের একটা ঘটনা সংঘঠিত হবে। সে সমস্ত ঘটনা রহস্যময়ভাবে 'শেষ সময়ের আলামতে'র সাথে সম্পৃক্ত। এজন্য তিনি এই এলাকাতে কোন বিঘ্নতা সৃষ্টি করেন নি। সেকারণে এটা খুবই সম্ভব যে, কাস্পিয়ানের তেল নিয়ে একটা বড় ধরনের যুদ্ধ সংঘঠিত হতে পারে। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

কাহাফ ১৮:৯২

ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا

(চূড়ান্তভাবে তিনি কিভাবে তাঁর ক্ষমতাকে ব্যবহার করতেন তার একটা উদাহরণ এখানে রয়েছে; এবং তৃতীয়বারের মতো তিনি আরেকটি পথ ধরলেন) তিনি (সঠিক পন্থার মাধ্যমে) উপায় অবলম্বন করলেন।

কাহাফ ১৮:৯৩

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِن دُونِهِمَا قَوْمًا لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا

তিনি (ভ্রমণ করতে থাকলেন) যতক্ষণ না তিনি দুই পর্বত প্রাচীরের মাঝে পৌঁছালেন। তিনি সেখানে এমন এক জাতিকে পেলেন যারা তাঁর কথা (অর্থাৎ তাঁর ভাষা) খুব কমই বুঝতে পারছিল।

তাফসীরঃ

এর মানে এরা এমন একটা জনগোষ্ঠী যারা বিশ্বের শাসক যে ভাষায় কথা বলত সেই ভাষা বুঝতো না। হয় তাদের একটি অনন্য ভাষা ছিল, বিশ্বে প্রচলিত অন্য ভাষার সাথে যার মিল ছিল না, আর না হয় তারা সমগ্র পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় বসবাস করতো।

কাহাফ ১৮:৯৪

قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا

(যখন তারা একে অপরের সাথে যোগাযোগ করতে সক্ষম হলো) তখন তারা বললো, 'হে যুলক্বার্নাইন! ইয়াজুজ ও মাজুজ (আমাদের বসবাসের) এই স্থানে ফ্যাসাদ (এবং ধ্বংস) চালাচ্ছে। আমরা কি আপনাকে কর দেবো এই শর্তে যে, আপনি (আমাদেরকে তাদের হাত থেকে রক্ষার জন্যে) আমাদের ও তাদের মাঝে একটা প্রাচীর (সাদ্দান) নির্মাণ করে দিবেন?'

তাফসীরঃ

কারা এই ইয়াজুজ ও মাজুজ? তারা কি আদম (আঃ) থেকে আগত দু'টি বংশ? তারা যেই হোক, যুলক্বার্নাইনের মতো ইয়াজুজ ও মাজুজও অসাধারণ ক্ষমতার অধিকারী ছিল। যারা ইয়াজুজ ও মাজুজের আক্রমণের শিকার ছিল তারা যুলক্বার্নাইনকে একটি প্রাচীর নির্মাণ করে দিতে অনুরোধ করে। এই ঘটনা থেকে এটি পরিষ্কার যে, ইয়াজুজ ও মাজুজরা এক বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী। তারা যে বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী তা ইমাম মুসলিমের সংকলিত সহীহতে বর্ণিত একটি হাদীসে কুদসী দ্বারা আরো দৃঢ় হয়:

إني قد أخرجتُ عبادا لي لا يدان لأحد بقتالِهم

আমি আমার এক সৃষ্টিকে এতটা ক্ষমতাবান করেছি যে, আমি ছাড়া তাদের বিরুদ্ধে কেউ যুদ্ধ করতে পারবে না।

[সহীহ মুসলিম]

সূরা কাহাফ কিন্তু সেই সাথে একটি বিশেষ তথ্য দিচ্ছে, ইয়াজুজ ও মাজুজ তাদের ক্ষমতাকে যুলক্বার্নাইনের ঠিক উল্টো পথে ব্যবহার করতো। তারা জমিনে ফ্যাসাদ

সৃষ্টি করতো (ফাসাদ ফিল-আরদ্ব), অর্থাৎ যা কিছুকে টার্গেট করতো তাকেই তারা তাদের ধ্বংসাত্মক ক্ষমতা দ্বারা বিনষ্ট করে ছাড়তো। নির্বিচার হত্যা, পরিকল্পিত হত্যা, ভীতি প্রদর্শন, সন্ত্রাসী কার্যকালাপ, নির্যাতন ইত্যাদি সবই 'ফাসাদ ফিল-আরদ্ব' হিসেবে বিবেচিত। যারা ফাসাদ ফিল-আরদ্বের অপরাধে অপরাধী হবে তাদেরকে আল্লাহ্‌র আইন অনুযায়ী শাস্তি দিতে হবে।

أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ

হয় তাদেরকে হত্যা করতে হবে, ক্রুশবিদ্ধ করতে হবে, বিপরীত দিক থেকে হাত পা কেটে দিতে হবে অথবা সমাজ থেকে বহিষ্কার করতে হবে।

[মায়িদাহ ৫:৩৬]

এই শাস্তি ফ্যাসাদের মাত্রা অনুসারে প্রদান করা হবে। কুর'আনে বর্ণিত ঐশ্বরিক শাস্তির মধ্যে সবচেয়ে কঠিন শাস্তি এটাই।

উপরের আলোচনার আসল তাৎপর্য হলো, ইয়াজুজ ও মাজুজকে যখন বিশ্বে ছেড়ে দেওয়া হবে, মানবজাতি তখন এমন একটা বিশ্ব-ব্যবস্থার মুখোমুখি হবে যা যুলক্বার্নাইনের বিশ্ব-ব্যবস্থার (প্যাক্স ক্বার্নাইনের) সম্পূর্ণ বিপরীত। দুই ক্বার্নের (দুই যুগ) দ্বিতীয় ক্বার্নটি (দ্বিতীয় যুগ) এমন হবে যে, ইয়াজুজ ও মাজুজরা মানবজাতির উপর বিশ্বব্যাপী ফ্যাসাদ চাপিয়ে দিবে। সূরা কাহাফের এই আয়াতটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কেননা সূরাটি আধুনিক যুগকে ব্যাখ্যা করছে।

কাহাফ ১৮:৯৫

قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا

উত্তরে তিনি বললেন, "আমার প্রতিপালক আমাকে যাকিছু দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তা (তোমরা আমাকে যে কর দিতে চাইছ তা থেকেও) উত্তম, তবে তোমরা আমাকে (তোমাদের) লোকবল দ্বারা সাহায্য করো (এবং) আমি তোমাদের ও তাদের মাঝে একটি প্রাচীর নির্মাণ করে দিবো।"

তাফসীর:

যুলক্বার্নাইন একটি অবকাঠামো নির্মাণে রাজি হলেন, যাকে **রাদ্‌মান** হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এরপর তিনি কি প্রকৃতির প্রাচীর নির্মাণ করতে যাচ্ছেন তার

একটা বর্ণনা প্রদান করলেন। "পূর্ণ করা" কাজটি খুব সুন্দরভাবে বাঁধ নির্মাণকে বুঝাচ্ছে যা দু'টি পাহাড়ের মাঝে সংকীর্ণ পথ বা গিরিপথকে ভরাট করে দিবে।

তাঁকে এজন্যে অবশ্যই লোহার উপর লোহা স্থাপন করতে হবে যতক্ষণ না তা পাহাড়ের চূড়াতে পৌঁছে যাচ্ছে এবং সেই সাথে চওড়া ও উঁচু ফাঁকা স্থানকে ভরাট না করে দিচ্ছে। এই প্রাচীরটি ইয়াজুজ ও মাজুজকে আটকে রাখবে যেন লোকেরা তাদের অনিষ্ট থেকে বাঁচতে পারে। যুলক্বার্নাইন আরো নিশ্চিত করলেন যে, তারা (ইয়াজুজ ও মাজুজ) অনন্য ক্ষমতার অধিকারী, অতএব তিনি তাদেরকে কেবল আটকে রাখতে পারেন, কিন্তু তাদেরকে ধ্বংস করতে অক্ষম।

কাহাফ ১৮:৯৬

آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ حَتَّىٰ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انفُخُوا حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا

"আমাকে লোহার খন্ড এনে দাও!" এরপর তিনি (লোহাকে স্তুপাকার করে) দুই পাহাড়ের মধ্যাকার ফাঁকা স্থানকে ভরাট করে দিলেন, তিনি বললেন, "(তোমরা আগুন জ্বালাও এবং) তোমরা এর নিচে ফুঁ দিতে থাকো!" যখন এক (তপ্ত) আগুন তৈরী হয়ে গেল, তখন তিনি আদেশ করলেন, "(তামাকে আগুনে গলাও এবং তারপর) গলিত তামাকে আমার কাছে নিয়ে আস যেনো আমি তা (লোহার উপর) ঢালতে পারি।"

তাফসীরঃ

সর্বোচ্চ শক্তিশালী ধাতু দ্বারা তৈরী প্রাচীরই ইয়াজুজ ও মাজুজকে আটকে রাখতে পারে। সূরা হাদীদে কুর'আন নিশ্চিত করেছে, লোহা এমনই একটা ধাতু যার ভেতরে এরূপ ক্ষমতা রয়েছে। যুলক্বার্নাইন লোহার প্রাচীর নির্মাণ করার পর তার উপর তামার প্রলেপ দিলেন সম্ভবত তাতে যেন মরিচা না পড়ে।

এর মানে হলো, দ্বিতীয় ক্বার্নে যখন ইয়াজুজ ও মাজুজকে এই পৃথিবীতে ছেড়ে দেওয়া হবে তখন তারা তাদের ফিতনাকে পুনরায় প্রতিষ্ঠা করবে যা মানবজাতিকে ভীতসন্ত্রস্ত করে রাখবে। সে সময় মু'মিনদেরকে এক শক্তিশালি প্রাচীরের আশ্রয় নিতে হবে যেন তারা নিজেকে ইয়াজুজ ও মাজুজের কবল থেকে রক্ষা করতে পারে। এর সম্ভবত মানে হলো, মু'মিনদেরকে লোহা ও তামার মতো দু'টি জিনিস দ্বারা অদৃশ্য প্রাচীর

নির্মাণ করতে হবে। সেখানে **কুর'আনের আয়াতসমূহ** হবে লোহার খন্ড এবং **সুন্নাহ** হবে গলিত তামা যা সেই লৌহখন্ডের উপরে প্রবাহিত হবে আর এভাবেই নির্মিত হবে দুর্ভেদ্য বা অজেয় এক প্রাচীর। আমাদের পরামর্শ হলো, সীমান্তবর্তী বিচ্ছিন্ন মুসলিম গ্রামে এরূপ অদৃশ্য প্রাচীর নির্মাণ করতে হবে। আয়াতে বর্ণিত পাহাড়ের দুই কিনারা কাস্পিয়ান অঞ্চলে অবস্থিত সংকীর্ণ গিরিপথের যথাযথ ভৌগোলিক বর্ণনা। এই পাহাড়সমূহ কৃষ্ণসাগর ও কাস্পিয়ান সাগরের মাঝে অবস্থিত।

কাহাফ ১৮:৯৭

فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا

আর এভাবেই (প্রাচীরটি নির্মিত হলে ইয়াজুজ ও মাজুজরা) না পারবে তা আরোহণ করতে আর না পারবে তা ধ্বসিয়ে ফেলতে (যথা খননের মাধ্যমে, আর এভাবেই মানবজাতি তাদের আক্রমণ থেকে বেঁচে থাকবে)।

তাফসীরঃ

যুলক্বার্নাইনের প্রাচীর যতদিন টিকে থাকবে মানবজাতি ততদিন ইয়াজুজ ও মাজুজের অনাচার থেকে নিরাপদে থাকবে। **যুলক্বার্নাইন** নামটি যে দু'টি যুগের প্রতিনিধিত্ব করে এটা আমাদের কাছে এখন পরিষ্কার। প্রথম যুগটি ইয়াজুজ ও মাজুজের অনাচার থেকে নিরাপদে ছিল। প্রাচীরটি যতদিন টিকে ছিল এই অবস্থা ততদিন বিরাজ করছিল।

দ্বিতীয় যুগটি হবে ফিতনা আর ফ্যাসাদে ভরপুর তাতে সমগ্র মানবজাতি আক্রান্ত হবে কেননা তখন মহান আল্লাহ্ এই প্রাচীরটি ধ্বংস বা বিধ্বস্ত করে দিবেন বা সমান করে দিবেন এবং ইয়াজুজ ও মাজুজকে মানবজাতির উপর মুক্ত করে দিবেন বা ছেড়ে দিবেন।

আর এই **দ্বিতীয় ক্বার্নটিতে** (যুগ) **শেষ সময়ের আলামত**গুলি একের পর এক প্রকাশিত হতে থাকবে। ইয়াজুজ ও মাজুজের ফ্যাসাদ (বিশ্বব্যাপী ধ্বংসলীলা এবং অনাচার) থেকে নিরাপদে থাকার জন্যে মু'মিনদেরকে কুর'আন ও সুন্নাহর অদৃশ্য প্রাচীরে আশ্রয় নিতে হবে।

কাহাফ ১৮:৯৮

قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا

(যুলক্বার্নাইন) বললো: "(প্রাচীর নির্মাণে সফলতা) আমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে রহমত! যখন আমার প্রতিপালকের নির্ধারিত দিন (অর্থাৎ শেষ যুগ) আসবে তিনি এই প্রাচীরটি ধ্বংস/বিধ্বস্ত/সমান করে দিবেন (অর্থাৎ এর স্বাভাবিক পরিণতি হলো তিনি এটাকে ধ্বংস করে দিবেন) আর আমার প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি (সতর্কবাণী) অবশ্যই আসবে।"

তাফসীর:

সূরা কাহাফে আল্লাহ্ তা'আলা এক কঠিন সতর্কবাণী পেশ করেছেন, তিনিই এক সময় প্রাচীরটিকে ধ্বংস/বিধ্বস্ত/সমান করে দিবেন এবং এই পৃথিবীতে ইয়াজুজ ও মাজুজকে ছেড়ে দিবেন। আল্লাহ্ তা'আলা যখন এই কাজটি করবেন (ঠিক) সে সময় বিশ্বের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হবে ঈশ্বরবিমুখ ভিত্তির উপর। সেই ক্ষমতাকে যুলুম, নির্যাতন, ধ্বংস ইত্যাদি কাজে, আর বিশেষ করে ইসলামের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হবে। এরূপ বিশ্ব-ব্যবস্থা হবে **দুই মেরু** বিশিষ্ট। এর এক মেরু হলো ইয়াজুজ আর অপর মেরু হলো মাজুজ। এটাই সেই বিশ্ব-ব্যবস্থা যার মাঝে এখন আমরা বসবাস করছি।

কাহাফ ১৮:৯৯

وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا

... একদিন আমরা (একটি প্রক্রিয়া চালু করবো যা) তাদের এক অংশকে তরঙ্গের মতো সক্রিয় করবে এবং তাদের অপর অংশের সাথে একীভূত করবে (বা তার সাথে সংঘর্ষ বাধাবে); তারপর (বিচারের) শিঙ্গা যখন বাজানো হবে, আমরা তখন তাদের সকলকে একসাথে নিয়ে আসবো।

তাফসীর:

কুর'আন আমাদেরকে জানাচ্ছে যে, বিভিন্ন সময়ে শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে (১৮:৯৯, ২৩:১০১, ৩৬:৫১, ৩৯:৬৮ দুবার, ৫০:২০, ৬৯:১৩)। উপরের আয়াতে বর্ণিত শিঙ্গায় ফুৎকার, ফিতনার সময় যে ঘনিয়ে আসছে তার দিকে ইঙ্গিত করছে। ভালভাবে বলতে গেলে এটি **সা'আর** আবির্ভাবের দিকে নির্দেশ করছে, অর্থাৎ যে সময়

পৃথিবী ধ্বংস হবে এবং এরপর কবর থেকে সবাই পুনরুত্থিত হবে সে সময়কে এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে। তবে, এও সম্ভব যে, এই রহস্যপূর্ণ আয়াতে ইয়াজুজ ও মাজুজের পৃষ্টপোষকতায় পৃথিবীব্যাপী অশান্তি, অরাজকতা এবং পাপপূর্ণ নিয়মকানুনের বিশ্বায়নের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

কুর'আনের শব্দার্থতাত্ত্বিক ড. তাম্মাম আদী সুক্ষদর্শিতার সাথে মন্তব্য করেছেন যে: "ইয়াজুজ ও মাজুজকে ঢেউয়ের আকারে ছেড়ে দেয়া হবে; তারা একে অপরকে শক্তি যোগাবে; একজন বিফল হলে, অপরজন জয়ী হবে। এপর্যন্ত ঠিক এটাই হয়ে আসছে। তারা প্রত্যেক জাতি ও ধর্মের মধ্যে অনুপ্রবেশ করে সবাইকে একই চেহারায় রূপান্তরিত করেছে। বিশেষভাবে লক্ষণীয় হলো আমেরিকার সমাজ, যেখানে খাযার গোত্রের বিভিন্ন শাখা এসে জড়ো হয়েছে, সেখানে তারা একজোট হয়ে অন্যান্য দেশ ও জাতিকে ধ্বংস করার কাজে এগিয়ে চলেছে।" (লেখকের সাথে ড. আদীর ব্যক্তিগত আদান-প্রদান থেকে নেয়া)।

এই আয়াতে আগামী দিনের তারকা-যুদ্ধের পূর্বাভাসও থাকতে পারে, যা ইয়াজুজ ও মাজুজের মধ্যে সংঘঠিত হবে, যার ফলে পৃথিবীর এক বিশাল অংশ ধুলায় পরিণত হবে, (সূরা কাহাফ, ১৮:৮, *সময় এলে আমরা এর বেশীরভাগকে ধুলায় পরিণত করে দিব*)। তারপরই পৃথিবী ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে এবং কিয়ামত চলে আসবে। আসলে এই আয়াতে বলা হয়েছে যে ইয়াজুজ ও মাজুজ ঢেউয়ের মত একে অপরের সাথে বাড়ি খাবে, তারা দ্বৈত ক্ষমতায় সন্তুষ্ট হবে না, এবং একক আধিপত্যের জন্য যুদ্ধ করবে। পৃথিবীকে নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য দাজ্জাল ঠিক এটাই চাইবে। তবে এই সংঘর্ষের পরই শিঙ্গা ফুঁ দেয়া হবে।

কাহাফ ১৮:১০০

وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا

এবং সেদিন (যখন ইয়াজুজ বনাম মাজুজ সংঘর্ষের ভয়ংকর মুহূর্তটি আসবে এবং মাশরুমের মতো পরমাণু মেঘের আকারে আকাশে দুখান বা ধোঁয়া দেখা দিবে তখন) সত্যকে অস্বীকারকারী সকলের চোখের সামনে আমরা জাহান্নামকে নিয়ে আসবো ...।

তাফসীরঃ

সেসব ভয়াবহ যুদ্ধে বিপুল পরিমাণ লোক ধ্বংস হবে এবং পৃথিবীর জনসংখ্যার উল্লেখযোগ্য অংশ হ্রাস পাবে, এই আয়াত সেদিকে পরিষ্কার ইঙ্গিত দিচ্ছে। এই যুদ্ধে যে বিপুল পরিমাণ লোক ধ্বংস হবে তাদের অধিকাংশের ভয়ার্ত চোখের সামনে জাহান্নামকে ছড়িয়ে দেয়া হবে। মুসলিমরা এখন ঠিক এই রকম দুনিয়ায় বসবাস করছে। এটা বুঝাবার জন্যে এর চেয়ে বেশি প্রমাণের প্রয়োজন নেই। সময় এসেছে মুসলিমদের এই ক্রমবর্ধমান ঈশ্বরহীন ও ক্ষয়িষ্ণু সভ্যতার মূলধারা থেকে নিজেদেরকে বিচ্ছিন্ন করবার। **ইয়াজুজ বনাম মাজুজ** (*Armageddon*) **যুদ্ধ** যখন আরম্ভ হয়ে যাবে এই সমাজ ব্যবস্থা তখন ধ্বংসের **ডোমঘর বা খোয়াড়ে** পরিণত হবে ...।

কাহাফ ১৮:১০১

الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَن ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا

তারা হলো (সে সকল লোক) যাদের চোখে আমার স্মরণ থেকে পর্দা লেগে রয়েছে, কারণ তারা (সত্য কথা) শুনতে সক্ষম ছিল না।

তাফসীরঃ

এই আয়াত বলে দিচ্ছে, যাদের চোখ রয়েছে তারপরেও তারা দেখতে পায় না, কান রয়েছে তারপরেও শুনতে পায় না, অন্তর রয়েছে তারপরেও উপলব্ধি করতে পারে না, এরাই হচ্ছে সে সমস্ত লোক যারা **দ্বিতীয় ক্বার্‌ন**কে চিহ্নিত করতে পারে না, পারে না চিহ্নিত করতে চরমভাবে ঈশ্বরহীন ও ক্ষয়িষ্ণু আজকের বিশ্বের বাস্তবতাকে যেখানে আমরা বসবাস করছি (যা খুবই হতাশাজনক ও আধ্যাত্মিক দৈন্যদশার বহিঃপ্রকাশ, কিন্তু আমাদের দ্বীন ইসলামকেও তথাকথিত **সহীহ** ইসলামের নামে এরূপ বস্তুবাদী করার হীন প্রচেষ্টা চলছে - অনুবাদক)। দুই ক্বার্‌নের **দ্বিতীয় ক্বার্‌ন**টি (যুগ) যে নিজেই একটি শেষ দিনের আলামত এই সত্যটি তাদের মতো ব্যক্তিরা চিহ্নিত করতে পারে না।

কাহাফ ১৮:৮৩-১০১ সমাপ্ত

কুর'আনের উপরের অনুচ্ছেদ (আমাদের তাফসীরসহ) এবং সেই সাথে এই বইয়ের বিভিন্ন স্থানে উদ্ধৃত বিশুদ্ধ হাদীসের মাধ্যমে আমরা খুবই যত্নের সাথে ইয়াজুজ ও

মাজুজের হালচাল বা জীবনচিত্র তুলে ধরেছি। আমরা বের করেছি যে, তারা অবশ্যই **মনুষ্যজাতি,** তবে **দু'মুখো** (দুই মুখো সাপ, প্রবাদটির মতো) এবং ক্ষিপ্র গতি সম্পন্ন।

তারা বিশেষ **সামরিক শক্তি**-বিশিষ্ট, কিন্তু তারা এই **ক্ষমতা**কে যুলুম নির্যাতনে ব্যবহার করে। তাদের চিহ্নিত করা খুবই জরুরী, আর তাদের চিহ্নিত করার আলামত তো কুর'আন দিয়েই দিয়েছে। ঐশ্বরিক আদেশ বলে **কিছু লোক**কে তাদের **শহর** (যাকে আল্লাহ্ ধ্বংস করে দিয়েছিলেন) থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল, সে সমস্ত লোকের ফিরে আসা সম্ভব করবে ইয়াজুজ ও মাজুজ, যেন সে সব লোকেরা দাবী করতে পারে যে, এই **'শহর'** তাদের। **(আম্বিয়া ২১:৯৫-৯৬)**। ইয়াজুজ ও মাজুজের মুক্তি যেহেতু শেষ দিনের বড় আলামত, আর এই আলামতটিকে কুর'আন উল্লেখ করেছে, তাই সে হিসেবে, **ধ্বংসপ্রাপ্ত শহর, বহিষ্কৃত লোকজন, তাদের সেই শহরে ফিরে আসার** ব্যাপারে ইয়াজুজ ও মাজুজের সহায়তা গ্রহণ, এই বিষয়গুলি **শেষ সময়ের আলামতে**র সাথে সম্পর্কযুক্ত।

এই বইয়ের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ে আমরা গবেষণার পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করেছি। আমরা সেখানে (প্রমাণ) দেখিয়েছি যে, ইয়াজুজ ও মাজুজের সাথে সম্পৃক্ত কুর'আনের কোন আয়াত এবং হাদীসকে ব্যাখ্যা করার ও উপলব্ধি করার আগে **শেষ সময়ের আলামতে**র সাথে সম্পৃক্ত অর্থ প্রকাশের পদ্ধতিকে আয়ত্ত করতে হবে। আগের অধ্যায়ে আমরা বিভিন্ন পরিভাষার ব্যাখ্যা প্রদান করেছি। সেখানে আমরা যুক্তি পেশ করেছি যে, ঈসা (আঃ) **সা'আ**র ইল্ম অর্থাৎ ঈসা (আঃ) হলেন **শেষ সময়** বিষয়টিকে বুঝার চাবিকাঠি, এটা কুর'আন নিজেই চিহ্নিত করেছে।

গবেষণার সেই পদ্ধতির মাধ্যমে **শহর**টি যে **জেরুযালেম** আমরা তাও বের করেছি। আমাদের এই চিহ্নিতকরণকে অনেকেই জিদের বশে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানাবে। পবিত্রভূমিতে ইসরাঈলি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় প্রধান নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় যে ইয়াজুজ ও মাজুজ রয়েছে, এই বাস্তবতাকে তারা প্রত্যাখ্যান করবে। ক্রমবর্ধমান অত্যাচারের পথ ধরে এই ভন্ড রাষ্ট্রটি যে বিশ্বকে শাসন করার পথে অগ্রসর হচ্ছে এই চরম বাস্তবতাকেও তারা অস্বীকার করবে। পবিত্রভূমিতে চলমান নাটকের শেষ পরিণতি যে ঈসা (আঃ)-এর আগমন, এই বাস্তবতার ক্ষেত্রেও তারা তাদের চোখকে অন্ধ করে রেখেছে। ঈসা (আঃ)-এর আগমনই হলো **সা'আ**র জ্ঞান (বা ইল্ম)। পবিত্রভূমিতে যে নাটক চলছে কুর'আনের মাধ্যমে তা ব্যাখ্যার জন্যে সন্দেহ পোষণকারীদেরকে এই লেখার মাধ্যমে চ্যালেঞ্জ জানানো হচ্ছে। পারলে তারা এর ব্যাখ্যা দিক, এবং **কুর'আন সবকিছুকে ব্যাখ্যা করে** কুর'আনের এই দাবীটির পূর্ণতা প্রদান করুক। [নাহ্ল **১৬:৮৯**]।

এখানে ইয়াজুজ ও মাজুজের জীবনচিত্র বা জীবনআলেখ্য তুলে ধরা হলো:

ইয়াজুজ ও মাজুজ হলো মানুষ জাতি

(কুর'আন ও হাদীস)

ইয়াজুজ ও মাজুজরা কি অদ্ভূত দীর্ঘকায় আকৃতি বিশিষ্ট আজব সৃষ্টি, নাকি তারা মানুষজাতি? তারা কি জিন, না ফেরেশতা? নাকি তারা ভন্ড মসীহ দাজ্জালের মতো? নাকি তারা মানুষ, জিন, ফেরেশতা কোনটিই না হয়ে দাজ্জালের মতো একদিন মানুষের আকৃতিতে আবির্ভূত হবে? এই প্রশ্নের উত্তরের জন্যে আমাদের উচিত হবে প্রথমেই পবিত্র কুর'আনের দিকে চলে যাওয়া।

সূরা কাহাফের ১৮:৯৪ আয়াত জানাচ্ছে, ইয়াজুজ-মাজুজ ও তাদের ফ্যাসাদ সম্পর্কে একটা সম্প্রদায় যুলক্বার্নাইনের কাছে অভিযোগ পেশ করেছিল। তারা তাঁকে একটা প্রাচীর নির্মাণ করতে অনুরোধ করে যা ইয়াজুজ ও মাজুজকে আটকে রাখবে, এবং এভাবে তারা তাদের ফ্যাসাদ থেকে রক্ষা পাবে। তিনি তাদের আবেদনে সাড়া দিয়ে লোহার একটি প্রাচীর তৈরী করে দেন আর এর মাধ্যমে সফলভাবে তিনি তাদেরকে প্রাচীরের অপর দিকে আটকে রাখতে সক্ষম হন।

ইসলামি নৈতিক আইন অনুযায়ী, পরকালে শাস্তিযোগ্য পাপ ও দুনিয়াতে শাস্তিযোগ্য পাপের (যাকে অপরাধ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়) মাঝে একটি পার্থক্য রয়েছে।

ইসলামি ফৌজদারী আইন **ফ্যাসাদকে** সকল অপরাধের বড় অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করেছে {অর্থাৎ এমন কাজ যার প্রকৃতিই হলো ধ্বংস সাধন করা, যেমন পরিকল্পিত হত্যা, সুদী ব্যাংকিং (কেননা এটা অবাধ বাজারকে ধ্বংস করে), সংঘবদ্ধ ডাকাতি, মাদক ও ভ্যাক্সিনের মাধ্যমে বিষ ছড়ানো, মূর্তি পূজা করতে বলপ্রয়োগ (আত্মার ধ্বংস সাধন) ইত্যাদি}।

আর সেই সাথে ইসলাম ফ্যাসাদের জন্যে ভয়ানক শাস্তি নির্ধারণ করেছে। তাতে অন্তর্ভূত রয়েছে, দেশ থেকে তাড়িয়ে দেয়া, বিপরীত দিক থেকে হাত পা কেটে দেয়া, শুলিবিদ্ধ করা ইত্যাদি:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালায়, এবং জমিনে **ফ্যাসাদ** সৃষ্টি করে, তাদের শাস্তি হচ্ছে মৃত্যুদন্ড দেয়া, শুলিবিদ্ধ করা, বিপরীত দিক থেকে হাত পা কেটে দেয়া, দেশ থেকে বিতাড়ন, ইত্যাদি। এটা হলো তাদের দুনিয়াবী শাস্তি আর পরকালে তো তাদের জন্যে রয়েছে কঠিন আযাব।

[মায়িদাহ ৫:৩৩]

ইয়াজুজ ও মাজুজের আচরণের বর্ণনা দিতে গিয়ে **ফ্যাসাদ** শব্দটির ব্যবহারের নিহিতার্থ হলো, তারা এমন একটা জাতি যারা ফ্যাসাদের জন্যে দায়ী হবে। এটা তখনই সম্ভব হবে যখন ইয়াজুজ ও মাজুজের **স্বাধীন ইচ্ছা শক্তি** বা **পছন্দ করা**র অধিকার থাকবে। তারা তাদের পাপ কাজের জন্যে দায়ী হবে।

ফিরিশতাদের **স্বাধীন ইচ্ছা শক্তি** নেই তাই তারা পাপ করতে পারে না। এজন্যে তারা **ফ্যাসাদ** করতে পারে না। আর না ফিরিশতাদের জড় প্রাচীরে আটকে রাখা যাবে। জিনদের যদিওবা **স্বাধীন ইচ্ছা শক্তি** রয়েছে এবং তারা তাদের আচরণের জন্যে দায়ী হবে, তারা তো মানুষের নিকট অদৃশ্য। ফলে কেউ তাদেরকে **ফ্যাসাদকারী** হিসেবে চিহ্নিত করতে পারবে না। এছাড়াও অদৃশ্য জিনেরা আমাদের **স্থান-কাল** থেকে ভিন্ন **স্থান-কালে** অবস্থান করে, ফিরিশতাদের মতো তাদেরকে জড় প্রাচীরে আটকে রাখা যাবে না।

মানুষই একমাত্র সৃষ্টি যাদের **স্বাধীন ইচ্ছা শক্তি** রয়েছে, পাপ কাজ করে, এ কারণে তারা **ফ্যাসাদ** সংঘঠিত করতে পারে। উপরন্তু, তারা জিন ও ফিরিশতাদের মতো নয় তাই তাদেরকে জড় প্রাচীরে আটকে রাখা যাবে। ফলে অবশ্যম্ভাবী উপসংহার হলো, ইয়াজুজ ও মাজুজ মানুষ।

আমরা যখন হাদীসের দিকে তাকাই, সেখানে আমরা এমন অনেক হাদীস পাই যা আমাদের উপসংহার, অর্থাৎ তারা যে মানুষ, তা সমর্থন করে।

আবু সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী (সাঃ) বলেছেন: "বিচার দিবসে আদমকে তাঁর ***সমগ্র বংশধরদের মধ্য থেকে*** যারা জাহান্নামের জন্যে উপযুক্ত

তাদেরকে বাছাই করতে বলা হবে। আদম প্রশ্ন করবেন, 'হে আমার প্রতিপালক! তারা কারা?' আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, '১০০০ জনে ৯৯৯ জন জাহান্নামের জন্যে ও ১ জন জান্নাতের উপযুক্ত।'" এটা শুনে সাহাবারা ভয় পেলেন এবং বললেন, "জান্নাতের জন্যে ১ জন হবে কে?"। নবী (সাঃ) বললেন, "ভয় পেও না। ৯৯৯ জন হবে ইয়াজুজ ও মাজুজ এবং ১ জন হবে তোমাদের মাঝে।"

[সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম]

ওহাব ইবনে জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, "ইয়াজুজ ও মাজুজরা আদমের বংশধর"। তাঁকে রাফে' (রাঃ) দেখেছেন। তিনি বলেছেন: "হ্যাঁ"।

[কানযুল 'উম্মাল, হাদীস নং:২১৫৮]

উপরের হাদীস প্রমাণ করছে, ইয়াজুজ ও মাজুজরা আদম (আঃ)-এর বংশধর। সহীহ মুসলিমে একটা হাদীস রয়েছে যেখানে আল্লাহ্ তা'আলা ইয়াজুজ ও মাজুজকে **আবদ্ব** عبد হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

إني قد أخرجتُ عبادا لي لا يدان لأحد بقتالِهم

আমি আমার এক সৃষ্টিকে এতটা ক্ষমতাবান করেছি, আমি ছাড়া তাদের বিরুদ্ধে কেউ যুদ্ধ করতে পারবে না।

[সহীহ মুসলিম]

আল্লাহ্র বান্দাদের মধ্যে যারা যুদ্ধ বাধাতে পারে, এবং সেনাবাহিনীদের পরাজিত করতে পারে, তারা তো মানুষই হবে।

কুর'আন ও হাদীস থেকে প্রাপ্ত অকাট্য প্রমাণের ভিত্তিতে আমাদের উপসংহার হচ্ছে **ইয়াজুজ ও মাজুজরা মানুষ**।

দু'মুখো মানুষ যারা দ্রুতগামী

(কুর'আনিক শব্দার্থ)

কুর'আনিক শব্দার্থবিদ ড. তাম্মাম আদী বের করেছেন, ইয়াজুজ ও মাজুজ শব্দটি এসেছে আরবী শব্দমূল ج أ ج থেকে। ব্যাকরণগতভাবে কর্তৃবাচ্যের রূপ হলো يَأْجُوج এবং কর্মবাচ্যের রূপ হলো مَأْجُوج। এটা তাদের দ্বিমুখী চরিত্রকে তুলে ধরছে,

যাদের আচরণ হলো অনেকটা **জোয়ার-ভাটার মতো**। তারা আক্রমণ ও দখল করে يَأْجُوج এবং তারপর হটে যাওয়ার ভান করে مَأْجُوج। তারা আগ্রাসন চালায় يَأْجُوج এবং তারপর শান্তির দূতের ভূমিকায় বা আগ্রাসনের শিকারের ভান করে مَأْجُوج। তারা সন্ত্রাস চালায় يَأْجُوج এবং তারপর শান্তি স্থাপন করে مَأْجُوج। তারা ধার্মিকের ছদ্মবেশ নেয় يَأْجُوج যেখানে বাস্তবতা হলো তারা পুরোপুরি ঈশ্বরহীন مَأْجُوج।

কুর'আনের বাণী গোড়াতেই এরূপ দ্বিমুখী চরিত্রের লোকদের বর্ণনা দিয়ে শুরু হয়েছে:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَـٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ

যখন তাদেরকে বলা হয়: "যমীনে তোমরা ফ্যাসাদ করো না।" তারা বলে: "আমরা তো সংশোধনকারী।" আসলে তারাই ফ্যাসাদকারী কিন্তু তারা তা উপলব্ধি করে না।

[বাকারাহ ২:১১-১২]

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ

যখন তারা ঈমানদারদের সাথে মিলিত হয় তখন তারা বলে: "আমরা ঈমান এনেছি", আর যখন তারা শয়তানদের সাথে মিলিত হয় তখন তারা বলে: "আমরা তো উপহাসকারী মাত্র।"

[বাকারাহ ২:১৪]

ব্যাকরণবিদরা আরো বের করেছেন, يَأْجُوج مَأْجُوج শব্দটি এসেছে আরবী শব্দমূল **ইয়াফ'উল** এবং **মাফ'উল** গঠনে أَجَّ এবং أَجِيج থেকে। أَجِيج মানে **কঠোরতা, অগ্নিশিখা**। অন্যদিকে أَجَّ বলতে বুঝায় أَسرَعَ যার অর্থ, **সে দ্রুত হাঁটে**। ইয়াজুজ ও মাজুজ এমন বৈশিষ্ট্যের লোক যারা **দ্রুতগামী ও প্রচন্ডভাবে উত্তেজিত**। এর প্রমাণ হিসেবে দেখা যায়, বাদবাকি বিশ্বের সমগ্র মানবতার তুলনায় তাদের রয়েছে অলিম্পিকের স্বর্ণ পদকের স্তুপ। কিন্তু তাদের **দ্রুতগামীতা** ও **অগ্নিশিখার** মিলিত রূপ পাওয়া যায় যখন

এই লোকগুলি আগ্রাসন ও অত্যাচারের বর্বর যুদ্ধ আরম্ভ করে এবং যার মাধ্যমে বাকি বিশ্বকে তারা দখল করে এবং সেখানে উপনিবেশ স্থাপন করতে সক্ষম হয়।

তাদের দ্বিমুখীতার সবচেয়ে ভয়াবহ ও অদ্ভুত দিকটি হলো, তারা নিজেদেরকে ধার্মিক হিসেবে জাহির করে, অথচ তারা একদম ঈশ্বরহীন। মার্জিত ও ভদ্র জীবন যাপনের পরিবর্তে তারা আসলে ধর্মহীন, এবং সেই সাথে যারা নিষ্ঠার সাথে ধর্মীয় জীবন যাপন করে, তাদের ঘৃণা করে।

يَأْجُوج যেহেতু কর্তৃবাচ্য এবং مَأْجُوج কর্মবাচ্য তাই এর মানে দাঁড়ায়, তাদের দুজনের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ইয়াজুজরা বিজয়ী হবে। এ বইটি ইয়াজুজ ও মাজুজ উভয়কে সনাক্ত করতে প্রচেষ্টা চালিয়েছে। এর মাধ্যমে আমরা ইতিহাসের পরিসমাপ্তিতে সংঘঠিত **মহা যুদ্ধের** (*Armageddon*) উপর চোখ বুলিয়েছি।

অকল্পনীয় সামরিক ক্ষমতার অধিকারী

(কুর'আন ও হাদীস)

কুর'আন সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করছে, ইয়াজুজ ও মাজুজ এমন শ্রেণীর লোক যারা অনন্য সামরিক ক্ষমতার অধিকারী। সূরা কাহাফে বর্ণিত হয়েছে, যুলক্বার্নাইনকে তাদের ফ্যাসাদ সম্পর্কে অবহিত করা হয় এবং তাঁকে একটি প্রাচীর নির্মাণ করতে অনুরোধ করা হয়, যেটা সে অঞ্চলের মানুষকে তাদের ফ্যাসাদ থেকে রক্ষা করবে। পূর্ব ও পশ্চিমে ভ্রমণের পর তাঁর নিকট এই অনুরোধ আসে।

পশ্চিমে যাত্রাপথে তিনি এমন লোকদের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করেন, যাদের সাথে তিনি কী আচরণ করবেন আল্লাহ্ তা জানতে চান। এর প্রতিক্রিয়া হিসেবে তিনি ঘোষণা করেন যে, তিনি কেবল তাদের শাস্তি দেবেন যারা 'যুলুম' (অন্যায় ও অত্যাচার) করে।

যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলা যুলক্বার্নাইনকে তাঁর ইচ্ছানুযায়ী পথ অবলম্বন করার ঐশ্বরিক ক্ষমতা (সব ধরনের ক্ষমতার সমষ্টি) প্রদান করেছিলেন, সেহেতু তাঁর সাধারণ ও স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হওয়া উচিত ছিল, ইয়াজুজ ও মাজুজকে উচিত শিক্ষা প্রদান করা। কিন্তু বাস্তবে ইয়াজুজ-মাজুজকে শায়েস্তা করার পরিবর্তে তিনি তাদের আটকে রাখার

জন্যে একটি প্রাচীর নির্মাণে সম্মত হন। এটাই বলে দিচ্ছে যে, তারা এমন এক সামরিক শক্তির অধিকারী যাকে পরাজিত করা যাবে না।

এর চরম নিহিতার্থ হলো, ঐশ্বরিক আদেশ বলে বিশ্বে যখন ইয়াজুজ ও মাজুজরা মুক্ত হবে তখন তারা অনন্য সামরিক ক্ষমতার জোরে বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেবে। তারা তাদের শক্তিকে সম্প্রসারিত করবে যার সাথে কোন মিত্র শক্তিও কুলিয়ে উঠতে সক্ষম হবে না।

কুর'আনে দেয়া ইয়াজুজ ও মাজুজের এই বৈশিষ্ট্যকে হাদীস সমর্থন করেছে। ইমাম মুসলিমের সহীহ্‌তে বর্ণিত একটি হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ্ ইয়াজুজ ও মাজুজ সম্পর্কে বলেন:

إني قد أخرجتُ عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم

আমি আমার এক সৃষ্টিকে এতটা ক্ষমতাবান করেছি, আমি ছাড়া তাদের বিরুদ্ধে কেউ যুদ্ধ করতে পারবে না।

[সহীহ মুসলিম]

এটা পরিষ্কার যে, ঐশ্বরিক আদেশ বলে বিশ্বে যখন ইয়াজুজ ও মাজুজ মুক্ত হবে তখন তারা বিশ্বের নিয়ন্তা শক্তিতে পরিণত হবে কেননা কোন মিত্র শক্তিও তাদের বিরুদ্ধে কুলিয়ে উঠতে পারবে না। মানবজাতি তখন ইয়াজুজ ও মাজুজের বিশ্ব-ব্যবস্থার বলি হবে!

তারা অত্যাচার করার জন্য ক্ষমতা ব্যবহার করে

(কুর'আন)

কুর'আনের সূরা কাহাফ আমাদের দেখাচ্ছে, ক্ষমতা ঈমানের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকলে সেটা কিভাবে ব্যবহৃত হয়। যুলক্বার্নাইন আল্লাহ্‌র প্রতি এতটাই ঈমানদার ছিলেন যে, মহান আল্লাহ্ তাঁর শাসনকে বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত করে দেন এবং তাঁকে তাঁর ইচ্ছামত পথ অবলম্বন করার অধিকার প্রদান করেন। মহান আল্লাহ্ তাঁর সাথে কথা বলেন এবং নাম ধরে তাঁকে উল্লেখ করেন। ক্ষমতাকে শাস্তি দিতে অথবা দয়া এবং মহানুভবতার সাথে ব্যবহারের প্রস্তাব করেন। উত্তরে তিনি নিজের পছন্দ ও প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন যা (কাহাফ ১৮:৮৭-৮৮) দ্ব্যর্থহীনভাবে মূল্যবোধ ও নিষ্ঠার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল।

সূরা কাহাফে যুলক্বার্নাইনের ক্ষমতার ব্যবহার দ্বিতীয়বারের মতো আলোচিত হয়েছে যেখানে তিনি এমন লোকদের মুখোমুখি হন, "যাদের জন্যে আমরা কোন সুরক্ষার ব্যবস্থা করিনি (প্রাকৃতিক ব্যবস্থা) ছাড়া।" তিনি তাদের মানবাধিকারকে সম্মান দেখালেন এবং বিনাশর্তে তাদের এই অধিকারকে সকল চাহিদার উপর স্থান দিলেন। এক্ষেত্রে তিনি তাদের আদিম জীবনযাপনের কোনরূপ ক্ষতি করলেন না। এমনকি তাদের দেশ দখল, সোনা ও হীরা অন্বেষণ, (কাস্পিয়ানের) তেল সম্পদ উত্তোলন ইত্যাদির মতো গুরুত্বপূর্ণ চাহিদাকে তিনি গুরুত্ব দিলেন না।

সূরা কাহাফে ব্যবহৃত **যুলক্বার্নাইন** (যিনি দুই শিংয়ের অধিকারী বা যিনি দুই যুগের লোক) নামটি, আমাদের মতে, দু'টি যুগের অস্তিত্বের দিকে নির্দেশ করছে যার একটি সূরাটিতে আলোচিত হয়েছে আর **অপরযুগ** সম্পর্কে পরোক্ষভাবে এই সূরাটি আমাদের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করছে। সূরাটিতে **যুলক্বার্নাইন** শব্দটি ব্যবহৃত হওয়ার ফলস্বরূপ, আসন্ন দ্বিতীয় যুগটি তখনই আবির্ভূত হবে যখন ঐশ্বরিকভাবে ইয়াজুজ ও মাজুজকে মুক্ত করে দেয়া হবে। আল্লাহ্‌র পরিবর্তে পৃথিবী তখন ঈশ্বরবিমুখ ক্ষমতাকে প্রত্যক্ষ করবে। অর্থাৎ, ক্ষমতা তখন যুলক্বার্নাইনের ঠিক উল্টো পথে ব্যবহৃত হবে।

অত্যাচারীকে দমনের পরিবর্তে ক্ষমতা তখন আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমানদারদের টার্গেট করতে ব্যবহৃত হবে। দুনিয়া তখন বিশেষভাবে ইসলামের বিরুদ্ধে, এবং সাধারণভাবে ধর্মীয় জীবনযাপনের বিরুদ্ধে, যুদ্ধকে প্রত্যক্ষ করবে। দ্বিতীয়ত, ক্ষমতার অধিকারীরা মানবাধিকারের তিল পরিমাণ তোয়াক্কা করবে না। এমনকি তেলাপোকার ন্যায় দুর্বলতর (যারা আদিম জীবনযাপন করে) মানুষদের দেশ দখল, সেখানের সম্পদ যেমন সোনা, হীরা, তেল, পানি ইত্যাদি দখল করার মাধ্যমে তাদের নিপীড়ন ও ধ্বংস করবে।

তারা "সেই শহরের" অধিবাসীদেরকে সফলভাবে ফিরিয়ে আনবে

(কুর'আন)

{আমাদের মতে, কুর'আনের আয়াতটি (আম্বিয়া ২১:৯৫-৬) ইহুদিদের জেরুযালেম প্রত্যাবর্তনকে ইঙ্গিত করছে এবং পবিত্রভূমিতে ইসরাঈলি রাষ্ট্র পুনঃপ্রতিষ্ঠাকে ব্যাখ্যা করছে}।

ইয়াজুজ ও মাজুজের এই বৈশিষ্ট্য (যাকে আমরা পদচিহ্ন বলে আখ্যায়িত করি) সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, যার মাধ্যমে তাদেরকে চিহ্নিত করা যাবে। কুর'আন এক আশ্চর্যকর সংবাদ দিচ্ছে যে, **শহরে**র অধিবাসীরা (যাদেরকে আমরা ধ্বংস করে দিয়েছি) 'শহরটি তাদের' এই দাবী নিয়ে ফিরে আসতে পারবে না (তাদের বহিষ্কারের পর, এবং তাদের প্রত্যাবর্তনের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের পর) যতক্ষণ না ইয়াজুজ ও মাজুজকে মুক্ত করা হচ্ছে এবং তারা সবদিকে ছড়িয়ে না পড়ছে (এভাবেই তারা গোটা পৃথিবীকে তাদের নিয়ন্ত্রণে নেবে)। বইটিতে আমরা যুক্তি দেখিয়েছি যে, **শহর**টি হচ্ছে, **জেরুযালেম**।

وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ

নিষেধাজ্ঞা জারি রয়েছে একটি শহরের উপর (জেরুযালেম) যাকে আমরা ধ্বংস করে দিয়েছি (এবং এর অধিবাসীরা সেখান থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে), (এই শহর আমাদের, এই দাবী নিয়ে) তারা (অর্থাৎ সেখানের অধিবাসীরা) আর ফিরে আসতে পারবে না, যতক্ষণ না ইয়াজুজ ও মাজুজকে মুক্ত করে দেয়া হচ্ছে এবং তারা সবদিকে ছড়িয়ে না পড়ছে (এভাবেই তারা ইয়াজুজ ও মাজুজীয় বিশ্বব্যবস্থা কায়েম করবে)।

[আম্বিয়া ২১:৯৫-৯৬]

অর্থপ্রকাশের পদ্ধতি এবং সেই সাথে কুর'আনের বাহিরে অবস্থিত প্রকাশমান তথ্য উপাত্ত গভীর পর্যবেক্ষণের মাধ্যমেই কেবল এসব আয়াতের নাটকীয় প্রয়োগ ও সঠিক উপলব্ধি সম্ভব। এটাই হচ্ছে, সেই পদচিহ্ন যেটাকে মহান আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর পবিত্র গ্রন্থ আল-কুর'আনে উল্লেখ করেছেন আর একে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদচিহ্ন হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। হাদীসগুলিতে উল্লেখিত সাংঘর্ষিক পদচিহ্নগুলির চেয়ে একে বেশী প্রাধান্য দিতে হবে।

তারা বিশ্বমানবতাকে তাদের স্রষ্ঠাবিমুখ গন্ডির মধ্যে শুষে নেয়

(*কুর'আন ও হাদীস*)

যুলক্বার্নাইনের সতর্কবাণী সূরা কাহাফে বর্ণিত হয়েছে। একদিন আল্লাহ্ তা'আলা এই প্রাচীরটিকে ধ্বংস/বিধ্বস্ত/সমান করে দিবেন যেটাকে তিনি লোহার খন্ড

দিয়ে তৈরী করেছিলেন। ঐশ্বরিক আদেশবলে যখন ইয়াজুজ ও মাজুজকে মুক্ত করা হবে, এই প্রাচীরটি তখন ধ্বংস হবে। তরঙ্গের ন্যায় তারা সকল জাতি, গোত্র, লোকদেরকে এমনভাবে আঘাত হানবে যে, একমাত্র প্রকৃত মু'মিন ব্যতীত সবাই তাদের ঈশ্বরহীন মিলনকেন্দ্রে পতিত হবে। হাদীস থেকে এই কথাটি আরও পরিষ্কার হয়ে যায় যেখানে বলা হয়েছে, ১০০০ জনের ৯৯৯ জন হবে ইয়াজুজ ও মাজুজ এবং তারা সবাই জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।

আবু সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী (সাঃ) বলেছেন: বিচার দিবসে আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, "হে আদম!" উত্তরে তিনি বলবেন, "লাব্বাইক ওয়া সা'দাইক, হে আমার প্রতিপালক।" জোরে চিৎকার করে বলা হবে: আল্লাহ্ তোমাকে আদেশ করেছেন তোমার সমগ্র বংশধরদের মধ্য থেকে জাহান্নামীদের বাছাই করতে। আদম বলবেন, "হে আমার প্রতিপালক কত জন জাহান্নামে যাবে?" আল্লাহ্ বলবেন, "১০০০ জনে ৯৯৯ জন।" সে সময় গর্ভবতী তার বোঝা ফেলে দেবে (গর্ভপাত করবে), বালক বৃদ্ধ হয়ে যাবে।

وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ

মানুষকে তুমি দেখবে মাতাল অথচ সে মাতাল নয়। বস্তুত আল্লাহ্র আযাব বড়ই কঠোর। [হজ্জ ২২:২] নবী (সাঃ) যখন একথা বললেন সাহাবীদের কাছে তা কঠিন মনে হলো। ভয়ে তাদের চেহারার রং পরিবর্তন হয়ে গেল। নবী (সাঃ) বললেন, "৯৯৯ জন নেয়া হবে ইয়াজুজ ও মাজুজের মধ্যে থেকে আর ১ জন নেয়া হবে তোমাদের মধ্যে থেকে। তোমরা মুসলিমেরা (বাকি মানবতার তুলনায়) হবে কালো ষাঁড়ের গায়ে একটি সাদা পশমের মতো অথবা সাদা ষাঁড়ের গায়ে একটি কালো পশমের ন্যায়। আমি আশা করি তোমরা জান্নাতের ১/৪ অংশ হবে।" এটা শুনে আমরা বললাম, "আল্লাহু আকবার।" তিনি তারপর বললেন, "আমি আশা করি তোমরা জান্নাতের ১/৩ অংশ হবে।" আমরা আবার বললাম, "আল্লাহু আকবার।" তিনি তারপর বললেন, "(আমি আশা করি) তোমরা জান্নাতের ১/২ অংশ হবে।"

[সহীহ বুখারীতে বর্ণিত চারটি হাদীসের মিলিত ভাষ্য]

খুব কম সংখ্যক লোকই (১০০০ জনে ১ জন) সফলভাবে ইয়াজুজ ও মাজুজের ফিতনা ফ্যাসাদকে প্রতিহত করবে। তারা ইয়াজুজ ও মাজুজের সাথে খাপ

খাওয়াতে পারবে না, অনেকটা বৃত্তের মধ্যে চতুর্ভুজের মত। এরা হবে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অনুসারী।

তারা তারকা যুদ্ধ বাধাতে সক্ষম

(*হাদীস*)

এরা যে অনন্য সামরিক ক্ষমতার অধিকারী কেবল তাই নয়, সেই সাথে জোর করে যুদ্ধ বাধাতেও সক্ষম, যা বর্তমানে 'তারকা যুদ্ধ' নামে পরিচিত। হাদীসে ব্যবহৃত তীর শব্দটি থেকে পরিষ্কারভাবে এটা বোঝা যাচ্ছে। নবী (সাঃ) কী বলে যাননি:

> এখানে যারা উপস্থিত রয়েছে তাদের দায়িত্ব হলো (আমার) এই সংবাদকে তাদের নিকটে পৌঁছে দেয়া যারা এখানে অনুপস্থিত। সম্ভবত যাদের নিকটে পৌঁছে দেয়া হবে তাদের কেউ এই সংবাদকে তার থেকে বেশি উপলব্ধি করবে যে এটা শুনছে।
>
> [সহীহ বুখারী]

> ... ইয়াজুজ ও মাজুজেরা হাঁটতে থাকবে যতক্ষণ না তারা আল-খামর নামক পাহাড়ে পৌঁছাচ্ছে। এটা বাইতুল মাকদিসের একটি পাহাড়। তখন তারা বলবে, "আমরা পৃথিবীর সবাইকে হত্যা করেছি এবার আসমানের অধিবাসীদের হত্যা করবো।" তারা আসমানের দিকে তীর নিক্ষেপ করবে এবং তীরগুলিকে রক্ত মেখে তাদের কাছে ফেরত পাঠানো হবে ...।
>
> [সহীহ মুসলিম]

আরবদের উপর অত্যাচার হবে তাদের বিশেষ লক্ষ্য

(*হাদীস*)

আরবদের সাথে ইয়াজুজ ও মাজুজের আচরণ হবে বিশেষভাবে বৈরী। এটা নবী (সাঃ) একটা স্বপ্নের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। তিনি স্বপ্নে দেখলেন যুলক্বার্নাইনের নির্মিত প্রাচীরে একটা ছিদ্র হয়ে গেছে এবং ইয়াজুজ ও মাজুজের মুক্তি প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়ে গেছে অথবা খুব শীঘ্রই আরম্ভ হতে যাচ্ছে। এর ফলস্বরূপ তাঁর নিকট এই তথ্যটি প্রকাশ হয়ে যায়, যেটাকে তিনি বর্ণনা করেছেন এভাবে:

ويل للعرب "আরবদের জন্যে ধ্বংস অনিবার্য"

জয়নব বিনতে জাহাশ (রাঃ) বলেন: " ... একদিন নবী (সাঃ) ভয়ার্ত অবস্থায় আমাদের নিকটবর্তী হলেন এবং বললেন আল্লাহ্ ব্যতীত কারো উপাস্য হবার অধিকার নেই! আরবদের দুর্ভাগ্য, এক মহা অকল্যাণ তাদের কাছে আসছে। **আজ** ইয়াজুজ ও মাজুজের প্রাচীরে একটি গর্তের সৃষ্টি হয়েছে।" নবী (সাঃ) তার তর্জনী আর বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়ে একটি বৃত্ত তৈরী করে দেখালেন। জয়নব বিনতে জাহাশ (রাঃ) বলেন: আমি বললাম, "হে নবী (সাঃ)! আমাদের ভিতর সৎলোক থাকা সত্ত্বেও কি আমরা ধ্বংস হয়ে যাবো?" নবী (সাঃ) বললেন, "হ্যাঁ! (এটি ঘটবে) যখন মন্দ লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে (জঞ্জাল, মন্দ, খারাপ আচরণ, যৌন স্বেচ্ছাচারিতা ইত্যাদি পৃথিবীকে ঢেকে ফেলবে)।" (এটি কেবল আরবদের উপর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক অত্যাচারকে বুঝাচ্ছে না, বরং তারা বোধগম্য সকল ক্ষেত্রে চরমভাবে ও নির্লজ্জভাবে অপদস্ত হবে)।

[সহীহ বুখারী]

এভাবেই ইয়াজুজ ও মাজুজরা আরবদেরকে অত্যাচার ও নিপীড়নের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করবে। এর চরম নিহিতার্থ হলো ইয়াজুজ ও মাজুজের আক্রমণে, হজ্ব এবং সেই সাথে ইসলামি খিলাফত কোনটাই টিকে থাকবে না। বৈধ হজ্ব বা সুন্নি খিলাফতকে পুনরায় প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে না যতক্ষণ ইয়াজুজ ও মাজুজীয় বিশ্ব-ব্যবস্থা টিকে আছে।

আরবদের উপর অত্যাচার ও নিপীড়নের মাঝে রয়েছে সাম্প্রদায়িক অবজ্ঞা এবং অবহেলাকে এমন মাত্রায় বাড়িয়ে দেয়া যাতে সমগ্র মানবতা আরবদেরকে ঘৃণার পাত্র হিসেবে বিবেচনা করবে।

তাদের আবির্ভাব বা প্রেরণ কী ঈসা (আঃ)-এর আগমন এবং দাজ্জালের নিহত হবার পর হবে?

(*হাদীস*)

... এরকম একটা অবস্থায় আল্লাহ্ ঈসা (আঃ)-এর কাছে ওহী পাঠাবেন, "আমার বান্দাদের মাঝ থেকে এমন একটা দল সৃষ্টি করেছি যাদের সাথে যুদ্ধ করে কেউ

জয়ী হতে পারবে না, তুমি (তোমার সাথিদের) তুর পাহাড়ের উপর নিয়ে যাও।" (ইতিহাসের সে পর্যায়ে আল্লাহ্ তা'আলা)

يبعث اللّٰهُ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ

ইয়াজুজ ও মাজুজকে পাঠাবেন {এর মানে এটা নয় যে, ঈসা (আঃ)-এর প্রত্যাবর্তনের পরই ইয়াজুজ ও মাজুজকে মুক্ত করা বা ছেড়ে দেয়া হবে}, তারা প্রতিটি উচ্চভূমি থেকে নেমে আসবে। তাদের প্রথম জন টাইবেরিয়াস হ্রদের (গ্যালিলী সাগর) পাশ দিয়ে যাবার সময় সেখান থেকে পানি পান করবে। তাদের শেষ জন যখন সেই স্থান অতিক্রম করবে, সে বলবে এক সময় এখানে পানি ছিল ...।

[সহীহ মুসলিম]

এই হাদীসটিকে সর্বত্র এভাবে বুঝা হয়েছে যে, প্রকৃত মসীহ ঈসা (আঃ)-এর প্রত্যাবর্তনের পর এবং ভন্ড মসীহ দাজ্জালকে হত্যার পরই ইয়াজুজ ও মাজুজকে বিশ্বে ছেড়ে দেয়া হবে। আলাদাভাবে একটা হাদীসের ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করা যায় না, যা তার বিপরীতে পাওয়া কুর'আন ও হাদীসের সকল প্রমাণকে বাতিল করে দেয়। অতএব, সেই বাতিল পদ্ধতিকে আমাদের এই বই নাকোচ করেছে।

তারা মাত্রাতিরিক্ত পানি ব্যবহার করবে

(*হাদীস*)

কুর'আন ঘোষণা করেছে, প্রত্যেক জীবন্ত সত্তাকে পানি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে (দেখুন, আম্বিয়া:৩০)। পানিকে মানুষসহ সকল জীবন্ত সত্তার "মা" বলা হয়। কুর'আন আরো ঘোষণা করেছে যে, আল্লাহ্র আরশ (আদেশ নিষেধের মূলস্থান, যেখান থেকে তিনি সকল সৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রণ করেন) পানির উপর অবস্থিত। (দেখুন, হুদ ১১:০৭)।

ধর্মীয় জীবন পদ্ধতি পানিকে সম্মান করতে শেখায় ও তার অপচয়কে কঠোরভাবে নিষেধ করে। কিন্তু নবী (সাঃ)-এর হাদীস থেকে ইয়াজুজ ও মাজুজের যে বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে তা হলো, তারা পানির ব্যবহার এমন মাত্রাতিরিক্ত করবে যে, পবিত্রভূমিতে অবস্থিত গ্যালিলী সাগর শেষ পর্যন্ত শুকিয়ে যাবে। আর এভাবেই তারা নিজেদের বিপদ ডেকে আনবে।

... তাদের প্রথম জন টাইবেরিয়াস হ্রদের (গ্যালিলী সাগর) পাশ দিয়ে যাবার সময় সেখান থেকে পানি পান করবে। তাদের শেষ জন যখন সেই স্থান অতিক্রম করবে, সে বলবে একদা এখানে পানি ছিল ...। (এর মানে এমন মাত্রাতিরিক্ত পানি ব্যবহৃত হবে যে, প্রকৃতিও তা পূরণ করতে পারবে না। পানির উচ্চতা কমতে থাকবে যতক্ষণ না হ্রদটি শুকিয়ে যাচ্ছে)।

[সহীহ মুসলিম]

... তারা এমনভাবে গোটা পৃথিবীর পানি পান (ব্যবহার) করবে যে, তারা যখন কোন ঝর্ণা অতিক্রম করবে, তখন সেখানের সবটুকু পানি পান করবে এবং তাকে শুকিয়ে ছাড়বে।

[কানযুল 'উম্মাল]

উপরন্তু তারা যেহেতু ফ্যাসাদ করে, তাই তারা যে কেবল গোটা পৃথিবীর পানি সম্পদকে ধ্বংস করবে তাই নয় সেই সাথে পানির প্রতি সম্মানকেও ধ্বংস করবে। আর একারণেই, ওজু ও গোসলে পানির পরিমাণ এবং বিশুদ্ধতা উভয় ক্ষেত্রে সুন্নাহ মেনে চলার চরম তাৎপর্য রয়েছে।

ইয়াজুজ ও মাজুজ এবং গ্যালিলী সাগর

(*হাদীস*)

উপরের হাদীসটি প্রকাশ করছে, গ্যালিলী সাগরের পানির উচ্চতা ক্রমাগত হ্রাস পাওয়াটা একটা দলীল যে, ইয়াজুজ ও মাজুজরা ক্রমাগত প্রধান মঞ্চ **জেরুযালেম** অতিক্রম করছে। যেসব আলিম এই বিষয়টি পর্যালোচনা করবে, কিন্তু ইয়াজুজ ও মাজুজের চরিত্রের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত গ্যালিলী সাগরের পানির বর্তমান উচ্চতার পর্যবেক্ষণকে গুরুত্ব দিবে না তারা চরম ভুল করবে।

তারা অধিকাংশ মানুষকে জাহান্নামে নিয়ে যাবে কারণ তারা মূলতঃ স্রষ্ঠাবিমুখ এবং পাপী

(*হাদীস*)

আবু সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত এবং ইমাম বুখারীর সহীহতে সংকলিত হাদীস আল-কুদসীতে (যা সরাসরি আল্লাহ্‌র বাণী) উল্লেখিত রয়েছে যে, ১০০০ জনের ৯৯৯ জন মানুষকে ইয়াজুজ ও মাজুজরা **আহলে ইয়াজুজ মাজুজে** (ইয়াজুজ ও মাজুজের পরিবারে) পরিণত করবে। এর ফলস্বরূপ, সে সব লোকেরা জাহান্নামে প্রবেশ করবে। এর অকাট্য নিহিতার্থ হলো, ইয়াজুজ ও মাজুজের জীবনযাত্রার মূলপ্রবাহ হবে ঈশ্বরহীন ও পাপাচারে ভরা, আর এটা জাহান্নামের দিকে ধাবিত করবে।

হজ্জ বাতিল হওয়ার সাথে তাদের সম্পর্ক রয়েছে

(*হাদীস*)

সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হাদীস ইয়াজুজ ও মাজুজ ও হজ্ব বাতিল করণের মধ্যে একটি যোগসূত্র প্রতিষ্ঠা করেছে।

আবু সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত: নবী (সাঃ) বলেছেন:

ليحجن هذا البيت و ليعتمرن بعد يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ

লোকেরা ইয়াজুজ ও মাজুজের মুক্তির পরও কাবাতে হজ্ব এবং উমরাহ পালন করতে থাকবে। শু'বা (রাঃ) এতে অতিরিক্ত যোগ করেন,

لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت

সা'আ ততক্ষণ পর্যন্ত আসবে না যতক্ষণ না হজ্ব বাতিল হচ্ছে।

[সহীহ বুখারী]

হজ্ব যে চূড়ান্তভাবে বাতিল হবে, সে সম্পর্কে এই ভবিষ্যদ্‌বাণীটি আমাদের দৃষ্টি সরাসরি আকর্ষণ করছে এবং আমাদেরকে সংবাদ দিচ্ছে যে, হজ্ব চূড়ান্তভাবে বাতিল হবার (অনেক) আগেই ইয়াজুজ ও মাজুজের মুক্তি হবে। অন্যকথায়, হজ্ব যখন বাতিল হবে তখন কোন মুসলিমই অস্বীকার করতে পারবে না যে, ইয়াজুজ ও মাজুজের মুক্তি

হয়ে গেছে (এই লেখকের মতে, হজ্ব চূড়ান্তভাবে তখনই বাতিল হবে, যখন ইসরাঈল তার **মহাযুদ্ধ** আরম্ভ করবে এবং **নীল নদ থেকে ফোরাত নদী** পর্যন্ত এলাকা দখল করতে উদ্যত হবে)।

> সেদিন প্রতিপালক ইব্রাহীমের সাথে ওয়াদা করলেন এই বলে, "তোমার বংশধরদের আমি ভূমি দান করবো যেটা হবে মিসরের নদী থেকে মহা নদী ফোরাত পর্যন্ত।"
>
> [তাওরাত (ওল্ড টেস্টামেন্ট) জেনেসিস ১৫:১৮]

ইসরাঈলের **মহাযুদ্ধ** যে কোন সময় আরম্ভ হয়ে যেতে পারে এবং খুবই নিশ্চিতভাবে ঈসা (আঃ)-এর প্রত্যাবর্তনের আগে। ইয়াজুজ ও মাজুজের এই গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যটি বিশ্বে প্রকাশ পাবার আগ পর্যন্ত, আমাদেরকে খুব বেশি দিন আর সেই সকল সমালোচকদের জবাবে চুপ থাকতে হবে না, যারা **ইয়াজুজ ও মাজুজ ইতোমধ্যেই বিশ্বে মুক্ত হয়ে গেছে** এই বিশ্বাসটিকে প্রত্যাখ্যান করেছে।

পাঁচ - ইয়াজুজ ও মাজুজের চিহ্নিতকরণ

ইয়াজুজ এবং মাজুজের অনুপ্রবেশ রয়েছে ইঙ্গ-মার্কিন-ইসরাঈলি চক্র এবং রুশ-নেতৃত্বাধীন চক্র, এই উভয় পরাশক্তির মধ্যেই, এবং এরাই উভয় চক্রকে এক মহা-সংঘাতের মাধ্যমে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছে।

প্রথম সংস্করণে আমরা অনেকটা তাড়াহুড়া করে বলেছিলাম, ইয়াজুজ হলো ইঙ্গ-মার্কিন-ইসরাঈলি যায়োনিস্ট চক্র এবং মাজুজ হলো রুশ-নেতৃত্বাধীন চক্র। এব্যাপারে আমাদের ধারণায় একটা পরিবর্তন এসেছে। আমরা এখন মনে করি, উভয় চক্রের মধ্যেই ইয়াজুজ ও মাজুজ রয়েছে, এবং তারা এই দুই চক্রকে এক মহা-সংঘাতের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, যার পরিণতিতে বিশ্বশক্তি দু'টি একে অন্যকে ধ্বংস করবে। তবে, এটাও মনে রাখতে হবে, এই মহা-সংঘাতের পরও ইয়াজুজ ও মাজুজ টিকে থাকবে। ইসরাঈলকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করার জন্যে তারা তাদের সর্বশক্তি ব্যবহার করতে থাকবে, যেন ইসরাঈল পৃথিবীর নিয়ন্তা-রাষ্ট্রে পরিণত হতে পারে।

এই অধ্যায়টি এই বইয়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত। একথার অর্থ হলো, আমাদেরকে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে অগ্রসর হতে হবে, কারণ আমরা ইয়াজুজ ও মাজুজকে সনাক্ত করা যে কত কঠিন তা আগেই চিহ্নিত করেছি।

যুলক্বার্নাইনের প্রাচীরের পেছনে আটকে থাকা অবস্থায় ইয়াজুজ ও মাজুজরা যেস্থানে বসবাস করতো আমরা প্রথমত সেই ভৌগোলিক এলাকা খুঁজে বের করবো। আমাদের সৌভাগ্য যে, মহাপবিত্র আল-কুর'আন এবং নবী (সাঃ)-এর হাদীসগুলি এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট তথ্য ও বর্ণনা প্রদান করেছে, যেটা আমাদের পক্ষে সম্ভব করেছে, যুলক্বার্নাইন যে স্থানদ্বয়ে ভ্রমণ করেছিলেন এবং সেই সাথে ঠিক যে স্থানে প্রাচীরটি নির্মিত হয়েছিল, সবকটিকে সনাক্ত করতে।

সর্বপ্রথম আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে, সেই জায়গাটি অবশ্যই পবিত্রভূমির উত্তরে অবস্থিত হতে হবে কেননা এই বইয়ে পূর্বে উদ্ধৃত নবী (সাঃ)-এর হাদীসগুলি আমাদের জানাচ্ছে যে, ইয়াজুজ ও মাজুজরা জেরুযালেমের যাত্রাপথে গ্যালিলী সাগর অতিক্রম করবে। গ্যালিলী সাগর জেরুযালেমের উত্তরে অবস্থিত। প্রাসঙ্গিক হাদীস দু'টি হলো:

www.islamfind.wordpress.com

... এরকম অবস্থায় আল্লাহ্ ঈসা (আঃ)-এর কাছে ওহী পাঠাবেন, "আমি আমার বান্দাদের মাঝ থেকে এমন একটা দল সৃষ্টি করেছি যাদের সাথে যুদ্ধ করে কেউ জয়ী হতে পারবে না, তুমি (তোমার সাথিদের) তূর পাহাড়ের উপর নিয়ে যাও।" (ইতিহাসের সে পর্যায়ে আল্লাহ্ তা'আলা)

يبعث اللَّهُ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ

ইয়াজুজ ও মাজুজকে পাঠাবেন {এর মানে এটা নয় যে, ঈসা (আঃ)-এর প্রত্যাবর্তনের পরই ইয়াজুজ ও মাজুজকে মুক্ত করা বা ছেড়ে দেয়া হবে} এবং তারা প্রতিটি উচ্চভূমি থেকে নেমে আসবে। তাদের প্রথম জন টাইবেরিয়াস হ্রদের (গ্যালিলী সাগরের) পাশ দিয়ে যাবার সময় সেখান থেকে পানি পান করবে। তাদের শেষ জন যখন সেই স্থান অতিক্রম করবে, সে বলবে একদা এখানে পানি ছিল ...।

[সহীহ মুসলিম]

... ইয়াজুজ ও মাজুজেরা হাঁটতে থাকবে যতক্ষণ না তারা আল-খাম্‌র নামক পাহাড়ে পৌঁছাচ্ছে। এটা বাইতুল মাকদিসের একটি পাহাড় ...।

[সহীহ মুসলিম]

আমরা এখন পবিত্রভূমির উত্তরে একটি সমুদ্রের খোঁজ করবো যার সাথে যুলক্বার্নাইনের পশ্চিমে ভ্রমণ সংক্রান্ত কুর'আনিক বর্ণনা মিলে যায়। এতে বিশাল পরিমাণ পানি থাকতে হবে কেননা এই সমুদ্র অতিক্রম করে তাঁর পক্ষে আরো পশ্চিমে ভ্রমণ করা সম্ভব ছিল না। এটি অবশ্যই অস্বাভাবিক রকমের কালো রং বিশিষ্ট সমুদ্র হতে হবে।

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا

তিনি ভ্রমণ করলেন যতক্ষণ না তিনি সূর্যের অস্তাচলে পৌঁছলেন (যেহেতু সেখানে এরপর কোন ভূমি ছিল না তাই মনে হয়েছিল এটিই পৃথিবীর শেষ প্রান্ত)। তখন তিনি সূর্যকে অস্বাভাবিক ঘোলা জলাশয়ে অস্ত যেতে দেখলেন এবং সেখানে তিনি এক সম্প্রদায়কে পেলেন। আমি বললাম, "হে যুলক্বার্নাইন! (তোমার অধিকার রয়েছে) চাইলে তুমি এদেরকে শাস্তি দিতে পারো অথবা তাদের প্রতি দয়াময় হতে পারো।"

[কাহাফ ১৮:৮৬]

ঠিক তেমনি পূর্বদিকের ভ্রমণে তাঁকে অবশ্যই আরো একটি সমুদ্রের সম্মুখীন হতে হবে। এটা চিহ্নিত করতে পারলেই আমরা সূর্য উদয় সংক্রান্ত কুর'আনিক বর্ণনা এবং সেই সাথে মদিনার ইহুদিদের ঘোষণা, "তিনি পৃথিবীর সীমানায় (দুই প্রান্তে) ভ্রমণ করেছিলেন", এই দু'টিরই ব্যাখ্যা প্রদান করতে পারবো। এখানে ইহুদি র‍্যাবাইদের করা প্রশ্নগুলির জন্য দেখুন আমার বই *Surah al-Kahf and the Modern Age*-এর *The Historical Background to the Revelation of Surah al-Kahf* নামক অধ্যায়। *Download*-এর জন্যে আমার *website www.imranhosein.org* দেখুন)।

ইবনে আব্বাসের সূত্রে ইবনে ইসহাক বলেন: কুরাইশরা নাযর ইবনে হারিস এবং উকবা ইবনে আবি মুতা'আকে মদিনার ইহুদি আহবারদের (অর্থাৎ র‍্যাবাইদের) কাছে পাঠালো। তাদের দুজনকে তারা বললো: তারা যেন মুহাম্মাদ (সাঃ) সম্পর্কে তাদেরকে জিজ্ঞেস করে, তাঁর গুণাবলী তাদের কাছে বর্ণনা করে, এবং তাঁর বক্তব্য তাদেরকে অবহিত করে - কেননা তারা আহলে কিতাব, নবীদের ব্যাপারে তাদের যে জ্ঞান রয়েছে আমাদের তা নেই।

তারা চললো, যতক্ষণ না মদিনায় পৌঁছালো। তারা প্রশ্ন করলো এবং মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর গুণাবলী বর্ণনা করলো এবং অন্যান্য কিছু কথা শুনাল। ইহুদি আহবাররা তাদের দুজনকে বলল: তাঁকে তিনটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করো। যদি সে এগুলির উত্তর দিতে পারে, তবে সে নিশ্চিতভাবেই একজন প্রেরিত নবী আর তা না হলে সে প্রতারক। যদি সে প্রতারক হয় তাহলে তার সাথে তোমাদের ইচ্ছা মতো আচরণ করো। তাঁকে জিজ্ঞাসা করো: কতিপয় যুবক সম্পর্কে যারা প্রাচীনকালে গায়েব হয়ে গিয়েছিল। তাদের ব্যাপারটা কি? তাদের ঘটনা খুবই বিস্ময়কর ছিল। তাঁকে জিজ্ঞাসা করো ঐ ভ্রমণকারী ব্যক্তি সম্পর্কে যে ভ্রমণ করে পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিমে গিয়েছিল। তাঁর ব্যাপারটা কি? তাঁকে 'রূহ' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করো। এটা কি? তারা দুজন চলে আসল, যতক্ষণ না মক্কায় পৌঁছালো এবং বললো: তোমাদের কাছে আমাদের ও মুহাম্মাদের মধ্যাকার বিরোধের (চূড়ান্ত) ফয়সালা নিয়ে এসেছি। ইহুদি আহবারেরা কয়েকটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে বলেছে। এরপর তারা রসূল (সাঃ)-এর নিকটে গিয়ে প্রশ্নগুলি করলো যা ইহুদি আহবারেরা তাদেরকে শিখিয়েছিল। জিবরাইল (আঃ) সূরা কাহাফ নিয়ে আসলেন যাতে যুবক ও ভ্রমণকারী ব্যক্তি সম্পর্কে তাদের প্রশ্নের উত্তর ছিল। আরও নিয়ে আসলেন সূরা ইসরার ৮৫ নং আয়াতটি, যাতে ছিল রূহ সম্পর্কে প্রশ্নের উত্তর।

[সিরাত রাসুলুল্লাহ: ইবনে ইসহাক
অনুবাদ এ. গিয়োম, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস
করাচী, ১৯৬৭, পৃ:১৩৬]

তাঁর পূর্ব দিকে ভ্রমণের এটা হলো কুর'আনিক বর্ণনা:

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَّمْ نَجْعَل لَّهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا

যতক্ষণ না তিনি (চূড়ান্তভাবে) সূর্যের উদয়াচলে পৌঁছলেন (অর্থাৎ তিনি পূব দিকের একেবারে দূর প্রান্তে চলে গেলেন, যেহেতু এরপর কোন ভূমি ছিল না তাই মনে হয়েছিল এটিই পৃথিবীর শেষ প্রান্ত এবং এর কাছ থেকেই সূর্য উদিত হয়) তখন তিনি একে এমন এক সম্প্রদায়ের উপর উদিত হতে দেখলেন, যাদের জন্যে আমরা কোন আবরণ তৈরী করিনি (সম্ভবত প্রাকৃতিক আবরণ ব্যতীত) সূর্য (জলবায়ু, পরিবেশ দূষণ ইত্যাদি) থেকে রক্ষার জন্যে (কিছুই ছিল না)।

[কাহাফ ১৮:৯০]

আমরা যে বিস্তৃত এলাকার অনুসন্ধান করছি সেটা যে পূর্ব-পশ্চিম উভয় দিক দিয়ে দু'টো বিশাল সমুদ্র দ্বারা বেষ্টিত হবে কেবল তাই নয়, সেটা ভৌগোলিকভাবেও অবিচ্ছিন্ন দুর্গম পাহাড়ের সারি বিশিষ্ট হতে হবে। এক সমুদ্রের তীর থেকে অপর সমুদ্রের তীর পর্যন্ত বিস্তৃত কম-বেশী সন্নিবেশিত পাহাড়ের একটা সিরিজ আমাদের বের করতে হবে। আর এভাবেই আমরা মেনে নেব যে, পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে প্রবেশের একমাত্র পথকে বন্ধ করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে নির্মিত প্রাচীর খুব কার্যকরভাবে পাহাড়ের উত্তর দিক থেকে দক্ষিণ দিকে আসা লুণ্ঠনকারী সম্প্রদায়ের প্রবেশকে চিরতরে বন্ধ করে দিয়েছিল।

فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا

আর এভাবেই (প্রাচীরটি নির্মিত হলো এবং ইয়াজুজ ও মাজুজরা) না পারবে তা আরোহণ করতে আর না পারবে তা (খননের মাধ্যমে) ধ্বসিয়ে ফেলতে। (তাদের নিকটে কেবল এই দু'টি উপায়ই ছিল কেননা যুলক্বার্নাইন সামনে ঘোষণা করেছেন এই প্রাচীর নির্মাণ হলো ঐশ্বরিক রহমত। এর মানে হলো এভাবেই মানবজাতি ইয়াজুজ ও মাজুজের আক্রমণ থেকে বেঁচে থাকবে)।

[কাহাফ ১৮:৯৭]

যুলক্বার্নাইন যে প্রাচীর নির্মাণ করলেন তার বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি আরবী ردماً **রাদ্‌মান** শব্দটি ব্যবহার করলেন। যেখানে السدّ **সাদ্দুন** অর্থ প্রাচীর, সেখানে ردماً

রাদমান শব্দটির অর্থ হলো, একটা নির্মাণ প্রক্রিয়া যেটা একটা খালি স্থানকে বাঁধের মতো ভরাট করে দেয়। চলুন আমরা পুনরাবৃত্তি করি। পবিত্রভূমির উত্তরে আমরা অবশ্যই এমন একটা ভৌগোলিক এলাকার খোঁজ করবো যেটা পূর্ব-পশ্চিম উভয় দিক দিয়ে বিশাল সমুদ্র দ্বারা বেষ্টিত হবে। আর পশ্চিমের সমুদ্রটি হবে কালো রং বিশিষ্ট। ঐ দু'টি সমুদ্রের মাঝে অবিচ্ছিন্ন দুর্গম পাহাড়ের সারি থাকবে। উত্তর থেকে দক্ষিণ ও বিপরীতভাবে মানুষ অতিক্রমের জন্যে সেখানে একটা ফাঁকা স্থান বা গিরিপথ উন্মুক্ত থাকবে। কুর'আন সেই গিরিপথের দুই পাশকে উন্মুক্ত সামুদ্রিক খোলসের মতো বর্ণনা করেছে অর্থাৎ উন্মুক্ত সামুদ্রিক খোলসের দু'টি অংশের মতো যা নিচ দিয়ে আটকানো কিন্তু উপরের দিক দিয়ে আলাদা।

آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ حَتَّىٰ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انفُخُوا حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا

"আমাকে লোহার খন্ড এনে দাও!" এরপর তিনি (লোহাকে জড়ো করে) দুই পাহাড়ের মধ্যাকার ফাঁকা স্থানকে ভরাট করে দিলেন, তিনি বললেন, "(তোমরা আগুন জ্বালাও এবং) তোমরা এর নিচে ফুঁ দিতে থাকো!" যখন তিনি একে (তপ্ত) আগুনে পরিণত করলেন তখন আদেশ করলেন, "(তামাকে আগুনে পোড়াও এবং তারপর) গলিত তামাকে আমার কাছে নিয়ে আস যেন আমি তা (লোহার উপর) ঢালতে পারি ...।

[কাহাফ ১৮:৯৬]

পবিত্রভূমির উত্তর দিকে আমরা যখন বিশাল পরিমাণ পানির খোঁজ করবো তখন **ভূমধ্যসাগর** ও তার পূর্বের এলাকাগুলিকে সরাসরি বাতিল করে দেব যেহেতু তারা উপরের কোন বর্ণনার সাথেই খাপ খায় না। আমাদের জন্যে কেবল একটি উত্তর বাকি থাকে এবং সেটা সকল বর্ণনার সাথে একদম ঠিক ঠিকভাবে মিলে যায়।

ভূমধ্যসাগরের উত্তরে রয়েছে **কৃষ্ণসাগর**। **কৃষ্ণসাগর** নামকরণের সম্ভাব্য ব্যাখ্যা হলো, এর গভীর পানি অস্বাভাবিকভাবে কালো। ভূমধ্যসাগরের উত্তরে হওয়ায়, লবনাক্ততা কম থাকায়, এবং ক্ষুদ্র শৈবালের আস্তরণ ঘন হওয়ার কারণে এর রং কালো বা অন্ধকার প্রকৃতির। ভূমধ্যসাগরের তুলনায় **কৃষ্ণসাগরের** পানির তলদেশের স্বচ্ছতা কম। নিচে মানচিত্র নং-১ এ **কৃষ্ণসাগরের** স্যাটেলাইট ছবি তা সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছে। এখান থেকে এটা পরিষ্কার যে, যুলক্বার্নাইনের পশ্চিমে ভ্রমণকৃত সাগরটি **কৃষ্ণসাগর** ব্যতীত আর কোন সমুদ্র হতেই পারে না।

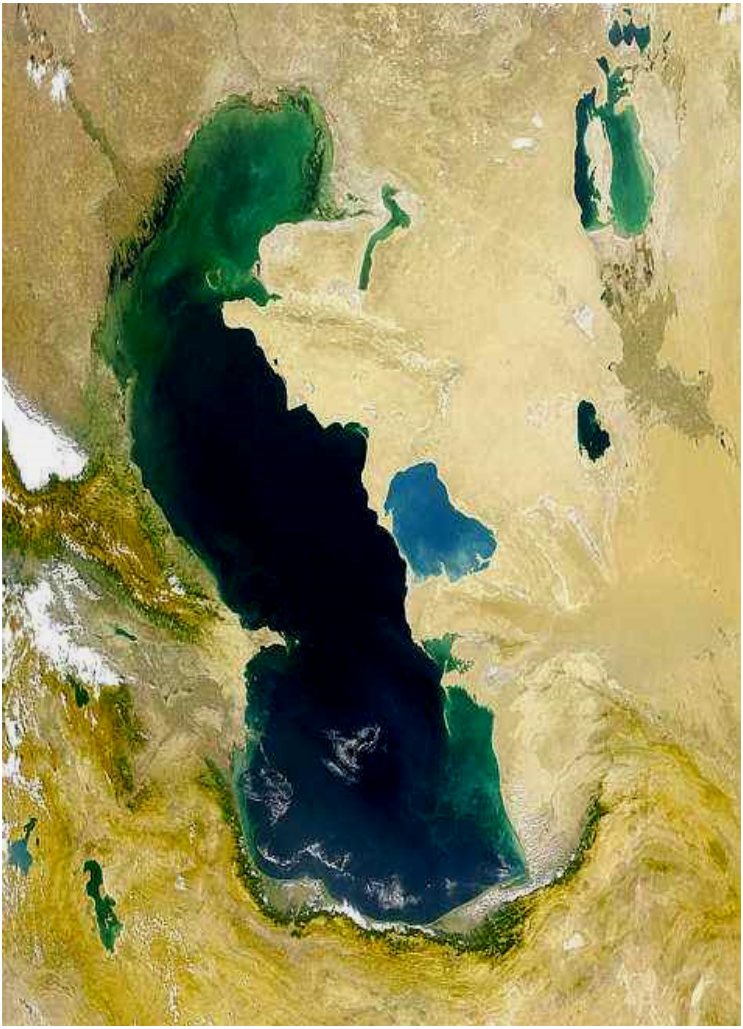

মানচিত্র নং-১

একবার যখন আমরা চিহ্নিত করতে পেরেছি, **কৃষ্ণসাগরটি** যুলক্বার্নাইনের পশ্চিমে ভ্রমণের একেবারে শেষে অবস্থিত তখন এর ঠিক বিপরীতে সমুদ্রটি হবে **কাস্পিয়ান** সাগর (দেখুন, মানচিত্র নং-২)।

মানচিত্র নং-২

এই দুই সাগরের মাঝে রয়েছে ককেশাস পবর্তমালা। প্রকৃতপক্ষে এই পর্বতমালা এক সাগর থেকে আরেক সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। আর এই প্রক্রিয়ায় সে ইউরোপ থেকে এশিয়াকে আলাদা করেছে (দেখুন, মানচিত্র নং-৩)।

মানচিত্র নং-৩

কৃষ্ণসাগর ও ক্যাস্পিয়ান সাগরের মাঝখানে অবস্থিত ককেশীয় পর্বতমালা

আমরা এখন দুই সাগর এবং সেই সাথে পার্বত্য অঞ্চল যেটা এক সাগর থেকে অন্য সাগর পর্যন্ত সম্পূর্ণ বিস্তৃত, তার সন্ধান পেয়ে গেছি। আমাদেরকে এখন পাহাড়দ্বয়ের মাঝে অতিক্রমের জন্যে একটি সরু পথ বের করতে হবে, যুলক্বার্নাইনের প্রাচীরের ধ্বংসাবশেষ থেকে লোহার প্রমাণ বের করতে হবে। এটা নিশ্চিত যে, জর্জিয়ান মিলিটারি হাইওয়ে (*Georgian Military Highway*) হচ্ছে অতিক্রমের একমাত্র পথ যেটা রাশিয়া কর্তৃক উনবিংশ শতকে পুনর্নির্মিত হয়েছে, যা পর্বতের উত্তর অংশকে দক্ষিণ অংশের সাথে একত্রিত করেছে। এটা হচ্ছে জর্জিয়ার (*Tbilisi*) তিবলিশি থেকে রাশিয়ার (*Vadikavkaz*) ভাদিকাভকায পর্যন্ত ২২০ কি.মি দীর্ঘ প্রধান সড়ক। জ্বার প্রথম আলেকজেন্ডার (*Tsar Alexander I*) নামকৃত এই সড়কপথটি নির্মিত হয়েছে খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকে এবং এটা আজও রাশিয়ার সাথে ককেশাস পর্বতমালার মাঝে গুরুত্বপূর্ণ সংযোগস্থল হিসেবে কাজ করছে।

ইন্টারনেটে এ সম্পর্কে তথ্য উপাত্ত বিদ্যমান রয়েছে যেখানে একে আখ্যায়িত করা হয়েছে:

> A spectacular highway, which winds its way through towering mountains, climbing to above 2300m at the Krestovy pass. Heading north from Tbilisi one first reaches the medieval fortress of Ananauri, overlooking the Aragvi river and valley. Nearing the Russian border, one comes to the town of Kazbegi, overlooked by the monumental Mount Kazbegi (5033m), the highest peak in the Georgian Caucasus. The last point is the *Daryal Gorge*, where the road runs some kilometres on a narrow shelf beneath *granite cliffs* 1500m high. *Daryal* was historically important as the only available passage across the Caucasus and has been long fortified at least since 150 BC. Ruins of an ancient fortress are still visible.

অর্থাৎ: একটি আকর্ষণীয় হাইওয়ে যেটা উঁচু পর্বতের মাঝখান দিয়ে এঁকেবেঁকে চলে গেছে, যা ক্রেসটোভি (*Krestovy*) গিরিপথের কাছে ২৩০০ মিটারেরও বেশী উচ্চতায় পৌঁছেছে। তিবলিশির উত্তরে অগ্রসর হয়ে রয়েছে (*Aragvi*) আরাগভি নদী ও উপত্যকা বেষ্টিত মধ্যযুগের (*Ananauri*) আনানাওরি দুর্গগুলি। রাশিয়ার সীমানার কাছে রয়েছে **জর্জিয়ান ককেশাসের** সর্বোচ্চ চূড়া কাজবেগি পর্বতের (৫০৩৩ মি.) পাশে কাজবেগি শহর। এর একেবারে শেষপ্রান্তে রয়েছে **দার্য়াল গর্জ**, যেখানে কয়েক কিলোমিটার রাস্তা খুব সংকীর্ণ ১৫০০ মিটার উচু

www.islamfind.wordpress.com

গ্রানাইটের পাহাড়ের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করেছে। ঐতিহাসিকভাবে **দার্‌য়াল গর্জ** খুবই গুরুত্বপূর্ণ কেননা এটাই ককেশাস অতিক্রমের একমাত্র পথ এবং এটা অনেক আগে থেকেই, অন্ততপক্ষে খ্রিস্টপূর্ব ১৫০ সাল থেকে, দুর্গ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। দুর্গগুলির ধ্বংসাবশেষ আজও দৃশ্যমান রয়েছে।

এক্ষণে পাহাড়ের মধ্য দিয়ে অতিক্রমের পথকে আমরা চিহ্নিত করেছি। বাকি রয়েছে অবশিষ্ট প্রাচীরের প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান। এই লেখকের সাথে ব্যক্তিগত আলাপকালে ড. তাম্মাম আদি মনোযোগ আকর্ষণ করে বলেছেন: "আমি আশা করি, (যুলক্বার্নাইন কর্তৃক নির্মিত প্রাচীরের) ধ্বংসাবশেষ **গিরিখাতের** একেবারে নিম্নদেশে অবস্থিত হবে এবং সেটা ব্রোঞ্জ, লোহা, তামা বা পিতলের খন্ড দ্বারা নির্মিত হতে হবে, যেমনটি কুর'আন পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেছে। দক্ষিণ ককেশাস অঞ্চল ও তার আশেপাশে আমাদের লোহার আকরিকের প্রমাণ বের করতে হবে কেননা সেই স্থানে লোহা থাকতে হবে, যেকারণে তারা লোহার টুকরো বা খন্ড যুলক্বার্নাইনের জন্যে নিয়ে আসতে পেরেছিল।

দার্‌য়াল গিরিখাতের উপর উইকিপিডিয়ার রচনা, যাতে এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার (*Encylopedia Britannica*) ১১-তম খন্ডের উদ্ধৃতি বিদ্যমান রয়েছে, তাতে রয়েছে:

> The origin of the name of the Gorge in *Dār-e Alān* meaning *Gate of the Alans* in Persian. The Gorge, alternatively known as the Iberian Gates or the Caucasian Gates, is mentioned in the Georgian annals under the names of Ralani, Dargani, Darialani." In other words, the name Daryal has preserved the historical fact of some form of a barrier constructed from metal that once existed in that Gorge.

অর্থাৎ, **এই গর্জের** নামের উৎস হচ্ছে **দার-এ-আলান**, ফারসী ভাষায় যার মানে হলো, **আলানদের গেট**। **আইবেরিয় গেট** অথবা **ককেশীয় গেট** নামেও পরিচিত **গিরিখাতটির** উল্লেখ জর্জিয়ান পুরাকাহিনীতে রালানি, দারগানি, দারইয়ালানি নামে পাওয়া যায়। অন্যকথায়, **দার্‌য়াল** নামটি ধাতু নির্মিত প্রাচীর হিসেবে ঐতিহাসিক ঘটনাগুলিতে সংরক্ষিত রয়েছে, যেটা **এককালে** ঐ গর্জে বিদ্যমান ছিল।

সবশেষে, **দার্‌য়াল গিরিখাতের** উভয় পাশের পাহাড়গুলির আকৃতি দেখতে ঠিক উন্মুক্ত সামুদ্রিক খোলসের দুই কিনারার মতো, যেমনটি কুর'আনিক শব্দ **সাদাফাইন**

الصدفين। থেকে বুঝা যায়। এখানে **দার্‌য়াল গিরিখাতের** ছবি রয়েছে যেটা১৮৭২ সালে তোলা হয়েছে:

দার্‌য়াল গিরিখাত: অন্যান্য নামের মধ্যে রয়েছে দার-এ-আলান (আলানদের গেট), আইবেরীয় গেট এবং ককেশীয় গেট

http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Dariialsk_ravine_(A).jpg

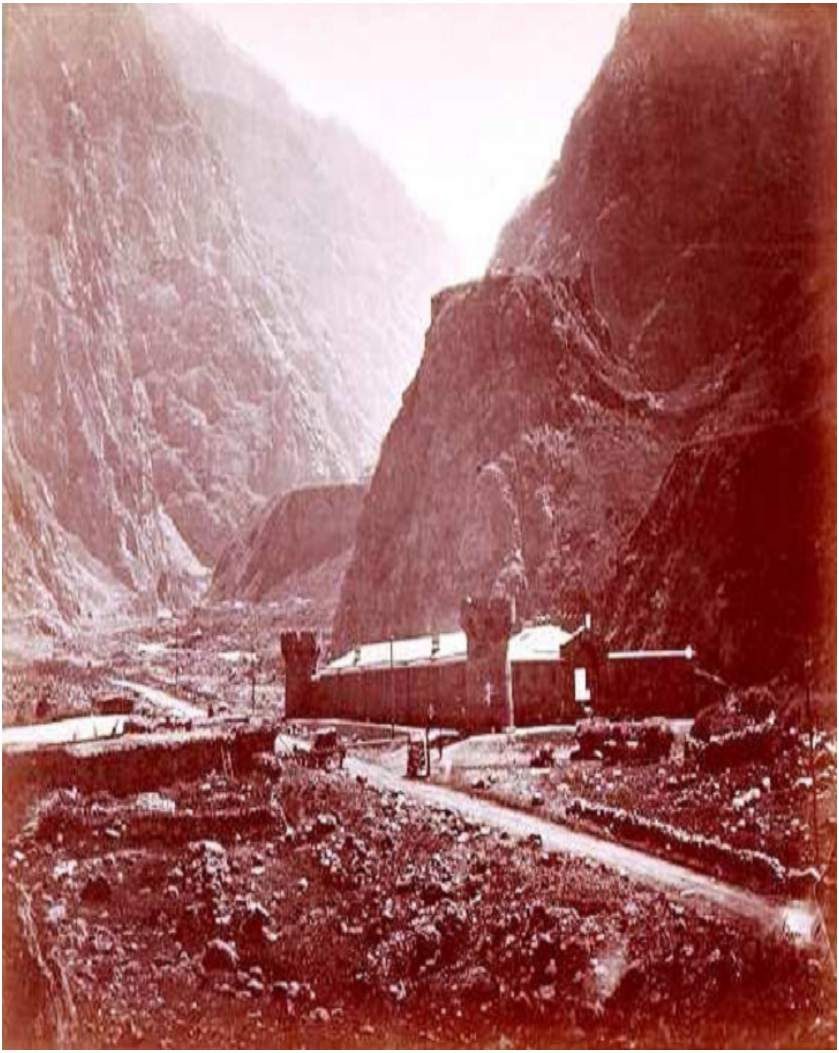

দার্‌য়াল গিরিখাত: একটি খোলা শামুকের খোলসের মত

http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Dariial%27skoe_na_voennogruzinskoi_dorogie_(A).jpg

এখানে উন্মুক্ত খোলসের আরো একটি ছবি রয়েছে যা এর **সাদাফাইন** الصدفين। আকৃতিকে ফুটিয়ে তুলছে অর্থাৎ দুই পাশ নিচ দিয়ে আটকানো এবং উপরের কাটা অংশ পৃথক। এরপর আরো দু'টি ছবি রয়েছে যেটা অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে **গিরিখাতের সাদাফাইন** الصدفين। অথবা খোলস আকৃতিকে তুলে ধরছে:

একটি খোলা শামুকের ছবি যেখানে এর সাদাফাইন দু'টি দেখা যাচ্ছে

১ নং চিত্র: গিরিখাতটিকে শামুকের দুই অংশের মত পরিষ্কার ভাবে দেখা যাচ্ছে

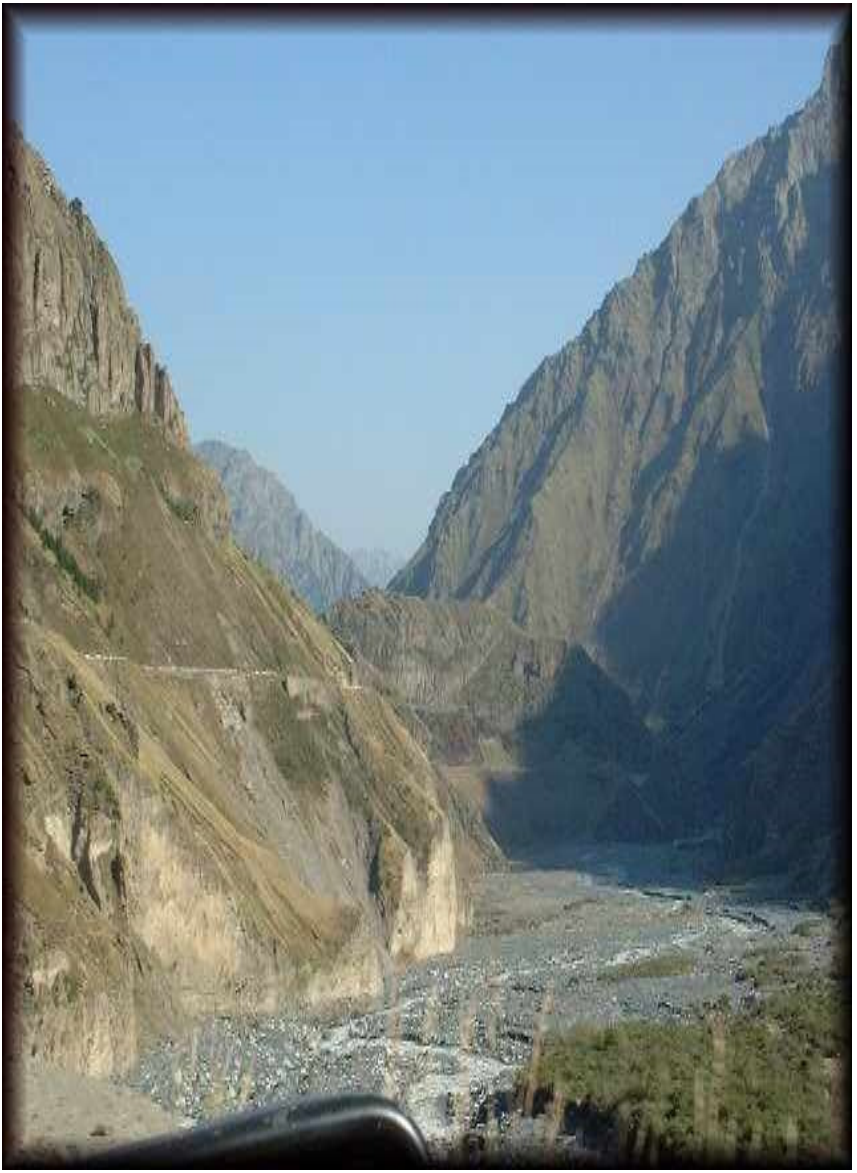

২ নং চিত্র: এখানেও গিরিখাতটিতে শামুকের দুই অংশের মত দেখা যাচ্ছে

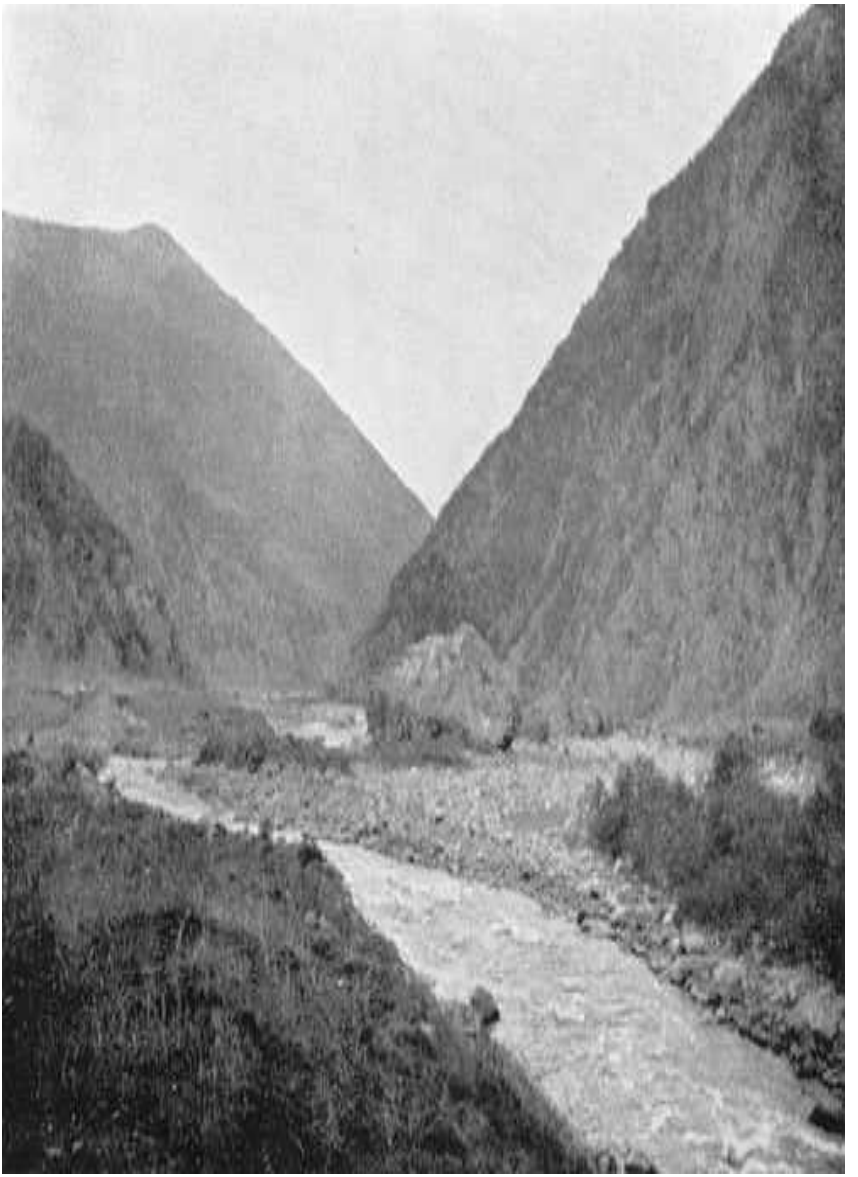

৩ নং চিত্র: আরও দূর থেকে নেয়া একটি চিত্র

এরপর, দক্ষিণ ককেশাস অঞ্চলে ব্যবহৃত একটা ভাষা আমাদেরকে খুঁজে বের করতে হবে যেটা তৎকালীন পরিচিত বিশ্বে এবং সে অঞ্চলের আশেপাশে ব্যবহৃত ভাষা থেকে আলাদা হবে। এটা আমাদেরকে করতে হবে কেননা যুলক্বার্নাইন সে অঞ্চলে পৌঁছান এবং এমন লোকদের সাক্ষাত পান যারা তাঁর ভাষা বুঝতে পারছিল না।

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِن دُونِهِمَا قَوْمًا لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا

তিনি (ভ্রমণ করতে থাকলেন) যতক্ষণ না তিনি দুই পর্বত প্রাচীরের মধ্যস্থলে পৌঁছলেন। তিনি সেখানে এমন এক জাতিকে পেলেন যারা তাঁর কথা খুব কমই বুঝত (এর মানে তাঁর ভাষাকে)।

[কাহাফ ১৮:৯৩]

এটা নিশ্চিত যে, ককেশাস পার্বত্য অঞ্চলে ব্যবহৃত **জর্জিয়ান** ভাষাই এ রকম একটা ভাষা। এটা একটা বিচ্ছিন্ন **প্রি-ইন্দো-ইউরোপীয়** ভাষা যে ভাষাতে অন্ততপক্ষে ৫০০০ বছর যাবত কোন গোত্র কথা বলেনি।

আমরা এখন সে সব লোকদেরকে খুঁজে বের করবো যারা ক্রমাগত তাদের দেশ ককেশাস পার্বত্য অঞ্চল ত্যাগ করে পবিত্র ভুমিতে স্থানান্তরিত হয়েছে বা বসতি স্থাপন করছে। পবিত্রভূমিকে (মুসলিম শাসন থেকে) "স্বাধীন" করার জন্যে কারা দায়ী, এবং পরে সেখানে ঐশ্বরিক আজ্ঞাবলে বহিষ্কৃত ইসরাঈলি ইহুদিদের, এই পবিত্রভূমি তাদের, এই দাবী নিয়ে, ফিরিয়ে আনার জন্যে কারা দায়ী, আমরা অবশ্যই তাদেরকে খুঁজে বের করবো।

ককেশাস পার্বত্য অঞ্চলে বসবাস করা এরকম লোক যাদের আমরা খোঁজ করছি তাদের অজেয় সামরিক ক্ষমতার ইতিহাস থাকতে হবে। (***"আমি আমার এক সৃষ্টিকে এতটা ক্ষমতাবান করেছি, আমি ছাড়া তাদের বিরুদ্ধে কেউ যুদ্ধ করতে পারবে না।"***) তারা তাদের ক্ষমতাকে সর্বত্র ছড়িয়ে দিবে এবং বিশ্বের সম্ভাব্য সকল সুবিধাজনক স্থান দখলের মাধ্যমে পৃথিবীকে তাদের নিয়ন্ত্রণে আনবে (***মিন কুল্লি হাদাবিন***)। তারা মানবজাতি থেকে আগত হতে হবে, তথাপি তাদেরকে এমন অনন্য ক্ষমতার অধিকারী হতে হবে যা তাদেরকে সমগ্র মানবজাতি থেকে আলাদা করে দিবে।

আমরা কি তাদের চিহ্নিত করতে পারি? যদি তা করতে পারি, তবে আমরা ইয়াজুজ ও মাজুজকে চিহ্নিত করতে পারবো।

যারা যায়োনিস্ট আন্দোলনের সূচনা করেছে তারা অবশ্যই পূর্ব ইউরোপীয় বংশোদ্ভুত। এরা ইহুদি ধর্ম গ্রহণ করেছিল। আমরা জানি যে **খাযার** গোত্র, যারা ককেশাস পার্বত্য অঞ্চলে বসবাস করতো, তারা যে কেবলমাত্র ইহুদি ধর্ম গ্রহণ করেছিল তাই নয়, সেই সাথে ইতিহাসও সৃষ্টি করেছিল যখন তারা সফলভাবে দিগ্‌বিজয়ী মুসলিম সেনাবাহিনীর পথ অবরোধ করেছিল, যারা ইউরোপ বিজয়ের পথে এখানে এসে থমকে দাঁড়ায়। আর এভাবেই তারা পৃথিবীর বিদ্যমান সবার তুলনায় বেশী শক্তিশালী সামরিক ক্ষমতার অধিকারী ছিল। মুসলিম সেনাবাহিনী এমনই এক প্রতিরোধের মুখোমুখি হয়েছিল যখন তারা সবেমাত্র পারস্য ও বাইযান্টাইন (তৎকালীন বিশ্বের দু'টি পরাশক্তি) সাম্রাজ্য দু'টি বিজয় করেছিল। এতে প্রতীয়মান হয় যে **খাযার**দের সামরিক ক্ষমতা ছিল অনন্য (দেখুন কেভিন অ্যালেনের *Kevin Alan* পান্ডিত্যপূর্ণ লেখা *The Jews of Khazaria*, আরো দেখুন ওয়েবসাইট *www.khazaria.com*)।

আমাদের জন্যে এটা প্রয়োজনীয় নয় যে, সেই সকল **খাযার'** বংশোদ্ভুত ইহুদিদের সমীক্ষা চালাব, যারা ক্রমাগত ককেশাস পার্বত্য অঞ্চল ছেড়ে চলে যাচ্ছে। আমাদের জন্যে প্রয়োজনীয় হলো ঐ সব লোকদেরকে চিহ্নিত করা যারা যুলক্বার্নাইনের নির্মিত প্রাচীরের নিকট অঞ্চল থেকে পবিত্রভূমির উদ্দেশ্যে যাত্রা করছে। ইসরাঈলি ইহুদিরা যে সকল স্থানে বসবাস করতো (বিশেষভাবে মুসলিম বিশ্বে) সেখান থেকে তাদেরকে পবিত্রভূমিতে ফিরে আসতে প্রলুব্ধ করার জন্যে দায়ী হলো এই ইউরোপীয় অথবা ককেশীয় ইহুদিরা।

তাই আমাদের উপসংহার হচ্ছে, ইয়াজুজ ও মাজুজরা পূর্ব ইউরোপের **খাযার**দের মাঝে অবস্থিত। এদের অনেকেই ইহুদি ধর্ম গ্রহণ করেছিল এবং এটা নিশ্চিত যে, এদের অনেকে খ্রিস্টান ধর্মেও দীক্ষিত হয়েছে, এবং রহস্যময় ইউরোপীয় ইহুদি-খ্রিস্টান **মিত্রতা**কে দাড় করাতে পেরেছে, যেকাজটা তাদের জন্যে এককালে খুব তিক্ত ছিল। এটা সম্ভব হয়েছে কারণ খাযাররা উভয় ধর্মের মধ্যে উপস্থিত ছিল। সম্ভবত এটা কুর'আনিক আয়াতের অর্থের আওতাভুক্ত যেখানে বলা হয়েছে, ইয়াজুজ ও মাজুজরা একে অপরের সাথে মিলিত হবে যেমন করে তরঙ্গ একে অপরের সাথে মিলিত হয় (**ইয়ামুজু ফি বা'দ**)।

কিন্তু আয়াতটি আরো বলেছে, তারা একদিন একে অপরের সাথে মহা সংঘর্ষে লিপ্ত হবে যেমনভাবে স্ফীত তরঙ্গ একে অপরের উপর আছড়ে পড়ে। টাইটানদের সেই যুদ্ধ সকল যুদ্ধের সেরা যুদ্ধ হিসেবে আখ্যায়িত হবে। ফলশ্রুতিতে, শিঙ্গায়

ফুৎকারের ক্ষণ এসে পড়বে যা শেষ সময়ের আগমন বার্তা ঘোষণা করে দিবে। এই বইয়ে নবী (সাঃ)-এর হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে, যেখানে তাদের আকাশে তীর নিক্ষেপের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে (দেখুন ইয়াজুজ ও মাজুজের জীবনচিত্র বা জীবনআলেখ্য)।

ইয়াজুজ ও মাজুজ ইঙ্গ-মার্কিন-ইসরাঈলি চক্র এবং রাশিয়ান জোট দু'টির মধ্যেই রয়েছে, এবং দু'টিকে এক মহা সংঘর্ষের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, যা দু'টিকেই ধ্বংস করে দিবে

আমরা এই বইয়ের প্রথম সংস্করণে ইয়াজুজকে ইঙ্গ-মার্কিন-ইসরাঈলি যায়োনিষ্ট চক্র এবং মাজুজকে রাশীয়ান জোট বলে অভিহিত করেছিলাম। এখানে আমরা সেটার সংশোধন করতে চাই। আমরা এতদিনে বুঝতে পেরেছি, আসলে ইয়াজুজ ও মাজুজ দু'টি জোটের মধ্যেই কাজ করছে, এবং দু'টিকেই এক সংঘর্ষের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, যার পরিণতিতে তারা একে অন্যকে ধ্বংস করবে। কিন্তু এটা প্রনিধানযোগ্য যে ইয়াজুজ ও মাজুজ এই সংঘর্ষের পরেও বেঁচে যাবে এবং সর্বশক্তি লাগিয়ে ইসরাঈলকে পৃথিবীর নিয়ন্তা-রাষ্ট্রে পরিণত করবে।

আমরা ব্যাখ্যা করেছি "তীর" নিক্ষেপের মানে হলো এই যে, ইয়াজুজ ও মাজুজের কাছে **তারকা যুদ্ধ** পরিচালনা করার প্রযুক্তি রয়েছে। রাশিয়া এবং পশ্চিমা জোট উভয়ই **তারকা যুদ্ধ** আরম্ভ করার ক্ষমতা সম্পন্ন।

আরও নিশ্চিত প্রমাণ রয়েছে যে আধুনিক রাশিয়ার উৎপত্তি খাযার গোত্র থেকে। অন্যদিকে ইয়াজুজরা অবশ্যই পশ্চিমা ইউরোপীয় খ্রিস্টানদের মাঝে অবস্থিত। এরাই নাটকীয়ভাবে খাযার ইহুদিদের সাথে একত্রিত হয়ে পশ্চিমা মিত্রতা তৈরী করেছে যার নিয়ন্ত্রণে রয়েছে ব্রিটেন ও আমেরিকা।

আমাদের চিহ্নিতকরণ যদি সঠিক হয়ে থাকে, তবে ইয়াজুজ ও মাজুজের মধ্যাকার আসন্ন **তারকা যুদ্ধ** হবে রাশিয়া এবং ইঙ্গ-মার্কিন-ইসরাঈলি চক্রের মধ্যাকার সংঘর্ষ। ইয়াজুজ ও মাজুজের মধ্যাকার এ দানবীয় পরমাণু যুদ্ধের পরিণতি হবে ধোঁয়া বা দুখান (দেখুন আল-কুর'আন, দুখান ৪৪:১০-১১) যা উল্লেখযোগ্য হারে পৃথিবীর জনসংখ্যা হ্রাস করে দিবে এবং পৃথিবীর বিশাল এলাকাকে নিরস মরুভূমিতে পরিণত করে দিবে। এটা আর খুব বেশি দূরে নেই। সূরা কাহাফে এরকম একটা সতর্কবাণী পেশ

করা হয়েছে (কাহাফ ১৮:০৮): "এক সময় আমি একে বিরান, নিরস মরুভূমিতে পরিণত করবো।" আমরা নিচের হাদীসটি বিবেচনা করতে পারি:

> এমন একটা যুদ্ধ হবে যা আগে কখনো দেখা যায়নি। এমনকি যদি কোন পাখিকে তাদের সৈন্যবাহিনী অতিক্রম করতে হয় সে তাদের শেষ জনে পৌঁছানোর আগেই মারা পড়বে।
>
> [সহীহ মুসলিম ও মুসনাদ আহমাদ]

বাহ্যত সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে মদদ দেবার অভিযোগে পাকিস্তানকে আক্রমণ আসন্ন। এর আসল উদ্দেশ্য হলো সে দেশের পরমাণু প্লান্টগুলিকে ধ্বংস করা। এর ফলে রাশিয়ার বদ্ধমূল ধারণা হবে যে, সেও একই ভাগ্যবরণ করতে যাচ্ছে, যদি সে পশ্চিমাদের (*NATO*) বেষ্টন ও ভীতির বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ না নেয়। আর এই আশংকাই জন্ম দিবে চূড়ান্ত যুদ্ধের প্রস্তুতি। আর এই প্রেক্ষিতে আমরা নবী (সাঃ)-এর *NATO*-র নিয়ন্ত্রণ থেকে কন্সট্যানটিনোপল (আধুনিক নাম ইস্তাম্বুল) বিজয়ের ভবিষ্যদ্‌বাণীকেও উপলব্ধি ও অনুমান করতে পারি।

নবী (সাঃ) বলেছেন:

> لتفتحنّ القسطنطينية فلنعم الأمير اميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش
>
> নিশ্চয়ই তোমরা কন্সট্যানটিনোপল জয় করবে। তার আমির কত উত্তম আমির হবে, আর কত উত্তম সেনাবাহিনী হবে সেই সেনাবাহিনী।
>
> [সহীহ বুখারী ও মুসনাদ আল আহমাদ]

রাশিয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত লক্ষ্য হচ্ছে পশ্চিমাদের সাথে যে কোন লড়াইয়ের বিনিময়ে কন্সট্যানটিনোপল জয় করা যেটা রাশিয়ান নৌবাহিনীর পক্ষে ভূমধ্যসাগরে এবং ইসরাঈলে প্রবেশের পথ করে দিবে। খুব সম্ভব সেই বিজয় সম্পন্ন হবে মুসলিমদের সাথে রোমের (রাশিয়া) মিত্রতার মাধ্যমে যেমনটির ভবিষ্যদ্‌বাণী নবী (সাঃ) করেছেন।

কুর'আন যেহেতু يَأْجُوج ইয়াজুজ শব্দটি কর্তৃবাচ্য হিসেবে এবং مَأْجُوج মা'জুজ শব্দটি কর্মবাচ্য হিসেবে ব্যবহার করেছে, এর নিহিতার্থ হতে পারে যে, সেই যুদ্ধে (*Armageddon*) ইয়াজুজ চূড়ান্তভাবে মাজুজের উপর বিজয়ী হবে অর্থাৎ পশ্চিমা **ইঙ্গ-মার্কিন-ইসরাঈলি চক্র** রাশিয়ার উপর বিজয়ী হবে। যার ফলস্বরূপ ইয়াজুজ ও মাজুজ উভয়েরই পারস্পরিক ধ্বংস সাধিত হবে।

ইয়াজুজ ও মাজুজের মধ্যাকার আসন্ন **তারকা যুদ্ধের** সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নিহিতার্থ ইসরাঈল ও পবিত্রভূমির সাথে সম্পৃক্ত। সেই যুদ্ধের পর ইসরাঈল সম্পূর্ণ প্রতিরক্ষাহীন হয়ে পড়বে, কেননা সেই যুদ্ধে মাজুজের উপর ইয়াজুজদের সম্ভাব্য বিজয় হলেও বিজয়ী পক্ষকেও অক্ষম বানিয়ে ছাড়বে। আমরা অনুমান করতে পারি যে, সেই পরমাণু যুদ্ধ আরম্ভ হলে আধুনিক বিশ্বের অত্যাধুনিক ইলেকট্রনিক ক্ষমতা সম্পন্ন সামরিক প্রযুক্তি ধ্বসে পড়বে (সম্ভবত, পরমাণুর তেজস্ক্রিয় বিকিরণের ফলে)। আর সম্ভবত ঠিক সেই সময় বিশ্ব নবী (সাঃ)-এর ভবিষ্যদ্‌বাণীর বাস্তবায়ন দেখা যাবে, যেখানে বলা হয়েছে মুসলিমরা পবিত্রভূমিকে ইহুদিদের নিপীড়ন নির্যাতন থেকে মুক্ত করবে।

> আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন: নবী (সাঃ) বলেছেন: "খোরাসান (আফগানিস্তান, উত্তর পশ্চিম পাকিস্তান, ইরান, ও মধ্য এশিয়ার কিছু অংশ নিয়ে গঠিত অঞ্চল) থেকে কালো পতাকা বেরিয়ে আসবে এবং কোন শক্তি তাদেরকে (জেরুযালেম) পৌঁছান পর্যন্ত আটকাতে পারবে না।"
>
> [সুনান তিরমিযী]

> আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন: নবী (সাঃ) বলেছেন: "মুসলিমরা ইহুদিদের সাথে যুদ্ধ করা না পর্যন্ত শেষ সময় আসবে না। মুসলিমরা ইহুদিদের হত্যা করতে থাকবে এবং এমন অবস্থা আসবে যে, ইহুদিরা একটি গাছ বা (বড়) পাথরের আড়ালে লুকাবে এবং গাছ বা পাথর বলবে: হে মুসলিম! হে আল্লাহ্‌র বান্দা! আমার পিছনে ইহুদি (লুকিয়ে) আছে, আসো এবং তাকে হত্যা করো ...।"
>
> [সহীহ মুসলিম]

উইন্‌স্টন চার্চিল ইয়াজুজ ও মাজুজকে চিহ্নিত করেছেন

উইন্‌স্টন চার্চিল আসন্ন রাশিয়া এবং পশ্চিমা **ইঙ্গ-মার্কিন-ইসরাঈলি চক্রের** মধ্যাকার শীতল যুদ্ধের অনুমান করেছিলেন (ইসরাঈল তখনও সৃষ্টি হয়নি)। তিনি বলেছিলেন যে, আসন্ন যুগগুলিতে এই শীতল যুদ্ধ বিশ্ব রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করবে। ১৯৪৬ সালের ৫ই মার্চে ফুলটন, মিযুরির (*Fulton, Missouri*) ওয়েস্টমিন্‌স্টার কলেজে (*Westminster College*) তিনি *লৌহ প্রাচীর* (the Iron Curtain Speech) খ্যাত বক্তৃতাটি দেন। সেখানে তিনি ঘোষণা করেছিলেন: "বাল্টিকের (*Baltic*) স্টেটিন (*Stettin*) থেকে আদ্রিয়াটিকের (*Adriatic*) ট্রিস্টে (*Trieste*) পর্যন্ত লোহার পর্দা (*iron curtain*) সমগ্র মহাদেশের উপর নেমে এসেছে।" আমাদের খেয়াল রাখতে হবে, এই

লৌহ প্রাচীরের (*iron curtain*) সাথে যুলক্বার্নাইনের লোহার প্রাচীরের অদ্ভূত একটা মিল রয়েছে।

১৯৫১ সালের ৯ই নভেম্বর উইন্স্টন চার্চিল গিল্ডহলে (*Guildhall*) লন্ডনের লর্ড মেয়রের ব্যংকুয়েট আরেকটি বক্তৃতা দেন। ইয়াজুজ ও মাজুজদের প্রতিকৃতিগুলিকে (মূর্তিগুলিকে) তাদের চিরায়ত সম্মানের জায়গা লন্ডনের গিল্ডহলের পশ্চিমের শেষভাগে পুনঃস্থাপনের অনুষ্ঠান চলছিল। বিমান আক্রমণের ফলে যাতে ধ্বংস না হয়ে যায় সেই জন্যে প্রতিকৃতিগুলিকে সরিয়ে ফেলা হয়েছিল। আগের প্রতিকৃতিগুলি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল **১৬৬৬** সালের লন্ডনের মহা অগ্নিকান্ডে। বর্তমানের জোড়াটি রিচার্ড সনডারস্ (*Richard Saunders*) **১৭০৮** সালে খোদাই করেছিলেন। এই অনুষ্ঠানে উইন্স্টন চার্চিল বিশ্ব নিয়ন্ত্রণকারী দুই শক্তিকে ইয়াজুজ ও মাজুজ হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন অর্থাৎ একদিকে **ইঙ্গ-মার্কিন-ইসরাঈলি চক্র** এবং অন্যদিকে **রাশিয়া**। তিনি বলেছিলেন:

> It seems that they (i.e. Gog and Magog) represent none too badly the present state of world politics. World politics, like the history of Gog and Magog, are very confused and much disputed. Still, I think there is room for both of them. On the one side is Gog, and on the other is Magog. But be careful, my Lord Mayor, when you put them back, to keep them from colliding with each other; for if that happens, both Gog and Magog would be smashed to pieces and we should all have to begin all over again and begin from the bottom of the pit.

> অর্থাৎ, এটা মনে হচ্ছে তারাই (ইয়াজুজ ও মাজুজ) বর্তমানে বিশ্ব রাজনীতির চালিকা শক্তি। ইয়াজুজ ও মাজুজের ইতিহাসের মতো বিশ্ব রাজনীতি খুবই ঘোলাটে ও বিবদমান। তবু, আমি মনে করি তাদের উভয়ের এতে স্থান রয়েছে। একদিকে ইয়াজুজ এবং আরেক দিকে মাজুজ। কিন্তু মাননীয় লর্ড মেয়র, আপনি যখন এগুলিকে তাদের জায়গায় ফেরত রাখবেন, সতর্ক হউন, যেন এগুলি একে অন্যের সাথে ঠক্কর না খায়, যদি তা হয় তাহলে এগুলি ভেঙ্গে গুঁড়া হয়ে যাবে। তখন আমাদেরকে আবার একেবারে গোড়া থেকে শুরু করতে হবে।

> [*The Times*, লন্ডন, **১০**ই নভেম্বর, **১৯৫১**]

ছয় - ইয়াজুজ-মাজুজকে কী বিশ্বে ছেড়ে দেয়া হয়েছে?

যারা জিদ ধরে বসে আছে যে ইয়াজুজ ও মাজুজরা এখনো বিশ্বে মুক্ত হয়নি, তারা এটা অস্বীকার করতে পারবে না যে তাদের এই দাবীর অবশ্যম্ভাবী ফল দাঁড়াচ্ছে যে, মহান আল্লাহ্ এখনো যুলক্বার্নাইনের প্রাচীরকে ধ্বংস করে দেননি। এরূপ সন্দেহ পোষণকারীদের এটা ধর্মীয় দায়িত্ব যে, তারা যুলক্বার্নাইনের প্রাচীরের অনুসন্ধান করে বলুক যে, তাদের দাবী অনুযায়ী প্রাচীরটি এখনো দাঁড়িয়ে আছে।

ইয়াজুজ ও মাজুজরা যে নবী (সাঃ)-এর জীবদ্দশাতেই মুক্তি পেয়েছে এবং তারা সমানে এগিয়ে আসছে এই দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থনে এই বইটিতে এবং *Jerusalem in the Qur'ān* বইটিতে পেশ করা সকল যুক্তিকে কিছু লোক একগুঁয়েমির সাথে প্রত্যাখ্যান করবে বলে আমরা মনে করি। এরা এই দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থনে এই বইটিতে পেশ করা কুর'আন ও হাদীসের উপর প্রতিষ্ঠিত সকল যুক্তিকে পাত্তা না দেয়ার পথ বেছে নেবে। কুর'আন ও হাদীসকে নিজেদের স্বকল্পিত অপব্যাখ্যার মাধ্যমে তারা এরূপ আচরণ প্রদর্শন করবে।

এরূপ সন্দেহবাদীদের দৃষ্টি সরাসরি আকর্ষণ করে আমরা এই অধ্যায়টি আরম্ভ করছি। আমরা বলতে চাই যে, কুর'আনে প্রতিষ্ঠিত পরিষ্কার অকাট্য ও অলঙ্ঘনীয় বাস্তবতা হলো, যুলক্বার্নাইন একটি লোহার প্রাচীর নির্মাণ করেছিলেন এবং তার উপর তিনি গলিত তামার প্রলেপ দিয়েছিলেন। এই প্রাচীর নির্মাণের ফলস্বরূপ ইয়াজুজ ও মাজুজরা সফলভাবে আটকে পড়েছিল, না পারতো তারা একে খনন করতে আর না পারতো এর উপর আরোহণ করতে। কুর'আনে অকাট্যভাবে আরো বলা হয়েছে যে, মহান আল্লাহ্ নিজেই একদিন এই প্রাচীরকে সমান করে দিবেন অর্থাৎ ধ্বংস করে দিবেন এবং তখনই ইয়াজুজ ও মাজুজরা বিশ্বে মুক্তি পাবে।

যারা জিদ ধরে বসে আছে ইয়াজুজ ও মাজুজরা এখনো বিশ্বে মুক্ত হয়নি, তারা অস্বীকার করতে পারবে না যে, তাদের এই দাবীর মানে হলো মহান আল্লাহ্ এখনো যুলক্বার্নাইনের প্রাচীরকে ধ্বংস করে দেননি।

www.islamfind.wordpress.com

প্রাচীরের সন্ধানে

এই বইটি জোর দিচ্ছে, এরূপ সন্দেহ পোষণকারী লোকদের উপর এটা ধর্মীয় দায়িত্ব যে, তারা যুলক্বার্নাইনের প্রাচীরের অনুসন্ধান করে প্রমাণ করুক যে তাদের দাবী অনুযায়ী প্রাচীরটি এখনো দাঁড়িয়ে আছে। তারা যদি এই অনুসন্ধানের জন্য কোন রকম প্রচেষ্টা না চালায়, তবে কুর'আনের প্রতি তাদের এই অদ্ভূত অবহেলা কিভাবে বৈধ, তার ব্যাখ্যা তাদের দিতে হবে। তাদেরকে আরো ব্যাখ্যা দিতে হবে, কেন হাজার বছরের অধিক সময় ধরে কেউ কখনো এই প্রাচীর প্রত্যক্ষ করেনি। উপরন্তু তারা আমাদেরকে আরো জানাবে যে, তারা কি কখনো এরূপ অনুসন্ধানে নেমেছিল? আর যাই হোক, এটা এমন যুগ যেখানে আমাদের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা এক নজিরবিহীন পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। আজ স্যাটেলাইট প্রযুক্তি আক্ষরিকভাবেই পৃথিবীর প্রতি ইঞ্চির ছবি তোলাকে সম্ভব করেছে (দেখুন, *Google Earth*)।

ইবনে কাসিরের **আল বিদায়া ওয়ান নেহায়া**তে (এর অর্থ, শুরু থেকে শেষ) উদ্ধৃত আরেকটি হাদীসের আলোকে, যুলক্বার্নাইনের প্রাচীরের এরূপ অনুসন্ধান করা প্রকৃতপক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সেখানে আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে নবী (সাঃ) বলেছেন:

> ইয়াজুজ ও মাজুজরা প্রত্যেকদিন প্রাচীর খনন করতে চেষ্টা করে। যখন এর মধ্য দিয়ে সূর্যালোক দেখা যায় তখন তাদের উপর নিয়োজিত একজন বলে, "ফিরে চলো, কাল তোমরা খনন করতে পারবে।" যখন তারা ফিরে আসে তখন প্রাচীরটি আগের চেয়ে আরো বেশি শক্তিশালী হয়ে যায়। এটা চলতে থাকবে যতক্ষণ না তাদের সময় আসছে আর আল্লাহ্ তাদের মুক্ত করে দিচ্ছেন। এই মুক্তির সময় আসলে, তারা আবার খনন করতে থাকবে যতক্ষণ না সূর্যালোক দেখা যায়, তখন তাদের উপর নিয়োজিত একজন বলবে, "ফিরে চলো কাল তোমরা খনন করতে পারবে, ইনশাআল্লাহ্।" এই ক্ষেত্রে তারা ইনশাআল্লাহ্ বলে ব্যতিক্রম করবে আর বিষয়টিকে আল্লাহ্র দিকে সম্পর্কিত করবে। তারা পরবর্তী দিন ফিরে আসবে এবং গর্তটিকে যেমন রেখে গিয়েছিল তেমনই পাবে। তারা (এভাবে) গর্ত খনন করতে থাকবে এবং (একদিন) মানুষের বিরুদ্ধে বেরিয়ে আসবে।
>
> [সুনান তিরমিযী, ইবনে মাযাহ, মুসনাদ আহমাদ]

যারা একগুঁয়েমির সাথে দাবী করে, প্রাচীরটি আজও দাঁড়িয়ে আছে (যেহেতু তারা মনে করে, ইয়াজুজ ও মাজুজরা বিশ্বে আজও মুক্ত হয়নি), এই হাদীসে তাদের জন্যে চরম তাৎপর্য রয়েছে। হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী, প্রাচীরটি যেকোন সময়ের তুলনায় আজ আরো বেশি শক্তিশালী হওয়ার কথা। এ কারণে এটা সনাক্ত ও চিহ্নিত করা কঠিন হবেনা। দ্বিতীয়ত, প্রাচীরটি যখন তারা সনাক্ত করবে তখন তাদেরকে আর ইয়াজুজ ও মাজুজেরও খোঁজ করতে হবেনা। হাদীস অনুসারে, ইয়াজুজ ও মাজুজরা প্রাচীর খনন করতে তো নিজেরাই প্রতিদিন আসবে। ইয়াজুজ ও মাজুজরা নিজেরা খনন করছে, সেটা দেখতে তাদের উচিত যুলক্বার্নাইনের প্রাচীরের অনুসন্ধানে বেরিয়ে পড়া। এটাই কি আমাদের সমালোচনা দূর করার জন্যে যথেষ্ট নয়?

এরূপ প্রত্যাখ্যানকারীরা যদি প্রস্তুতি না নেয় এবং যুলক্বার্নাইনের প্রাচীরের সন্ধানে বের না হয়, যেটা তাদের মতে আল্লাহ্‌র পৃথিবীতে এখনো দাঁড়িয়ে রয়েছে, তাহলে তারা ভুল করবে। এবং যদিও হাজার বছরের বেশি সময় ধরে কেউই সেটা প্রত্যক্ষ করেনি, তবুও তার কোন ব্যাখ্যা দিতে না পারা তাদের একটা বড় ভুল হবে। এবং সেই সাথে প্রাচীরটি ইতোমধ্যেই সমান বা ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে ও ইয়াজুজ ও মাজুজকে এই বিশ্বে মুক্ত করে দেয়া হয়েছে, এই দৃষ্টিভঙ্গিকে একগুঁয়ে জেদীর মতো কেবল প্রত্যাখ্যান করতেই থাকে, তবে আমরা আমাদের সুপ্রিয় পাঠককে উপদেশ দেবো এই সমস্ত সমালোচনাকে বাজে, মূর্খতাপূর্ণ এবং বিবেচনার অযোগ্য মনে করতে। যে সব পাঠক আমাদের এই উপদেশ প্রত্যাখ্যান করবে এবং জোর দিয়ে মনে করবে প্রাচীর দাঁড়িয়ে রয়েছে, এবং তাদের এই দৃষ্টিভঙ্গির মাঝে কোন বিশেষত্ব রয়েছে, তবে তাদের নিজেদেরকে ব্যাখ্যা করতে হবে কেন তারা এই প্রাচীরের সন্ধানে বের হচ্ছে না।

বর্তমানের আজব পৃথিবী

আমরা এখন বর্তমানের আজব পৃথিবীর পর্যবেক্ষণ করবো এবং একে ব্যাখ্যা করার প্রতি জোর দেবো। আমাদের সমালোচকেরা যদি আজকের আজব আধুনিক যুগের বাস্তবতার কোন ব্যাখ্যা দিতে না পারে, তবে ইয়াজুজ ও মাজুজ সম্পর্কে আমাদের এই বইয়ে যে ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে তাকে বাতিল বা মিথ্যা মনে করতে পারবে না।

মানব ইতিহাসে প্রথমবারের মতো একটি জাতি সমগ্র পৃথিবী, অর্থাৎ এর মুদ্রা, রাজনীতি, আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী, অর্থনীতি, বাজার, সংস্কৃতি, খাদ্য, খবর, খেলাধুলা, যোগাযোগ, বিনোদন, ফ্যাশন, এবং ভ্রমণ ইত্যাদির উপর সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব ও

নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছে। তারা চরম ক্ষমতার অধিকারী, যা ক্রমশ আরো শক্তিশালী হচ্ছে এবং তাদের প্রতিদ্বন্দ্বি সম্ভাব্য এমন কোন মিলিত শক্তি নেই যারা তাদের চ্যালেঞ্জ করতে পারে। উপরন্তু, এমন কোন নিরপেক্ষ প্রমাণও নেই যে, সমগ্র বিশ্বের উপর তাদের ক্ষমতাময় থাবাকে কেউ সফলভাবে চ্যালেঞ্জ জানাতে পেরেছে।

পৃথিবীকে শুধু নিয়ন্ত্রণই নয়, তারা এর চেয়েও বেশি ক্ষমতাবান। তারা একে (পৃথিবী) নিজেদের মন মতো পরিবর্তন করছে। বহু যুগ ধরে লালিত প্রাচীর এবং মানুষের চমৎকার সামাজিক বৈচিত্র, যা মানুষকে একে অপর থেকে আলাদা করে রাখতো, সেগুলিকে তারা তছনছ করে দিয়েছে। মানবজাতিকে তারা এমনভাবে বিশ্বায়িত করেছে যে, মানব ইতিহাসে প্রথমবারের মতো এক ঈশ্বরহীন বিশ্বব্যাপী সমাজ আবির্ভূত হয়েছে।

তারা আধুনিক পশ্চিমা ধর্মনিরপেক্ষ সভ্যতা এবং ইউরোপীয় বিশ্ব-ব্যবস্থা তৈরী করেছে যেন এগুলি তাদের লক্ষ্যে পৌঁছানোর মাধ্যম হিসেবে কাজ করতে পারে। অদম্য বৈজ্ঞানিক, প্রযুক্তি, উৎপাদন শিল্প, তথ্য প্রযুক্তি ও **যৌন বিপ্লবের** (পর্ণোগ্রাফি যার একটা অংশ) মাধ্যমে তারা সমাজকে এমনভাবে আলোড়িত করেছে যে, নিকট অতীতকেও এখন **সেকেলে** মনে হয়। তারা নতুন ও সর্বাধুনিক (*latest*) পণ্যসামগ্রী, ফ্যাশন অথবা স্টাইলকে সর্বোত্তম বা *best* হিসেবে সাদরে গ্রহণ করার পথ তৈরী করেছে। তাদের জীবনযাত্রাকে সর্বোত্তম উন্নতির পরিচায়ক হিসেবে গোটা মানবজাতির স্বীকৃতি পেতে তারা সফল হয়েছে।

ক্রমাগত তারা নিজেদেরকে পরিবর্তিত, বিকশিত এবং নতুনভাবে আবিষ্কার করছে। আর এভাবেই তারা তাদের সাথে সমগ্র মানবতাকে ঈশ্বরহীন সমাজে পরিবর্তিত করতে থাকবে যতক্ষণ না সবাই তাদের কার্বন কপি-তে পরিণত হচ্ছে। কিন্তু এই জীবনযাত্রা হচ্ছে মানবতা এবং সামাজিক স্থিতিশীলতার জন্যে ক্ষয়িষ্ণু ও ধ্বংসাত্মক প্রকৃতির। নারীদেরকে তারা চরিত্রহীনা করেছে। তাদের পরনের কাপড় এমন পরিসরে উঠিয়ে দেয়া হয়েছে যে, এখন তারা পোশাক পরিধান করা সত্ত্বেও উলঙ্গ। (অনেক কিছুর মাঝে) পুরুষেরা নগ্নতার প্রতি এতটাই আকৃষ্ট হয়েছে যে, শেষ পর্যন্ত একটা যৌনবিপ্লব সংঘঠিত হবে যার ফলে যৌনমিলন সূর্যের আলোর ন্যায় সহজলভ্য হয়ে যাবে। বিবাহ এখন সেকেলে হয়ে গেছে, অধিকাংশ শিশুই এখন বিবাহ বহির্ভূতভাবে বা অবৈধভাবে জন্ম নিচ্ছে। যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা ও অবাধ যৌনাচারপূর্ণ জীবনযাত্রাকে ব্যাপকভাবে লোকজন আলিঙ্গন করছে। যৌনচাহিদা ও আকাঙ্ক্ষাকে তারা এমন পর্যায়ে নিয়ে গেছে

যে যৌনহয়রানি ও ধর্ষণ এখন সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাড়িয়েছে। ফলস্বরূপ, যৌনকামনার অতৃপ্ত পিপাসার জন্যে তারা আর স্বাভাবিক ব্যক্তিগত যৌনসম্পর্কের মাঝে তৃপ্তি খুঁজে পাচ্ছে না, বরং *public* বা জনসম্মুখে যৌনমিলন সংঘঠিত হচ্ছে এবং শীঘ্রই লোকজন গাধার ন্যায় জনসম্মুখে যৌনমিলন আরম্ভ করে দিবে। উপরন্তু নারী-পুরুষের স্বাভাবিক যৌনসম্পর্ক তাদের যৌনকামনাকে আর মেটাতে পারছে না, তাই তার স্থান দ্রুত দখল করে নিচ্ছে পুরুষ সমকামিতা *homosexuality* ও নারী সমকামিতা *lesbianism*।

তারা তৈরী করেছে গগনচুম্বি অট্টালিকা, অত্যাধুনিক **ম্যানহাটন**, যা বাকি বিশ্বের খালি পায়ের বেদুইনদেরকে উঁচু ভবন তৈরীর প্রতিযোগিতায় লিপ্ত করেছে।

তাদের সফলতা এতটাই চাকচিক্যময় যে, খ্রিস্টান, ইহুদি, বৌদ্ধ, হিন্দু অথবা ইসলাম, যে ধর্মেরই হোক না কেন, মুসলিমসহ সমগ্র মানবজাতি তাদের ক্ষয়িষ্ণু, ধর্মনিরপেক্ষ এবং বাস্তবিকপক্ষে ঈশ্বরহীন জীবনযাত্রাকে অনুকরণ ও অনুসরণ করছে। মুসলিমদের উদ্দেশ্যে নবী (সাঃ) ভয়াবহ সতর্কবাণী করেছেন: "তোমরা তাদেরকে পদে পদে অনুসরণ করবে এমনকি গিরগিটির গর্তে প্রবেশ করলেও ...।" **- সহীহ বুখারী**

ইহুদী খ্রিস্টান চক্র বা মিত্রতা

ইউরোপীয় ইহুদি-খ্রিস্টানরা তাদের মধ্যাকার ঘৃণা ও বিদ্বেষের সম্পর্ককে আজ একটা আজব মিত্রতায় দাঁড় করিয়েছে। তারা এখন একে অপরের আজব পারস্পরিক মিত্র ও বন্ধুতে পরিণত হয়েছে। তারা বিশ্বের শাসকে পরিণত হয়েছে, আর ইতিহাসে এটা একটি অনন্য ঘটনা। তারা বৈষম্যমূলক বিশ্ব-ব্যবস্থা তৈরী করেছে যেটা সাধারণভাবে অইউরোপীয়দের জন্যে অশুভ, এবং বিশেষভাবে আরব ও মুসলিমদের জন্যে ভয়ানক, যারা নির্ভীকভাবে তাদের বৈষম্যমূলক দেশপ্রেম, বিশ্বায়ন, অন্যায় এবং নির্যাতনের প্রতিরোধ করছে। তাদের বিশ্ব-ব্যবস্থা নিষ্ঠুর অত্যাচারের যুদ্ধ আরম্ভ করেছে যাতে পৃথিবীর সকল অইউরোপীয় দেশ দখল করা যায়। উত্তর আমেরিকা, আফ্রিকার দক্ষিণ অংশ, অস্ট্রেলিয়া ইত্যাদি স্থানে সারা পৃথিবী এ রকম জাতি উচ্ছেদ প্রত্যক্ষ করেছে। এ রকম নিষ্ঠুরতা কেবলমাত্র তাদের দ্বারাই সংঘঠিত হতে পারে ***যাদের অন্তর পশুর মতো, যে অন্তরে খ্রিস্টান বা ইহুদি ধর্মের প্রতি সরিষার দানা পরিমাণ বিশ্বাস নেই।***

বাদবাকি বিশ্বের উপর কর্তৃত্বকারী ইউরোপীয় ইহুদি-খ্রিস্টান শাসন ব্যবহৃত হচ্ছে মানবজাতির ধনসম্পদ চুরি, লুণ্ঠন ও শোষণ করতে। কিন্তু তাদের চূড়ান্ত এজেন্ডা হলো, এমন এক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চাপিয়ে দেয়া

যার মাধ্যমে ইউরোপীয় ইহুদি-খ্রিস্টানরা ঔপনিবেশিক শাসন শেষ হয়ে যাবার পরেও এসকল দেশগুলিকে রূপান্তরিত করতে পারে। রূপান্তরের মানে হলো, সাধারণভাবে যেসব প্রতিষ্ঠান ধর্মীয় জীবনযাত্রাকে সংরক্ষণ করে সেসব প্রতিষ্ঠানকে তছনছ করা এবং বিশেষভাবে ইসলামের জীবন পদ্ধতিকে ধ্বংস করার মাধ্যমে সমাজকে ধর্মনিরপেক্ষ করে তোলা।

তাদের ধর্মনিরপেক্ষবাদ ইতোমধ্যেই মধ্যযুগীয় ইউরোপীয় খ্রিস্টানদেরকে একেবারে ঈশ্বরহীন ও আজবভাবে ক্ষয়িষ্ণু সভ্যতায় পরিণত করেছে। তারা তাদের ভয়ানক এজেন্ডাকে এমন প্রতারণার মাধ্যমে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে যে, তারা যা করেছে এবং এখনো করছে এ রকম প্রত্যেকটি বিষয়ের **বাহ্যিকতা** এবং **বাস্তবতা** একে অপরের সম্পূর্ণ উল্টো। এভাবেই সমগ্র মানবজাতি ধোঁকার মাধ্যমে তাদের সাথে ঈশ্বরহীনতা ও ক্ষয়িষ্ণুতায় যোগ দিয়েছে।

তারা তাদের ক্ষমতাকে অনন্যভাবে দুর্নীতি, অত্যাচার ও ফ্যাসাদ ছড়িয়ে দিতে ব্যবহার করছে। তাদের বদমায়েশী ও নির্যাতন ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে, যদিও তারা মন ভুলানোর জন্যে অতীতে তাদের অত্যাচারের জন্যে **ক্ষমা**ও চেয়ে নিচ্ছে। যেসব ইউরোপীয় ইহুদি ও খ্রিস্টান মার্জিত, বিশ্বাসপূর্ণ ও ভদ্র জীবনযাপন করে এবং অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে কথা বলে এক্ষেত্রে তারাও রেহাই পাচ্ছে না। সাবেক আমেরিকান প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টারকে তারা **বুড়ো গর্দভ** *"old fool"* বলে উপহাস করে। বর্ণবাদের সময় দক্ষিণ আফ্রিকায় কৃষ্ণাঙ্গ খ্রিস্টানদের উপর অত্যাচারের মাত্রাকেও হার মানিয়েছে আজকের পশ্চিমা ইউরোপীয় খ্রিস্টানদের যুদ্ধাপরাধ, ইরাকে আরব মুসলিমদের উপর নিপীড়ন, ইসরাঈলিদের গাযায় ফিলিস্তিনী মুসলিম ও খ্রিস্টানদের উপর চালিত নিধন অভিযান, ইত্যাদি।

তাদের লোভ অবর্ণনীয়। তারা **আইনসিদ্ধ চুরি**র (অর্থাৎ কৃত্রিম মুদ্রাস্ফীতি এবং সেই সাথে সুদের বিনিময়ে অর্থ ধার দেয়ার) মাধ্যমে সমগ্র মানবজাতির সম্পদ চুষে খাচ্ছে। এমনকি **রিবা**র (সুদের) মাধ্যমে গরিবদের যে সামান্য সম্বল আছে তাও লুটে নিচ্ছে। পরিণামে সমগ্র মানবজাতিকে তারা নতুন অর্থনৈতিক গোলামীর শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে ফেলেছে। তারা বিশাল পরিমাণ অর্থ ধার দিচ্ছে এটা জেনে যে, ঋণগ্রহিতা কখনোই সুদসহ তা পরিশোধ করতে পারবে না। অর্থনেতিক ব্ল্যাকমেইল করার কারণে ঋণগ্রহিতা দেশগুলি তাদের নিয়ন্ত্রণের আওতায় এসে পড়ে। প্রকৃত মূল্যমান বিশিষ্ট আসল মুদ্রা যেমন স্বর্ণ বা রৌপ্য মুদ্রাকে তারা প্রতিস্থাপিত করেছে *non-redeemable* (বিনিময়ের

অযোগ্য) কাগজি মুদ্রা দ্বারা, যার মূল্য বাহির থেকে (অর্থাৎ কৃত্রিমভাবে) আরোপ করা হয় এবং তাদের সুবিধা মতো বদলানো যায়। যখন কাগজি মুদ্রা তার মূল্যমান হারাবে বিশ্বের অধিকাংশ মানুষ চরম দারিদ্রের মুখোমুখি হবে। অপরদিকে, যারা ইতোমধ্যেই ধনী তারা গোলামীর শৃঙ্খলে আবদ্ধ মানুষদের হারানো সম্পদের বিনিময়ে আরো ধনবান হতে পারবে।

সবশেষে, তারা সেই বিশ্ব-ব্যবস্থার ধারক যা আজব ও রহস্যজনকভাবে পবিত্রভূমিকে স্বাধীন করতে মোহগ্রস্থ হয়ে পড়েছে। ইউরোপ খ্রিস্টান হয়ে পড়ার পর মূলত হাজার বছর ধরে ক্রুসেড নামের পবিত্র যুদ্ধ চালিয়েছিল, যতক্ষণ না এটি সফল হয়েছিল এবং চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জিত হয়েছিল। যখন জেনারেল অ্যালেনবি পরিচালিত ব্রিটিশ সেনাবাহিনী **'উসমানিয়া ইসলামি সাম্রাজ্যে'র** সেনাবাহিনীকে পরাজিত করে এবং ১৯১৭ সালে তিনি বিজয়ীর বেশে জেরুযালেমে প্রবেশ করেন এবং ঘোষণা করেন, *today the Crusades have ended* **"**আজ ক্রুসেডের সমাপ্তি হলো", তখন তার বলা উচিত ছিল, *today the European Crusades have ended*, অর্থাৎ **"**ইউরোপীয় ক্রুসেড আজ সমাপ্ত হলো"। প্রকৃতপক্ষে ইউরোপীয় ক্রুসেড এখনোও চলছে, এবং এটা শেষ হবে না যতক্ষণ মুসলিমরা পবিত্রভূমি ও পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে ইউরোপীয় যুলুম নির্যাতনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে থাকবে।

কিছু ইউরোপীয়রা ইহুদি হয়ে গিয়েছিল, তারাই **ইউরো যায়োনিস্ট আন্দোলনের** সূচনা করে। এরাই কট্টরভাবে এবং একগুঁয়ে জেদীর মতো লক্ষ্য পূরণ করার জন্যে ইহুদিদেরকে পবিত্রভূমিতে ফিরিয়ে আনে এবং ইসরাঈলি রাষ্ট্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে। এসব ইহুদিরা ইউরোপের পূর্বাঞ্চলে খাযার গোত্রের অধিবাসী ছিল আর তারা ইহুদি ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিল। ইউরোপীয়রা **সেমেটিক বংশোদ্ভূত** না হওয়া সত্ত্বেও সফলভাবে, এবং পূর্বের যেকোন সময়ের চেয়ে আরো অসৎ উপায় অবলম্বন করে, পবিত্রভূমিতে **সেমেটিক বংশোদ্ভূত** (অইউরোপীয়) ইহুদিদেরকে ফিরিয়ে এনেছে। তারা ঠিক একই উপায়ে, আক্ষরিকভাবে মুসলিম দেশে দীর্ঘদিন বসবাস করা ইসরাঈলি ইহুদিদেরকে বাধ্য করেছে সেই ধর্মনিরপেক্ষ ইসরাঈলি রাষ্ট্রে ফিরে আসতে। তাদের অন্যায় যুলুমের বিরুদ্ধে সকল প্রতিরোধকে তারা **অ্যান্টি-সেমেটিক** নাম দিয়ে উচ্ছেদ করেছে। ইহুদি-খ্রিস্টান ইউরোপীয় বিশ্ব-ব্যবস্থা সেই ইসরাঈলি রাষ্ট্রকে রক্ষা এবং শক্তিশালি করেছে এমনভাবে যে, সেটা এখন একটা পরাশক্তিতে পরিণত হয়েছে এবং শীঘ্রই বিশ্বের নিয়ন্তা রাষ্ট্রে পরিণত হবে। ***এসব কি কেবল হঠাৎ করেই সংঘঠিত হয়েছে? এটা কি এমন ঘটনা যার কোন ব্যাখ্যা নেই? যদি তা না হয় তবে তার ব্যাখ্যা কি?***

এমন অনেক পন্ডিত ও লেখক রয়েছে যারা জেদবশত ক্ষণিকের জন্যে নিজেদের কাঁধ নাড়াবে এবং উপরে উল্লেখিত সবকিছুকে স্রেফ একটা দুর্ঘটনা হিসেবে বিবেচনা করে উড়িয়ে দিবে। অপর দিকে এমন অনেকে রয়েছেন যারা মহান কুর'আন ও নবী (সাঃ)-এর হাদীস থেকে এই বইয়ে পেশ করা দলিল প্রমাণ দ্বারা আশ্বস্ত হবেন এবং মেনে নিবেন যে আজকের আজব ও রহস্যময় ইউরোপীয় ইহুদি-খ্রিস্টান বিশ্ব-ব্যবস্থা আসলে **ইয়াজুজ ও মাজুজীয় বিশ্ব-ব্যবস্থা**।

আরো প্রমাণ উদঘাটিত হয়েছে যে, দাজ্জাল সকল নৈতিক ও ধর্মীয় আইনকে তছনছ করেছে, যেন একগুঁয়ে জেদীর মতো ইসরাঈলি রাষ্ট্রকে বিশ্বের নিয়ন্তা রাষ্ট্রে পরিণত করা যায়। এক্ষেত্রে সে যায়োনিস্ট ইহুদি ও খ্রিস্টান মিত্রদেরকে ব্যবহার করেছে। ইয়াজুজ ও মাজুজীয় বিশ্ব-ব্যবস্থাকে অবলম্বন করে একাজ করা হয়েছে। এবং সবশেষে, ইহুদিদের একটা অংশ, যারা ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও যুলুম নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে, যারা সত্য মসীহকে প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং ক্রুশবিদ্ধ করার দাবী করেছিল, তারা মসীহের মুখোমুখি হবে। মহান আল্লাহ্ই ইয়াজুজ ও মাজুজকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাদেরকে অজেয় ক্ষমতা প্রদান করেছেন। সময় আসলে তিনি নিজেই অন্যায় অবিচারে ভরা ইয়াজুজ ও মাজুজীয় বিশ্ব-ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দিবেন।

নবী (সাঃ) ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, তখন এক অদম্য মুসলিম বাহিনী জেরুযালেমের উদ্দেশ্যে যাত্রা করবে এবং পথে অবস্থিত সকল দখলকৃত দেশসমূহকে স্বাধীন করে দিবে। পবিত্র ইসরাঈলি রাষ্ট্র তখন আজকের প্রতারক রাষ্ট্রকে প্রতিস্থাপিত করবে। অত্যাচারীকে শাস্তি প্রদান করা হবে এবং ***অত্যাচারের*** ও ***গোলামীর*** বদলে ***ন্যায়বিচার*** ও ***স্বাধীনতা,*** এবং ***মিথ্যার*** বদলে ***সত্যের*** চূড়ান্ত বিজয়ের মাধ্যমে ইতিহাস সমাপ্ত হবে।

এই লেখক দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, পবিত্রভূমির আশেপাশে দ্রুত বিকশিত ঘটনাগুলি এই বইয়ে উত্থাপিত মূল প্রতিপাদ্যকে সঠিক প্রমাণ করে দিবে এবং এটা করার মাধ্যমে ইনশাআল্লাহ্, সমালোচনাকারীর বির্তককে বাতিল ও অবৈধ প্রমাণ করে দিবে।

কুর'আনের সূরা কাহাফ, ও সেই সাথে নবী (সাঃ)-এর ব্যাখ্যা (হাদীসসমূহ) ইয়াজুজ ও মাজুজকে আদম (আঃ) থেকে আগত দুটো জাতি হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। মহান আল্লাহ্ তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাদেরকে অনন্য ক্ষমতা প্রদান করেছেন। মহান আল্লাহ্ বলেছেন, "*কেবলমাত্র আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারি।*" কিভাবে তাদেরকে প্রাচীরের পেছনে আটকানো হয়েছিল, সূরা কাহাফ সেই আলোচনা

করেছে। তারা তাদের ক্ষমতাকে ফ্যাসাদে ব্যবহার করছিল। সূরা কাহাফ আরো দেখাচ্ছে যে, ক্ষমতাকে তারা ঈমান ও সদাচারপূর্ণ জীবন যাপনকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে ব্যবহার করবে। যারা আদিম জীবন যাপন করে অথবা উন্মুক্ত পরিবেশে নিজেদের অভাব মিটিয়ে চলে (যেমন হাইতি, সোমালিয়া, ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, মিসর ইত্যাদি) তাদের বিরুদ্ধে তারা হিংসাত্মক আক্রমণ চালাবে। ফলে বাস্তবিকপক্ষে ঈশ্বরহীন এবং নিষ্ঠুর একটা জাতির ছবি এখানে ভেসে উঠেছে যাদের অন্তর পশুর মতো।

সূরা কাহাফ অগ্রসর হয়ে আরো বলে দিচ্ছে ***যখন আমার প্রতিপালকের সতর্কবাণী*** আসবে (অর্থাৎ যখন ফিতনার যুগ বা শেষ যুগ নিকটবর্তী হবে), ***আল্লাহ্ যুলক্বার্নাইনের প্রাচীরটিকে ধ্বংস করে দিবেন*** এবং ইয়াজুজ ও মাজুজ (যারা শেষ সময়ের বড় আলামত) বিশ্বে মুক্ত হয়ে যাবে। সূরা আম্বিয়া তারপর উদঘাটন করছে যে, তারা চূড়ান্তভাবে ***সবদিকে ছড়িয়ে পড়বে আর এভাবে সকল মানুষকে তাদের আওতায় নিয়ে নিবে;*** এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, অজেয় ক্ষমতার বলে তারা সমগ্র বিশ্বের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে নিয়ে নেবে আর প্রথমবারের মতো পৃথিবীকে একটা জাতি এককভাবে শাসন করবে। এটা আরো নির্দেশ করছে যে, ধরাছোঁয়ার বাহিরে থেকে তারা সমগ্র মানবতাকে রূপান্তরিত করবে এবং নতুন রীতিনীতিতে অভ্যস্ত করে তাদেরকে নিজেদের প্রতিলিপি বা **কার্বন কপি**-তে পরিণত করবে।

যেহেতু সেই বিশ্ব-ব্যবস্থা অন্যায় ও যুলুমের উপর প্রতিষ্ঠিত হবে এবং ধর্মের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে তাই এই বিশ্ব-ব্যবস্থা স্বর্গীয় ব্যবস্থার সাথে সাংঘর্ষিক হবে। কোন মু'মিনই এরূপ বিশ্বের **মূল স্রোতধারা বিশিষ্ট সমাজে** স্বচ্ছন্দ বোধ করবে না। বরং সূরা কাহাফের সেই যুবকদের মত স্রষ্টাবিমুখ সমাজ থেকে পলায়নের পথ খুঁজবে।

হাদীসশাস্ত্র ইয়াজুজ ও মাজুজের মুক্তিকে নিশ্চিত করেছে

সহীহ বুখারীতে কমপক্ষে আটটি হাদীস রয়েছে যেটা পরিষ্কারভাবে নির্দেশ করছে যে, ইয়াজুজ ও মাজুজের মুক্তি প্রক্রিয়া আজ থেকে প্রায় ১৪০০ বছর আগে নবী (সাঃ)-এর জীবদ্দশাতেই আরম্ভ হয়ে যায়। হাদীসগুলি আমাদেরকে জানাচ্ছে যে, নবী (সাঃ) ঘুমন্ত অবস্থায় একটি ওহী বা প্রত্যাদেশ লাভ করেন যাতে তিনি দেখেন ইয়াজুজ ও মাজুজের প্রাচীরে একটা ছিদ্র তৈরী হয়েছে। আমরা জানি যে, ইয়াজুজ ও মাজুজের সাথে সম্পৃক্ত প্রাচীর একটিই আর তা হলো যুলক্বার্নাইন কর্তৃক নির্মিত প্রাচীর।

নবী (সাঃ) ঘুম থেকে জাগ্রত হবার সাথে সাথে ঘোষণা করেন যে, প্রাচীরের ঐশ্বরিক ধ্বংস সম্বলিত একটি সত্য প্রত্যাদেশ তিনি লাভ করেছেন। তিনি বললেন:

ويل للعرب من شر قد إقترب

আরবদের জন্যে ধ্বংস অনিবার্য, এক মহা অকল্যাণ তাদের কাছে (ধেয়ে) আসছে।

এমনকি প্রাচীরে কতটুকু ছিদ্র হয়েছে তা দেখানোর জন্যে আঙ্গুল দিয়ে তিনি বৃত্ত পর্যন্ত তৈরী করলেন। মহান আল্লাহ্ নিজেই ঘোষণা করেছেন একটা নির্দিষ্ট সময়ে তিনি নিজেই প্রাচীরটিকে ধ্বসিয়ে দেবেন এবং এটা পরিষ্কার যে, প্রাচীরে ছিদ্র হওয়ার জন্যে মহান আল্লাহ্ই দায়ী:

قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا

(যুলক্বার্নাইন) বললো, (প্রাচীর) আমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে রহমত! যখন আমার প্রতিপালকের নির্ধারিত দিন (শেষ যুগ) আসবে, তিনি এই প্রাচীরটি ধ্বসিয়ে দিবেন (একে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিবেন) আর আমার প্রতিপালকের সতর্কবাণী অবশ্যই আসবে।

[কাহাফ ১৮:৯৮]

এই হাদীসটি খুবই পরিষ্কারভাবে সংবাদ দিচ্ছে যে, নবী (সাঃ)-এর সত্য নবুওয়তি স্বপ্নের দিন থেকেই ইয়াজুজ ও মাজুজের মুক্তি প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়ে গেছে। ইমাম বুখারীর সহীহ্তে বর্ণিত এই ঘটনাটি এ ব্যাপারে সবচেয়ে বড় দলীল। পাঠক যেন আটটি হাদীসের পুনরাবৃত্তিতে হতবাক না হোন। এগুলি বিভিন্ন হাদীস নয় বরং হাদীসগুলির সারবস্তু একই। কিন্তু হাদীসগুলি বিভিন্ন ব্যক্তি দ্বারা সামান্য ভিন্ন ভাষায় বর্ণিত। যার ফলে এই হাদীস হচ্ছে মুতাওয়াতির ও সেহেতু সম্ভাব্য সবচেয়ে শক্তিশালী হাদীস:

(১) আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত: নবী (সাঃ) বলেন ইয়াজুজ ও মাজুজের প্রাচীরে একটা ছিদ্রের সৃষ্টি হয়েছে। (উপবর্ণনাকারী) উহায়ব (রাঃ) (তাঁর তর্জনী আর বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়ে) ৯০ এঁকে দেখালেন।

[সহীহ বুখারী]

(২) উম্মুল মু'মিনীন জয়নব বিনতে জাহাশ (রাঃ) থেকে বর্ণিত: একদিন নবী (সাঃ) ভয়ার্ত অবস্থায় আমাদের নিকটবর্তী হলেন এবং বললেন আল্লাহ্ ব্যতীত

কারো উপাস্য হবার অধিকার নেই! আরবদের দুর্ভাগ্য, এক মহা অকল্যাণ তাদের কাছে আসছে। **(আজ)** ইয়াজুজ ও মাজুজের প্রাচীরে একটি গর্তের সৃষ্টি হয়েছে। নবী (সাঃ) তার তর্জনী আর বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়ে একটি বৃত্ত তৈরী করে দেখালেন। জয়নব বিনতে জাহাশ (রাঃ) বলেন: আমি বললাম, "হে নবী! (সাঃ) আমাদের ভিতর সৎলোক থাকা সত্ত্বেও কি আমরা ধ্বংস হয়ে যাবো?" নবী (সাঃ) বললেন, "হ্যাঁ! যখন মন্দ লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে।"

[সহীহ বুখারী]

উপরের হাদীসটি সামান্য পরিবর্তনের সাথে সহীহ বুখারীতে আরও কয়েকবার এসেছে, যা নিম্নে তুলে ধরা হলো:

(৩) উম্মুল মু'মিনীন জয়নব বিনতে জাহাশ (রাঃ) থেকে বর্ণিত: একদিন নবী (সাঃ) রক্তিম মুখমন্ডলসহ ঘুম থেকে জেগে উঠলেন এবং বললেন আল্লাহ্ ব্যতীত কারো উপাস্য হবার অধিকার নেই! আরবদের দুর্ভাগ্য, এক মহা অকল্যাণ তাদের কাছে আসছে। **(আজ)** ইয়াজুজ ও মাজুজের প্রাচীরে একটি ছিদ্রের সৃষ্টি হয়েছে। (সুফিয়ান তাঁর আঙ্গুল দিয়ে ৯০ বা ১০০ এঁকে ছিদ্রের আকারের বর্ণনা দিলেন)। তখন জিজ্ঞাসা করা হলো: "আমাদের ভিতর সৎলোক থাকা সত্ত্বেও কি আমরা ধ্বংস হয়ে যাবো?" নবী (সাঃ) বললেন, "হ্যাঁ! যদি মন্দ কাজের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় তবে।"

[সহীহ বুখারী]

(৪) উম্মুল মু'মিনীন জয়নব বিনতে জাহাশ (রাঃ) থেকে বর্ণিত: একদিন নবী (সাঃ) ভয়ার্ত অবস্থায় আমাদের নিকটবর্তী হলেন এবং বললেন আল্লাহ্ ব্যতীত কারো উপাস্য হবার অধিকার নেই! আরবদের দুর্ভাগ্য, এক মহা অকল্যাণ তাদের কাছে আসছে। **(আজ)** ইয়াজুজ ও মাজুজের প্রাচীরে একটি ছিদ্রের সৃষ্টি হয়েছে। {নবী (সাঃ) তার তর্জনী আর বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়ে একটি বৃত্ত তৈরী করে দেখালেন}। আমি বললাম, "হে নবী! (সাঃ) আমাদের ভিতর সৎলোক থাকা সত্ত্বেও কি আমরা ধ্বংস হয়ে যাবো?" নবী (সাঃ) বললেন, "হ্যাঁ! যদি মন্দ কাজের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।"

[সহীহ বুখারী]

(৫) উম্মুল মু'মিনীন জয়নব বিনতে জাহাশ (রাঃ) থেকে বর্ণিত: একদিন নবী (সাঃ) ভয়ার্ত অবস্থায় আমাদের নিকটবর্তী হলেন এবং বললেন, "আল্লাহ্ ব্যতীত কারো উপাস্য হবার অধিকার নেই! আরবদের দুর্ভাগ্য, এক মহা অকল্যাণ তাদের কাছে আসছে। **(আজ)** ইয়াজুজ ও মাজুজের প্রাচীরে একটি ছিদ্রের সৃষ্টি হয়েছে। (তর্জনী আর বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়ে একটি বৃত্ত তৈরী করে দেখালেন) ইয়াজুজ ও মাজুজের প্রাচীরে এ রকম একটি ছিদ্র তৈরী হয়েছে। আমি বললাম, "হে নবী! (সাঃ) আমাদের ভিতর সৎলোক থাকা সত্ত্বেও কি আমরা ধ্বংস হয়ে যাবো?" নবী (সাঃ) বললেন, "হ্যাঁ! যদি মন্দ কাজের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।"

[সহীহ বুখারী]

(৬) উম্মুল মু'মিনীন উম্মে সালামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত: নবী (সাঃ) জেগে উঠলেন এবং বললেন: "সুবহানাল্লাহ; কত বিশাল ঐশ্বর্য দান করা হয়েছে আর কত বিশাল দুর্ভোগ দান করা হয়েছে!"

[সহীহ বুখারী]

(৭) আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত: নবী (সাঃ) বলেন, ইয়াজুজ ও মাজুজের দেয়ালে আল্লাহ্ তা'আলা এ রকম একটি ছিদ্র তৈরী করেছেন (তিনি তাঁর আঙ্গুল দিয়ে ছিদ্রের পরিমাণ দেখালেন)।

[সহীহ বুখারী]

(৮) আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত: নবী (সাঃ) তাঁর উটে চড়ে (কা'বার চারপাশে) তাওয়াফ করছিলেন এবং প্রতিবার কালো পাথর সম্বলিত কোণায় পৌঁছে সেই কালো পাথরের দিকে নির্দেশ করছিলেন ও বলছিলেন, "আল্লাহু আকবার"। জয়নাব বিনতে জাহাশ (রাঃ) বলেন, আল্লাহ্‌র নবী (সাঃ) বলেছেন, ইয়াজুজ ও মাজুজের দেয়ালে এ রকম একটি ছিদ্র তৈরী করা হয়েছে (তিনি তাঁর তর্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়ে ৯০ সংখ্যাটি এঁকে দেখালেন)।

[সহীহ বুখারী]

সহীহ বুখারীর এই আটখানা হাদীস চারটি সূত্র থেকে এসেছে, আবু হুরাইরা, জয়নাব বিনতে জাহাশ, উম্মে সালামা এবং আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ), আর এগুলি স্পষ্টভাবেই বর্ণনা দিচ্ছে যে, নবী (সাঃ)-এর জীবদ্দশাতেই ইয়াজুজ ও মাজুজরা মুক্তি লাভ করেছে। আর এটা পরিষ্কারভাবে উদঘাটিত হয়েছে যে, প্রাচীর বিদীর্ণ হওয়া মানে (বিশেষভাবে) আরবদের জন্যে অশুভ পরিণতির পূর্বাভাস। আমরা জানি ইয়াজুজ ও

মাজুজের সাথে সম্পৃক্ত প্রাচীর একটিই যেটা যুরক্বার্নাইন কর্তৃত নির্মিত। অতএব আমাদের অকাট্য উপসংহার হচ্ছে, যুলক্বার্নাইনের প্রাচীরের ধ্বংস বা সমান করার প্রক্রিয়া নবী (সাঃ)-এর জীবদ্দশাতেই শুরু হয়েছে।

বিশ্বের পানি এবং গ্যালিলী সাগরের পানি

এমন আরো অনেক প্রমাণ রয়েছে যেটা উপরের হাদীস থেকে গৃহীত আমাদের উপসংহারকে সমর্থন করে। ইয়াজুজ ও মাজুজের একটা বৈশিষ্ট্য হলো যে তারা এমন মাত্রাতিরিক্ত পানি ব্যবহার করবে যে, নদী ও হ্রদগুলির পানি শুকিয়ে যাবে। সুমিষ্ট পানির ভান্ডার নষ্ট করার ঘটনা পৃথিবী ইতোমধ্যেই টের পাচ্ছে। এরকম সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাচ্ছে যেন বিশ্বের জাতিগুলি ও গোত্রসমূহ দূর্লভ পানির উৎস দখলের জন্যে যুদ্ধে লিপ্ত হতে পারে।

নাটকীয় প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে যে, ইয়াজুজ ও মাজুজের মুক্তির সাথে পানির সম্পর্ক রয়েছে। হাদীসে এর আলোচনা রয়েছে যে, ইয়াজুজ ও মাজুজরা তাদের যাত্রাপথে জেরুযালেম অতিক্রম করবে, এবং সেখানকার সাগরের পানি এমন ভাবে পান করবে যার পরিণামে সেটা শুকিয়ে যাবে:

> ... এমনই এক অবস্থায় আল্লাহ্ ঈসা (আঃ)-এর কাছে ওহী পাঠাবেন, "আমার বান্দাদের মাঝ থেকে এমন একটা দল সৃষ্টি করেছি যাদের সাথে যুদ্ধ করে কেউ জয়ী হতে পারবে না, তুমি (তোমার সাথিদের) তূর পাহাড়ের উপর নিয়ে যাও।" (ইতিহাসের সে পর্যায়ে আল্লাহ্ তা'আলা) ইয়াজুজ ও মাজুজকে পাঠাবেন। তারা প্রতিটি উচ্চভূমি থেকে নেমে আসবে। তাদের প্রথম জন টাইবেরিয়াস হ্রদের (গ্যালিলী সাগর) পাশ দিয়ে যাবার সময় সেখান থেকে পানি পান করবে। তাদের শেষ জন যখন সেই স্থান অতিক্রম করবে, সে বলবে এক সময় এখানে পানি ছিল ...।"
>
> [সহীহ মুসলিম]

গ্যালিলী সাগরের পানির উচ্চতা এখন এতটাই কম যে, এটাকে বাস্তবেই মৃত সাগর হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে, অর্থাৎ এটা শুকিয়ে যাওয়া এখন শুধুমাত্র সময়ের ব্যাপার। আমরা যখন এই বই সম্পন্ন করছি, তখন এই সাগরের পানির উচ্চতা সমুদ্র পৃষ্ট থেকে ২১৪.৪ মি. নীচে অবস্থিত *"black line"* "কালো রেখা"-র দিকে দ্রুত

অগ্রসর হচ্ছে। পানি যখন সেই রেখা পর্যন্ত নেমে যাবে, তখন পাম্প দিয়ে পানি উত্তোলন করা আর সম্ভব হবে না, কেননা পাম্পগুলি পানির অনেক উপরে অবস্থান করবে। এটাই ইসরাঈলের পানির প্রধান উৎস। এটা খুব সম্ভব যে, এই বই যখন প্রকাশিত হবে এবং পাঠকদের হাতে চলে যাবে তখন তা ঘটতে পারে। পাঠকদেরকে আমরা উপদেশ দেবো *Google search* করে *Lake Kinneret Black Line*-এর সর্বশেষ অবস্থার খবর রাখতে।

পৃথিবীর বিশাল লেক বা হ্রদসমূহ শুকিয়ে যাবার মধ্যে ইয়াজুজ ও মাজুজরা যে মুক্তি পেয়েছে তার আরো নাটকীয় প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, পৃথিবীর সবচেয়ে বড় হ্রদ এবং সুমিষ্ট পানির বিশাল ভান্ডার, কানাডার সর্ববৃহৎ সুপিরিয়র হ্রদ এখন তার সর্বনিম্ন পানির স্তরে রয়েছে।

ইয়াজুজ ও মাজুজকে জেরুযালেমের সাথে সম্পৃক্তকারী হাদীস

সবশেষে, কুর'আন ইয়াজুজ ও মাজুজকে দ্বিতীয় এবং শেষবারের মতো সূরা আম্বিয়ার দু'টি আয়াতে উল্লেখ করেছে যেখানে একটি শহরের কথা বর্ণিত হয়েছে। মহান আল্লাহ্ তা'আলা সে শহরটিকে ধ্বংস করে দেন এবং সে শহরের অধিবাসীদেরকে বহিষ্কার করেন, এবং "এই শহর আমাদের" এই দাবী নিয়ে যাতে আর কখনো ফিরে আসতে না পারে সে জন্যে তাদের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন। উপরন্তু আয়াতটি সামনে এগিয়ে ঘোষণা করেছে যে, এই নিষেধাজ্ঞা বলবৎ থাকবে ইয়াজুজ ও মাজুজের মুক্তি এবং সব দিকে ছড়িয়ে পড়ে সুবিধাজনক সকল স্থান দখল করা পর্যন্ত:

وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ

নিষেধাজ্ঞা জারি রয়েছে একটি শহরের উপর (জেরুযালেম) যাকে আমরা ধ্বংস করে দিয়েছি (এবং এর অধিবাসীরা সেখান থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে), (এই শহর আমাদের, এই দাবী নিয়ে) তারা (অর্থাৎ এর অধিবাসীরা) আর ফিরে আসতে পারবে না, যতক্ষণ না ইয়াজুজ ও মাজুজকে মুক্ত করে দেয়া হচ্ছে এবং তারা সবদিকে ছড়িয়ে না পড়ছে (তারা সকল উঁচু স্থান থেকে নেমে আসবে, যেন প্রত্যেক সুবিধাজনক স্থান দখল করা যায়)।

[আম্বিয়া ২১:৯৬]

আমরা যদি শহরটিকে চিহ্নিত করতে পারি এবং যদি প্রমাণ করতে পারি যে এর অধিবাসীরা ইতোমধ্যেই সেই শহরের দাবী নিয়ে সেখানে প্রত্যাবর্তন করেছে (ঐশ্বরিক আদেশবলে বহিষ্কারের পর), এটা তখন ইয়াজুজ ও মাজুজের মুক্তি এবং সেই সাথে তাদের পরিচয় উভয়টিই সনাক্ত করে দিবে।

এই বিষয়ে *অর্থ প্রকাশের পদ্ধতির* মাধ্যমে আমরা শহরটিকে চিহ্নিত করতে পারি এবং আমাদেরকে কুর'আন ও হাদীসের তথ্যভান্ডার থেকে আরো খুঁজে বের করতে হবে ইয়াজুজ ও মাজুজের সাথে সম্পৃক্ত শহরটিকে। এটা নিশ্চিত যে জেরুযালেমই এরূপ একটি শহর। আমরা উপরে একটা হাদীস বর্ণনা করেছি যেখানে বলা হয়েছে, ইয়াজুজ ও মাজুজরা গ্যালিলী সাগর অতিক্রম করবে। সাগরটি জেরুযালেম থেকে প্রায় ৫০ মাইল উত্তরে অবস্থিত। উপরন্তু ইয়াজুজ ও মাজুজের সাথে সম্পৃক্ত যে শহরটিকে উল্লেখ করা হয়েছে তা হলো, *বাইতুল মাকদিস* (জেরুযালেম)।

> ... ইয়াজুজ ও মাজুজরা হাঁটতে থাকবে যতক্ষণ না তারা আল-খামর নামক পাহাড়ে পৌঁছাচ্ছে। এটা বাইতুল মাকদিসের একটি পাহাড়।
>
> [সহীহ মুসলিম]

দ্বিতীয়ত, মক্কাকে তার পুরাতন নাম বাক্কায় সম্বোধন করা সূরা আলে-ইমরানের আয়াতের সাথে উপরের দু'টি আয়াতের সাদৃশ্য পাওয়া যাচ্ছে। ঘটনাপ্রবাহ এবং পবিত্র কিতাবের বাহিরে অবস্থিত তথ্য উপাত্তের দিকে নজর দেয়া ব্যতীত আমাদের পক্ষে কুর'আনের এই আয়াতগুলি উপলব্ধি করা কখনো সম্ভব হবে না।

কুর'আন আমাদেরকে সংবাদ দিচ্ছে পবিত্রভূমি ইসরাঈলি লোকদেরকে দান করা হয়েছিল (মায়িদাহ ৫:২৪)। **জেরুযালেম** পবিত্রভূমির রাজধানী। ঐতিহাসিক তথ্যপ্রমাণ হচ্ছে প্রায় ২০০০ বছর আগে তারা সেখান থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিল। কিন্তু এখন **শহর**টি তাদের এই দাবী নিয়ে তারা সেখানে ফিরে এসেছে। মরিয়ম পুত্র ঈসা (আঃ)-এর ঘটনাপ্রবাহের সাথে **জেরুযালেম** ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এই **জেরুযালেম** থেকে তিনি বিশ্ব শাসন করবেন। ভন্ড মসীহ দাজ্জালও এই **জেরুযালেম** থেকে বিশ্ব শাসনের চেষ্টা চালাবে। ইতিহাস যেহেতু শেষের দিকে অগ্রসর হচ্ছে, **জেরুযালেম** শহরটি ওয়াশিংটন, লন্ডন এবং অন্যান্য এরূপ শহরের পরিবর্তে "বিশ্বের কেন্দ্র" হিসেবে স্থান দখল করবে।

না কুর'আন আর না নবী (সাঃ), যার উপর কুর'আন নাযিল হয়েছিল এবং যাকে কুর'আনের শিক্ষক হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে, কখনো ইয়াজুজ ও মাজুজের সাথে সম্পৃক্ত **শহর**টিকে চিহ্নিত করেছেন আর নিশ্চিতভাবেই এটা কোন আকস্মিক ঘটনা নয়। এটা নিশ্চিত যে, এর পেছনে কারণ হচ্ছে, ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় বিকশিত ঘটনাগুলিকে সতর্কতার সাথে পর্যবেক্ষণ করতে কুর'আনের পন্ডিতদের উৎসাহিত করা হয়েছে যেন তারা মহান আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহ উপলব্ধি করতে পারে, এবং এর ফলস্বরূপ **শহর**টিকে চিহ্নিত করতে পারবে। এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি কুর'আন তাঁর মুজেজাময় ভাষ্যে বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, যেখানে ঘোষণা করা হয়েছে:

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

অচিরেই আমি তাদেরকে আমার নিদর্শন দেখাব (মহাবিশ্বের) সুদূর দিগন্তে ও তাদের নিজেদের মধ্যেও (ইতিহাসের কালপ্রবাহ এর আওতাভুক্ত), যেন এটি তাদের নিকট পরিষ্কার হয়ে যায় যে, এই ওহীটি সত্য; এটি কি যথেষ্ট নয় যে তাদের প্রতিপালক সবকিছু প্রত্যক্ষ করছেন?

[ফুস্‌সিলাত ৪১:৫৩]

ইকবাল, আনসারী এবং সাঈদ নুসরী

মুসলিম দার্শনিক-কবি ড. আল্লামা মুহাম্মাদ ইকবাল কুর'আনের এই দৃষ্টিভঙ্গিকে স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং কুর'আনের বিশেষ আয়াতের মর্ম উপলব্ধি করতে তিনি ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় বিকশিত ঘটনাগুলিকে সতর্কতার সাথে বিশ্লেষণের একটি কর্মপদ্ধতি (উসূল আত-তাফসীর) অবলম্বন করেছেন। ১৯১৭ সালে জেরুযালেম মুক্ত করার হাজার বছরের পশ্চিমা ক্রুসেডের প্রতি তিনি তাঁর প্রতিক্রিয়া একটি উর্দু কবিতা চরণ রচনা করে সফলভাবে ব্যক্ত করেন। তিনি ঘোষণা করেছেন, ইয়াজুজ ও মাজুজের সকল দল মুক্ত হয়ে গেছে। ইয়াজুজ ও মাজুজের সাথে সম্পৃক্ত সূরা আম্বিয়ার দু'টি আয়াত গবেষণা এবং উপলব্ধি করাটা যে চরম প্রয়োজনীয় তার প্রতি মুসলিমদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে কবিতার চরণ সামনে অগ্রসর হয়েছে:

کھل گئے یاجوج اور ماجوج کے لشکر تمام
چشمِ مسلم دیکھ لے تفسیرِ حرفِ ینسلون
[بانگِ درا، ظریفانہ : ۲۳]

খুল গ্যয়ে ইয়াজুজ ও মাজুজ কে ল্যস্কর ত্যমাম
চ্যশমে মুসলিম দেখ লে ত্যফসীরে হ্যরফে ইয়্যনসিলুন

ইয়াজুজ ও মাজুজের দলগুলি যে মুক্ত হয়ে গেছে
মুসলিমদের চোখ দেখে নিক ইয়ানসিলুন শব্দের তাৎপর্য

[বাঙ্গ-ই-দ্যরা, য্যরীফানা:২৩]

[**বাঙ্গ-ই-দ্যরার** অর্থ হলো, "কাফেলার যাত্রা আরম্ভ করার সংকেত"
য্যরীফানার অর্থ হলো, "রসাল পর্যবেক্ষণ"]

এটা সত্যিই আশ্চর্যের বিষয় যে, কুর'আনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আয়াতগুলির মর্ম ইকবাল ঠিক যে মুহূর্তে ইউরোপীয় ক্রুসেডররা জেরুযালেম মুক্ত করতে সফল হয়েছিল, সেই মুহূর্তে উপলব্ধি করেছিলেন, এবং শহরটিকে জেরুযালেম হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন, যদিও ১৯৪৮ সালের আগ পর্যন্ত পবিত্রভূমিতে ইসরাঈলি রাষ্ট্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়নি (প্রকৃত মুসলিম দার্শনিকদের আধ্যাত্মিক দূরদর্শিতা এখানে ফুটে উঠেছে - অনুবাদক)।

ইকবালের কবিতার চরণ, যেটা সরাসরি সূরা আম্বিয়ার সাথে এবং শহরটির সাথে সম্পৃক্ত, বিশিষ্ট ইসলামি পন্ডিত ও আলিম মাওলানা ড. ফজলুর রহমান আনসারীর দৃষ্টি এড়ায়নি, যিনি নিজেও ইকবালের ছাত্র ছিলেন। ড. আনসারী শহরটিকে জেরুযালেম হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। ইব্রাহীম আহমাদ বাওয়ানীর *'Gog Magog and the State of Israel'* শিরোনামের অসাধারণ পুস্তিকাটিতে এর প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে। পুস্তিকাটি আজ থেকে প্রায় ৫০ বছর আগে *Aisha Bawāny Wakf* কর্তক পাকিস্তানে প্রকাশিত হয়েছিল (১৯৫০ পরবর্তী সময়ে বইটি প্রকাশিত হয়, প্রকাশের কোন তারিখ উল্লেখিত হয়নি)। বাওয়ানি তাঁর পুস্তিকাটিতে ঘোষণা করেন:

> আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, এবং এর জন্যে আমরা পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলিতে অকাট্য প্রমাণ দেখিয়েছি যে, আয়াতটির ইশারা রয়েছে একটি নির্দিষ্ট শহরের দিকে, আর সেটা হলো জেরুযালেম ...।
>
> (*Gog Magog and the State of Israel*, পৃ-২)

সামনে অগ্রসর হয়ে তিনি বলেন:

কুর'আনের এই আয়াত (আম্বিয়া ২১:৯৫-৯৬) নিশ্চিতভাবে ইসরাঈলি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সাথে সম্পৃক্ত, যেটা ইয়াজুজ ও মাজুজের সমর্থন ও সহায়তা প্রাপ্ত।

(*Gog Magog and the State of Israel*, পৃ-৩)

মাওলানা ড. ফজলুর রহমান আনসারীর প্রতি তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

"ধ্বংসপ্রাপ্ত শহরের অধিবাসীদের সাথে সম্পৃক্ত আয়াতটির ব্যাপারে ... যার ব্যাখ্যা ও তাফসীর এ বিষয়ে আমাকে গবেষণা করতে ও লিখতে উৎসাহিত করেছে।"

(*Gog Magog and the State of Israel, পৃ-iii*)

আমরা কেবল এই বাস্তবতার প্রতি শোক পালন করতে পারি যে, ড. আনসারী কোন অজ্ঞাত কারণে, এ বিষয়ে নিজে কোন কিছু লিখেননি বা জনসম্মুখে কোন কথা বলেননি। যাই হোক এটা কিন্তু নিশ্চিত যে, বিষয়টির সাথে সম্পৃক্ত তাঁর **অর্থপ্রকাশের পদ্ধতি** (দেখুন, দ্বিতীয় অধ্যায়) বের করার মাধ্যমে শহরটি যে জেরুযালেম এটা বুঝতে তিনি সক্ষম ছিলেন।

আমরা যেহেতু সূরা আম্বিয়াতে বর্ণিত **শহর**টিকে **জেরুযালেম** হিসেবে চিহ্নিত করেছি, সেহেতু আমরা এটাও উপলব্ধি করেছি যে, কুর'আনের আয়াতটি ঘোষণা করেছে এ রকম প্রত্যাবর্তন সম্ভব হবেনা যতক্ষণ না ইয়াজুজ ও মাজুজ মুক্তি পাচ্ছে এবং সবদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। অন্যকথায়, 'এটা তাদের ভূমি' এই দাবী নিয়ে ইসরাঈলি লোকেরা জেরুযালেমে পৌঁছে গেছে, এটা হয়েছে হাজার বছর ধরে চলে আসা ইউরোপীয় ক্রুসেডারদের জেরুযালেম জয় করার পর, যেটা ছিল ইয়াজুজ ও মাজুজদের সাথে সম্পৃক্ত একটি ঘটনা, যার মানে হলো ইয়াজুজ ও মাজুজের মুক্তি ক্রুসেডের আগেই হয়ে গিয়েছিল। এই বিনয়ী বইটি তাঁদের প্রচেষ্টার যৌক্তিক সমাপ্তি ব্যতীত আর কিছুই করেনি, যা আলোকিত করেছিলেন আধুনিক যুগের বিশিষ্ট ইসলামি পন্ডিত ও আলিম ড. আল্লামা মুহাম্মাদ ইকবাল (রঃ), ড. মুহাম্মাদ ফজলুর রহমান আনসারী (রঃ), এবং বিশিষ্ট তুর্কি ইসলামি পন্ডিত ও আলিম *বাদিউজ্জামান* সাঈদ নুসরী (রঃ)।

এক্ষেত্রে আরও বাড়তি বিবেচনাযোগ্য দলীল প্রমাণ রয়েছে। যেমন, আধুনিক যুগে বিশ্বায়নের অনন্য ঘটনা, সামাজিক মূল্যবোধের ক্রমশ চরম অবক্ষয়, বাস্তবিকপক্ষে ঈশ্বরহীন ও ক্ষয়িষ্ণু পশ্চিমা জীবনের প্রতিলিপি (মুসলিম বিশ্বসহ) সমগ্র মানবজাতির মাঝে আশর্যজনকভাবে অনুপ্রবেশ, ইত্যাদি। এগুলি আরো যুক্তি প্রমাণ বহন করে যে,

ইয়াজুজ ও মাজুজের মুক্তি বিশ্বে আরো আগে সংঘঠিত হয়েছে। আমরা এই কাজটি তাদের জন্যে রেখে দিতে চাই যারা এই বইয়ের মূল প্রতিপাদ্য দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এখানে তুলে ধরা যুক্তিকে আরো সম্প্রসারিত করতে চাইবে।

www.islamfind.wordpress.com

সাত- ইয়াজুজ ও মাজুজকে ছেড়ে দেয়ার তাৎপর্য

যখন ইয়াজুজ ও মাজুজের মুক্তি আরম্ভ হবে তখন ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হবে যুলক্বার্নাইনের ঠিক উল্টো ভিত্তির উপর, যেটা বাস্তবিকপক্ষে ঈশ্বরহীন এবং অত্যাচারীকে শায়েস্তা করার পরিবর্তে নিরপরাধকে শাস্তি দিতে ব্যবহৃত হবে। যারা মার্জিত জীবনযাপন করে এবং মহান আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি ঈমানদার, তাদেরকে টার্গেট করার জন্যে ক্ষমতা ব্যবহৃত হবে। সবশেষে, এরূপ বিশ্ব-ব্যবস্থাতে ক্ষমতা ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হবে মানবাধিকারকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করতে; অন্যায়, ধ্বংস এবং সম্পূর্ণরূপে উচ্ছেদ করতে; এমনকি যারা আদিম জীবনযাপন করে তাদের উপর নিপীড়ন চালাতে; এবং বিশ্বের চরম দরিদ্র জনগণকে এক বিশাল অনাথ আশ্রমে পরিণত করতে।

কুর'আনের সূরা কাহাফ আমাদেরকে বিশ্বে ইয়াজুজ ও মাজুজের মুক্তির তাৎপর্য জানিয়ে দিচ্ছে। মহান আল্লাহ্ এই সূরাতে যুলক্বার্নাইন নামের একজন বিখ্যাত ভ্রমণকারীর কথা উল্লেখ করেছেন যিনি পৃথিবীর দুই প্রান্ত ভ্রমণ করেছিলেন। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, আরবিতে ক্বার্ন শব্দটি শিং বা যুগ বুঝাতে ব্যবহৃত হতে পারে। কিন্ত কুর'আনে যেহেতু ক্বার্ন শব্দটি সর্বদা কাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে, শিং অর্থে কখনো ব্যবহৃত হয়নি, তাই এর নিহিতার্থ হলো, মহান আল্লাহ্ তা'আলা একটি সূক্ষ্ম ইঙ্গিত দিচ্ছেন যে, যুলক্বার্নাইন সম্পর্কিত বর্ণনাটি দু'টি যুগের উপর প্রযোজ্য হবে।

প্রথম যুগে, অর্থাৎ যুলক্বার্নাইনের যুগে, বিশ্বের রাষ্ট্রিয় ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত ছিল আল্লাহ্র প্রতি ঈমানের উপর, এবং সেটা অত্যাচারীকে শায়েস্তা করতে, এবং ঈমানদার ও সদাচারীদেরকে সমর্থন, সাহায্য ও পুরস্কৃত করতে ব্যবহৃত হতো, আর সেই ক্ষমতা সবচেয়ে আদিম মানুষদের অধিকারকেও সম্মান প্রদর্শন করতো।

দ্বিতীয় যুগ, যার উপর বর্ণনাটির প্রয়োগ হবে, সেটা বিশ্বে ইয়াজুজ ও মাজুজের মুক্তির মাধ্যমে আরম্ভ হবে। যখন সেই মুক্তি আরম্ভ হবে, তখন ক্ষমতা ঠিক যুলক্বার্নাইনের উল্টো ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হবে। ক্ষমতা এমন এক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হবে যা বাস্তবিকপক্ষে ঈশ্বরহীন, এবং অত্যাচারীকে শায়েস্তা করার পরিবর্তে অত্যাচার করার জন্যে এবং নিরপরাধকে শাস্তি দেয়ার জন্যে ব্যবহৃত হবে। যারা মার্জিত জীবনযাপন করে এবং মহান আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি ঈমানদার, তাদেরকে টার্গেট করার

জন্যে বা লক্ষ্যে পরিণত করতে ক্ষমতা ব্যবহৃত হবে। সবশেষে, এরূপ বিশ্ব-ব্যবস্থাতে ক্ষমতা ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হবে মানবাধিকারকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করতে। এই ক্ষমতা অন্যায়, ধ্বংস এবং সম্পূর্ণরূপে উচ্ছেদ করতে ব্যবহৃত হবে, এমনকি যারা আদিম জীবনযাপন করে তাদের উপরও নিপীড়ন চালাতে এবং বিশ্বের চরম দরিদ্র জনগণকে এক বিশাল অনাথ আশ্রমে পরিণত করতে ব্যবহৃত হবে।

আজকের যুগটা যথাযথভাবে সেই দ্বিতীয় যুগ। আধুনিক পশ্চিমা সভ্যতা আজকের বিশ্বের ক্ষমতার অধিকারী। এটা বাস্তবিকপক্ষে ঈশ্বরহীনতার উপর প্রতিষ্ঠিত। এটা ক্ষমতাকে ব্যবহার করে:

নিরপরাধীদের উপর যুলুম করতে, অপর দিকে অত্যাচারী এবং সেই সাথে অন্যায়কারীকে রক্ষা ও সহায়তা করতে;

সাধারণভাবে ধর্মের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে, এবং বিশেষভাবে ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে, এবং আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমানদার ও সদাচারপূর্ণ জীবনযাপনকারীকে টার্গেট করতে বা লক্ষ্যে পরিণত করতে;

সবচেয়ে আদিম এবং নিরাপত্তাহীন মানুষদেরকে টার্গেট বা লক্ষ্যে পরিণত করতে, যেখানে মানবাধিকারকে পদদলিত করে তাদেরকে তেলাপোকার ন্যায় বিলীন করে দেয়া যেতে পারে।

উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকার দক্ষিণাঞ্চল এবং হাইতি ইত্যাদি দেশের জনগণের উপর পশ্চিমা সভ্যতার পরিচালিত বর্বর জাতি নিধন এবং নিষ্ঠুর আত্যাচার হলো তাদের আচরণের দুঃখজনক উদাহরণ, এবং সেই একই পাশবিক ও ধর্ষণধর্মী কাজ আজও আফগানিস্তান, সোমালিয়া, ইরাক ইত্যাদি দেশে অব্যাহত রয়েছে। ইতিহাসের কোন গোলামী এতটা বর্বর ও নিষ্ঠুর ছিল না যতটা ছিল কৃষ্ণাঙ্গ আফ্রিকানদের উপর আরোপিত পশ্চিমা গোলামী, যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা নির্মাণে সেসব কৃষ্ণাঙ্গদের শ্রমের শোষণ, এবং দক্ষিণ ও মধ্য আমেরিকান ইন্ডিয়ানদের উপর পরিচালিত একই ধরনের বর্বর ও নিষ্ঠুর শোষণ।

উত্তর আমেরিকার অবিচারের প্রতিবাদে সবচেয়ে দীপ্ত ও ন্যায়নিষ্ঠ কণ্ঠ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন *Malcolm X*। অত্যাচারিত দক্ষিণ আমেরিকান ইন্ডিয়ানরা, ভেনিযুয়েলার হুগো শাভেজ, বলিভিয়ার মোরুলেস, প্রমুখ হলেন অত্যাচার থেকে স্বাধীনতা রক্ষার্থে সমান সাহসী এবং ন্যায়নিষ্ঠ। পশ্চিমা শ্বেতাঙ্গদের (সব শ্বেতাঙ্গ কিন্তু

অত্যাচারী নয়) চেহারা এতটাই কুৎসিত ও ঘৃণিত হয়ে গেছে যে এখন তাদের দরকার তাদের কালো চেহারা কোন আমেরিকান প্রেসিডেন্টের আড়ালে লুকানো।

যখনই পশ্চিমা সভ্যতা কোন অইউরোপীয় দেশ দখল করে নেয় তখনই সেখানের অধিবাসীরা বিপদের সম্মুখীন হয়। কখনো তারা তাদেরকে গোলামে পরিণত করেছে, আর কখনো তাদেরকে বিলুপ্ত করে দিয়েছে। ২৬শে জুন ১৯৩৮ সালের ইন্ডিয়ার *Sunday Times*-এ প্রকাশিত রিপোর্টটি খেয়াল করুন, যেটা অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে আমাদের শিক্ষক, অসাধারণ স্মরণশক্তির আশির্বাদপ্রাপ্ত, মাওলানা ড. ফজলুর রহমান আনসারী (রঃ) সংরক্ষণ করে রেখেছিলেন:

একটা সম্পূর্ণ জাতি নিধন, তাসমানিয়াতে ব্রিটেনের রেকর্ড

সাম্রাজ্য বিস্তার একটি গোটা জাতিকে ১০৪ বছরে বিলুপ্ত করে দিয়েছে। The Inquirer থেকে তাসমানিয়ার ট্রাজেডীময় ইতিহাস তুলে ধরে পর্যবেক্ষণ করেছেন *J. W. Pynter*:

তাসমানিয়ার নামকরণ করা হয়েছে *Abel Jansen Tasman*-এর নামে। যিনি ১৬৪২ সালে সর্বপ্রথম এটাকে আবিষ্কার করেন। প্রায় দেড় শতাব্দি এই দ্বীপের আদিম অধিবাসীদের উপর কোন শ্বেতাঙ্গের নজর পড়েনি। ১৭৭২ সালে একজন ফরাসি ক্যাপ্টেন তার দলবল নিয়ে এখানে অবতরণ করেন এবং সেখানের অধিবাসীদের একটা দলের সাথে তাদের দেখা হয়। আদিবাসীদের একজন সামনে গিয়ে তাদের একজন নাবিককে একটা মশাল দেয় যেটাকে ফরাসি লোকটি আক্রমণ হিসেবে আখ্যায়িত করে এবং তাদের উপর আগুন লাগিয়ে দেয়। তারা পালিয়ে যায়, একজন মারা যায় অনেকে হতাহত হয়।

ভয়ংকর নিষ্ঠুরতা

১৮০৩ সালে একজন ব্রিটিশ ক্যাপ্টেনকে ভারপ্রাপ্ত করে এখানে স্থায়ী হতে পাঠানো হয়। ট্রাজেডীর আরম্ভ এখান থেকে ... শিশু ও মহিলাসহ কিছু অধিবাসী একদিন শ্বেতাঙ্গদের ক্যাম্প থেকে কিছুটা উঁচু স্থানে আবির্ভূত হয়। তারা কোন বৈরীতা সেখানে দেখায়নি কিন্তু কোন অজ্ঞাত কারণে তাদের উপর আগুন লাগিয়ে দেয়া হয় তাতে বহু নিহত হয়। শ্বেতাঙ্গদের আচরণ এতটা বীভৎস ছিল যে, সেখানে নিয়োজিত গভর্ণর ১৮১৭ সালে আদিম অধিবাসীদের উপর পরিচালিত সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে অধ্যাদেশ ঘোষণা করেন।

টার্গেট করা

সেখানের অধিবাসীদের সবচেয়ে বড় শত্রু ছিল শ্বেতাঙ্গ অপরাধীরা (convicts) এবং বনরক্ষীরা। তারা সেখানের অধিবাসীদেরকে গাছে ঝুলিয়ে রাখতো, টার্গেট করতো এবং জোরপূর্বক মহিলাদের ছিনিয়ে নিয়ে যেত। অধিবাসীদের উপর নির্মম অত্যাচারের কারণে ১৮২৪ সালে "উপনিবেশ এবং অন্যান্যরা" নামে সেখানে একটি সতর্কবার্তা ঘোষণা করা হয়।

কিন্তু তাদের উপর থেমে থেমে আক্রমণ চলছিলই।

সেখানে অধিবাসীদের চূড়ান্ত ভাগ্য নির্ধারিত হয় যখন মূল দ্বীপ থেকে তাদেরকে *Bass Strait*-এর এক নিস্ফলা উপদ্বীপে পাঠিয়ে দেবার হৃদয়বিদারক সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সে দ্বীপে তারা দ্রুত মারা যেতে থাকে। ফেব্রুয়ারীর ১৮৬৯ সালে *William Laune* নামে সেখানের শেষ তাসমানিয়ান পুরুষ মারা যায় এবং ১৮৭৬ সালে মারা যান *Truganina*, সেখানের শেষ মহিলা।

রহস্যময় ইহুদি-খ্রিস্টান চক্রের প্রধান হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র ব্রিটেনের স্থলাভিষিক্ত হয়, এবং এরাই ইউরো-ইহুদি-ইসরাঈলি রাষ্ট্রের পক্ষ নিয়ে ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাচ্ছে। এটা সেই **ইহুদি-খ্রিস্টান চক্র** যারা আধুনিক পশ্চিমা ধর্মনিরপেক্ষ সভ্যতা গড়ে তুলেছে এবং সমগ্র মানবজাতিকে ক্ষয়িষ্ণু ঈশ্বরহীনতা আলিঙ্গন করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। **উসমানিয়া ইসলামি খিলাফত** এবং **দারুল ইসলাম** ধ্বংস করে সেখানে ক্লায়েন্ট রাষ্ট্র, যেমন *Republic of Turkey* এবং *Kingdom of Saudi Arabia* বসাবার মাধ্যমে বিশাল বিজয় লাভ করেছে। এভাবে ইহুদি-খ্রিস্টান চক্র নিরাপত্তা লাভ করেছে, এবং কার্যকরভাবে ***হারামাইন*** ও ***হজ্বের*** নিয়ন্ত্রণ লাভ করেছে।

ইহুদি-খ্রিস্টান চক্রটিই যে ইয়াজুজ ও মাজুজীয় বিশ্ব-ব্যবস্থার কারিগর এই বইয়ে সেটাই চিহ্নিত হয়েছে। তারা যে সহীহ বুখারীতে বর্ণিত নবী (সাঃ)-এর ভবিষ্যদ্‌বাণীকে বাস্তবায়িত করবে, এটা এখন সময়ের ব্যাপার।

ليحجن هذا البيت و ليعتمرن بعد يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ

লোকেরা এমনকি ইয়াজুজ ও মাজুজের মুক্তির পরও কাবাতে হজ্ব এবং উমরাহ পালন করতে থাকবে। শু'বা (রাঃ) এতে অতিরিক্ত যোগ করেন,

لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت

সা'আ ততক্ষণ পর্যন্ত আসবে না যতক্ষণ না হজ্ব বাতিল হচ্ছে।

[সহীহ বুখারী]

কুর'আনের সূরা মায়িদার একটি আয়াত **ইহুদি-খ্রিস্টান চক্রের** আবির্ভাবের ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছে এবং কঠোরভাবে নিষেধ করেছে এরকম ইহুদি-খ্রিস্টানদের সাথে বন্ধুত্ব করতে। টিকা টিপ্পনীর মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা ব্যতীত আয়াতটিকে অনুবাদ করা কষ্টকর। যাইহোক, আমরা আমাদের মন্তব্যকে ব্র্যাকেটের মধ্যে দিয়েছি যেন অনুবাদকে, যা মোটা অক্ষরে লেখা, আমাদের মন্তব্য থেকে আলাদা করা যায়।

(মহান আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি ঈমান আনা) **হে ঈমানদারেরা! ইহুদি-খ্রিস্টানদেরকে বন্ধু, সহায়তাকারী, সমর্থক, দাতা হিসেবে গ্রহণ করো না।** (এটা কেন?) (কারণ হচ্ছে) **তাদের কেউ কেউ** (তাদের মধ্য থেকে) **হচ্ছে** (বা হবে) **বন্ধু, সহায়তাকারী, সমর্থক, দাতা** (তাদের মধ্য থেকে) **একে অন্যের**। (এই আয়াত সকল ইহুদি-খ্রিস্টানদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখতে নিষেধ করেনি, কিন্তু মুসলিমদেরকে নিষেধ করছে CENTO, SEATO, NATO অথবা এরূপ মিত্রতা স্থাপনাগুলির সাথে সম্পর্ক করতে, যা আরব দেশকে সৌদি আমেরিকান রাজ্যে, অর্থাৎ Saudi American Kingdom-এ পরিণত করেছে। এটা এমন এক সময়ের ভবিষ্যদ্‌বাণী যখন ইহুদি-খ্রিস্টানরা রহস্যজনকভাবে একে অপরের সাথে একত্রিত হবে এবং **ইহুদি-খ্রিস্টান চক্র** প্রতিষ্ঠা করবে। কুর'আন এরূপ খ্রিস্টান, যারা ইহুদিদের সাথে এক কাতারে এসেছে, এবং অন্যান্য খ্রিস্টানদের মাঝে পার্থক্য তৈরী করেছে (দেখুন, মায়িদাহ ৫:৮২) যারা হবে মুসলিমদের নিকট বন্ধুদের অন্যতম। এরূপ ইহুদি-খ্রিস্টান যারা একে অপরের বন্ধু, এদের সাথে বন্ধুত্ব ও মিত্রতা স্থাপনকে নিষেধ করতে ঐশ্বরিক আদেশ নেমে এসেছে। **তোমাদের মাঝে যে তাদের দিকে** (মিত্র হিসেবে) **ফিরে যাবে, বস্তুত সে তাদের একজনে পরিগণিত হবে।** (এরূপ মুসলিমেরা ইহুদি-খ্রিস্টান ইয়াজুজ ও মাজুজীয় ঈশ্বরহীন বিশ্বব্যাপী সমাজে, অর্থাৎ Judeo-Christian Gog and Magog godless global society-র সাথে মিশে গিয়ে আল্লাহ্‌র প্রতি অবিশ্বাসীতে (**কাফিরে**) পরিণত হবে এবং তাদের ইসলামকে হারাবে)। **বস্তুত যারা যুলুম করে আল্লাহ্ তাদেরকে হেদায়েত করেন না।** (আয়াতটি সতর্কবাণী পেশ করেছে যে, **ইহুদি-খ্রিস্টান চক্রটির** ট্রেডমার্ক হবে যুলুম অর্থাৎ অন্যায়, অবিচার, এবং ঘৃণিত কাজ। মুসলিমদের এই সাধারণ

বিবেকটুকু থাকতে হবে যে, তাদের সাথে মিলিত হওয়া যাবে না, কারণ ঐ সমস্ত লোকদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা নিজেই হেদায়েত করছেন না)।

[মায়িদাহ ৫:৫১]

পবিত্র কুর'আনের আয়াতটিতে, মুসলিমদেরকে, আজকের পৃথিবীতে যারা শাসন করছে (অর্থাৎ ইয়াজুজ ও মাজুজীয় বিশ্ব-ব্যবস্থা) এবং যারা ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাচ্ছে, তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। আর যথাযথভাবেই এটা সম্পাদন করেছে ক্লায়েন্ট রাষ্ট্র সৌদি আরব রাজ্য client-State Kingdom of Saudi Arabia। নতুন **সালাফি আলেমরা** এটাকে উপলব্ধি করতে পারছে না, অথবা তারা এতে কোন সমস্যা দেখতে পাচ্ছে না। বাস্তবিকপক্ষে সমগ্র মুসলিম বিশ্ব এটাই করে এসেছে এবং *United Nations Organization, International Monetary Fund and World Bank,* এদের কালো থাবাকে আলিঙ্গন করার মাধ্যমে নিজেদেরকে সর্বনাশা ফাঁদের কবলে আটকে ফেলেছে। **ইহুদি-খ্রিস্টান চক্রের** লেলিয়ে দেয়া এই অত্যাচারের ভবিষ্যদ্বাণী নবী (সাঃ) আজ থেকে ১৪০০ বছর আগে করেছেন:

মুসলিমরা ইহুদিদের সাথে যুদ্ধ না করা পর্যন্ত শেষ সময় আসবে না। মুসলিমরা ইহুদিদের হত্যা করতে থাকবে এবং এমন অবস্থা আসবে যে, ইহুদিরা একটি গাছ বা (বড়) পাথরের আড়ালে লুকাবে এবং গাছ বা পাথর বলবে: হে মুসলিম! হে আল্লাহ্র বান্দা! আমার পিছনে ইহুদি (লুকিয়ে) আছে, আসো এবং তাকে হত্যা করো ...।

[সহীহ মুসলিম]

মহান আল্লাহ্ ঘোষণা করেছেন, **"***যারা তাদের বন্ধু এবং মিত্র হিসেবে তাদের কাছে ফিরে যায় তারা তাদেরই একজন (এবং এ কারণে তারা আর আমাদের কেউ নয়)।"* আর একারণেই মুসলিমদের এখন একটি ইসলামি রাজনৈতিক আকিদার প্রয়োজন যার মাধ্যমে তারা এসব আচরণের প্রতি সঠিক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে পারবে যাতে জড়িয়ে পড়াকে মহান আল্লাহ্ তা'আলা কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। এই আচরণ অত্যন্ত অশুভভাবে প্রকাশ পাচ্ছে অন্তরবিহীন, বিবেকবিহীন মুসলিমদের প্রতিমা পূজার মাধ্যমে, যেমন, *US Visa* যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা, *Green Card* গ্রীন কার্ড এবং *Citizenship* নাগরিকত্ব লাভের মোহ।

ইয়াজুজ ও মাজুজের মুক্তির আরো তাৎপর্য কুর'আনের সূরা কাহাফে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যুলক্বার্নাইনের প্রাচীর নির্মাণের পর ইয়াজুজ ও মাজুজরা কার্যত আটকা পড়েছিল। তিনি ঘোষণা করেছিলেন, এই প্রাচীর (নির্মাণ) আল্লাহ্‌র রহমতের (ফল)। উপরন্তু, তিনি সতর্ক করে বলেন, মহান আল্লাহ্‌র সাবধান করে দেয়া সময়টি (ইয়াওম আল কিয়ামার নিকটবর্তী সময়) যখন আসবে তিনি নিজেই প্রাচীরটিকে সমান বা ধ্বংস করে দিবেন এবং বিশ্বে ইয়াজুজ ও মাজুজকে মুক্ত করে দিবেন:

قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا

(যুলক্বার্নাইন) বলল: (প্রাচীর নির্মাণে আমাদের সফলতা, যেটা ইয়াজুজ ও মাজুজের সাথে সম্পর্কযুক্ত) আমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে রহমত! যখন আমার প্রতিপালকের নির্ধারিত দিন আসবে (শেষ যুগ) তিনি একে মাটিতে সমান করে দিবেন (অর্থাৎ ধ্বংস করে দিবেন) আর আমার প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি (সতর্কবাণী) অবশ্যই আসবে ...।

[কাহাফ ১৮:৯৮]

সূরা কাহাফের পরবর্তী দু'টি আয়াত ইয়াজুজ ও মাজুজকে মুক্ত করে দেবার আসল নিহিতার্থ উল্লেখ করছে:

وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا

... একদিন আমরা (সমস্ত মানবজাতিকে বাহির করে আনবো এবং) তাদেরকে তরঙ্গের মতো ছেড়ে দিবো (যাতে সংঘর্ষ বাধে) একে অপরের বিরুদ্ধে (অথবা একে অপরের সাথে একেত্রিত করে) এবং (বিচারের) শিঙ্গা যখন বাজানো হবে, আমরা তখন তাদের সকলকে একসাথে নিয়ে আসবো।

[কাহাফ ১৮:৯৯]

وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا

এবং যারা সত্যকে (কুর'আন) অস্বীকার করেছিল আমরা সেদিন জাহান্নামকে তাদের সকলের চোখের সামনে এনে উপস্থিত করবো ।

[কাহাফ ১৮:১০০]

উপরে উল্লেখ করা, প্রথম আয়াতে মহান আল্লাহ্‌ তা'আলা সমসাময়িক বিশ্বায়নের একটা ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। ইউরোপীয়দের যুলুম নির্যাতনে ভরা বিজয়

অভিযান এবং অইউরোপীয় বিশ্বে উপনিবেশগুলি পরবর্তীতে ইউরোপীয় ঈশ্বরহীন ক্ষয়িষ্ণু জীবনধারার কার্বন কপিতে পরিণত হবে, এবং সেই "তরঙ্গ একে অপরকে আঘাত করবে এবং তারপর একে অপরের সাথে মিশ্রিত হবে"। আয়াতটিতে এই রূপরেখা যথাযথভাবে আলোচিত হয়েছে। দ্বিতীয় আয়াতটিতে সতর্ক করা হয়েছে, বিশ্বায়ন পৃথিবীকে একটা জাহান্নামে পরিণত করবে এবং আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমানদার সে সময় ঈমান বাঁচিয়ে রাখতে ক্রমশ সেই ঈশ্বরহীন এবং ক্ষয়িষ্ণু বিশ্বব্যাপী সমাজ থেকে *আলাদা* হতে বাধ্য হবে।

সর্বজ্ঞানী মহান আল্লাহ্ তা'আলা জানতেন খুব কম সংখ্যক লোকই বিচ্ছিন্ন হওয়াকে পছন্দ করবে আর একারণেই হাদীসে বলা হয়েছে, ১০০০ জনে ৯৯৯ জন ইয়াজুজ ও মাজুজের মিলনস্থলে যোগ দিবে এবং জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ পৃথিবী কেবল ঈশ্বরহীন, আইনবিহীন এবং অত্যাচারীই নয় বরং সেই সাথে সমগ্র মানবজাতিকে একটা ঈশ্বরহীন বিশ্বব্যাপী সমাজে পরিণত করতে বদ্ধ পরিকর। এই লক্ষ্য অনেকটাই বাস্তবায়িত হয়েছে। বিশ্বব্যাপী সমাজ ব্যবস্থার মূখ্য উদ্দেশ্য হলো, অবশ্যই এবং নিশ্চিতভাবে, ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক, সকল মানবজাতিকে ইসরাঈলি রাষ্ট্রের সামনে নতি স্বীকার করতে হবে এবং ইসরাঈলকে বিশ্বের নিয়ন্তা রাষ্ট্র হিসেবে মেনে নিতে হবে।

আজকের পৃথিবীর এই ঈশ্বরহীন এবং ক্ষয়িষ্ণু স্রোতধারার আলিঙ্গনকে প্রতিহত করতে যারা প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে, তাদের মাধ্যমেই নবী (সাঃ)-এর প্রকৃত অনুসারীদেরকে সনাক্ত করা যাবে। আর অধিকাংশ মানুষই সেই স্রোতধারার সমাজে ঝুঁকে পড়বে যেটা ভয়াবহ ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এই জিনিসটাকে মুসলিমরা অবহেলা করেছে, সেকারণেই ইয়াজুজ ও মাজুজীয় রাষ্ট্র ব্যবস্থা কোন রকম ছদ্মবেশ ছাড়াই ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। মুসলিমরা এই ক্রমবর্ধমান যুলুম-নির্যাতনের প্রতি তাদের প্রতিক্রিয়া কিভাবে ব্যক্ত করবে?

যারাই ঈশ্বরহীনতাকে আলিঙ্গন করবে তারা আল্লাহ্‌কে ভুলে যাবে। এরকম মুসলিমরা শেষ পর্যন্ত রাস্তায় অর্ধ উলঙ্গ পোশাক পরিধান করে *Gay Lesbian* এর অধিকার আদায়ের মিছিলে যোগ দিবে। এরকম মুসলিমরা ক্ষয়িষ্ণু জনতার একটা অংশে পরিণত হবে যারা আধুনিক বেহায়া গান এবং বাদ্যের তালে তালে আনন্দে নাচতে থাকবে। কুর'আন মু'মিনদেরকে নিষেধ করেছে যেন এরকম মানুষদের মতো না হয়, কেননা আল্লাহ্‌কে ভুলে যাবার (অর্থাৎ আল্লাহ্ প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করার) যে মাশুল তাদেরকে দিতে হবে তা হচ্ছে, তারা নিজেদের সত্তাকে ভুলে যাবে অর্থাৎ ফলশ্রুতিতে

তারা নিজেদের অপরিহার্য মনুষ্যত্বের চেতনাকে হারিয়ে ফেলবে (কুর'আন, সূরা হাশর ৫৯:১৯)। এরকম সমাজ আর মানব সন্তান জন্ম দেয় না। বরঞ্চ এরূপ সমাজের শিশুরা হলো মানব রূপধারণকারী পশু। অন্যকথায়, তারা শুকর, গাধা, বানর ইত্যাদির মতো আচরণ করতে থাকে। নবী (সাঃ) এরকম একটা সময়ের ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছেন যখন মানুষ প্রকাশ্যে গাধার ন্যায় যৌনমিলনে লিপ্ত হবে। যাদের দেখার মত চোখ রয়েছে, তারা ইতোমধ্যেই চিহ্নিত করে ফেলেছেন গাধার ন্যায় প্রকাশ্যে যৌনমিলনের সময় এসে পড়েছে। এধরনের সমাজ ও বিশ্বের প্রতি মুসলিমদের আচরণ কি হওয়া উচিত, যা একটা যৌন ডাস্টবিনে প্রবেশ করছে?

রাজনৈতিক বিশ্বায়নের পরিণতি হলো **শির্ক** যেটা সমগ্র বিশ্বের রাজনীতিকে ঘিরে ধরেছে। আধুনিক যে কোন রাষ্ট্র যখন নিজেকে সার্বভৌম হিসেবে এবং এর আইন ও ক্ষমতাকে চূড়ান্ত হিসেবে ঘোষণা করেছে, তখন এর **শির্ক** খুবই পরিষ্কার, কারণ এটা আল্লাহ্‌র হারাম ঘোষণা করা জিনিসকে হালাল করতে পারে (এ পর্যন্ত এটাই করা হচ্ছে)। কিভাবে মুসলিমরা আধুনিক রাষ্ট্রের **শির্ক** থেকে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রাখবে?

অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন এমন একটা বিশ্ব প্রতিষ্ঠা করেছে যা ***রিবা* বা সুদের** উপর প্রতিষ্ঠিত, যার ***ফলশ্রুতিতে বিশ্বের অধিকাংশ জনগণের উপর নতুন অর্থনৈতিক গোলামী আরম্ভ হয়েছে***। রাজনৈতিক ঈশ্বরহীনতা, অর্থনৈতিক বৈষম্য, আইনকানুনের অবজ্ঞা, সন্ত্রাস, নৈরাজ্য, হত্যা এবং ধর্ষণ ইত্যাদি ক্রমশ বেড়েই চলেছে। এটা পরিষ্কার যে, সমাজ নিজ থেকেই ধ্বসে পড়ছে এবং টুকরো টুকরো হয়ে পড়ছে।

পরিবার সমাজ ব্যবস্থার মজবুত ভিত্তি। বিশ্বের বিপুল পরিমাণ নারীকে মোহিত করা এবং ভয়ানক গোমরাহীর দিকে পরিচালনাকারী অশুভ নারী বিপ্লবের ফলস্বরূপ এই মজবুত ভিত্তি পর্যন্ত ধ্বসে পড়তে আরম্ভ করেছে।

আজকের *Godless World Order* ঈশ্বরহীন বিশ্ব-ব্যবস্থাকে মনোমুগ্ধকর করার প্রধান কারিগর হলো ভন্ড মসীহ দাজ্জাল। এর মাধ্যমে সে গোটা মানবজাতিকে সকল পরীক্ষার বড় পরীক্ষায় ফেলে দিয়েছে।

ইয়াজুজ ও মাজুজকে বিশ্বে ছেড়ে দেয়ার ধাপসমূহ

একবার আমরা যখন চিহ্নিত করেছি যে ইয়াজুজ ও মাজুজের মুক্তি হয়ে গেছে, তখন আমাদের প্রয়োজন যে, তাদের মুক্তির ধরন কি রকমের হবে তা বের করা।

একাধিক হাদীস রয়েছে যেখানে বলা হয়েছে যে, বিশ্বে তাদের মুক্তি হবে ধাপে ধাপে। এটা সেই হাদীস থেকে পরিষ্কার যেখানে তাদের গ্যালিলী সাগর অতিক্রমের বিষয়টি আলোচিত হয়েছে:

> তাদের প্রথম জন টাইবেরিয়াস হ্রদের (গ্যালিলী সাগর) পাশ দিয়ে যাবার সময় সেখান থেকে পানি পান করবে। তাদের শেষ জন যখন সেই স্থান অতিক্রম করবে, সে বলবে, 'একদা এখানে পানি ছিল ...।'
>
> [সহীহ মুসলিম]

এটা কুর'আন থেকেও পরিষ্কার (সূরা আম্বিয়া ২১:৯৫-৯৬), যেখানে ঘোষণা করা হয়েছে, ইয়াজুজ ও মাজুজের মুক্তির পর তাদেরকে সবদিকে ছড়িয়ে পড়তে হবে অথবা প্রত্যেক উঁচু স্থান থেকে নেমে আসতে হবে এবং তখনই শহরের অধিবাসীদেরকে তাদের **শহরের** দাবী নিয়ে ফিরিয়ে আনা হবে। ফলস্বরূপ, আমরা এখন তাদের মুক্তির এক বিশেষ ধাপ চিহ্নিত করার মতো অবস্থানে রয়েছি।

গ্যালিলী সাগরের পানি এতটাই তলিয়ে গেছে যে, এটাকে এখন মৃত সাগর হিসেবে আখ্যায়িত করা হচ্ছে। *Google search* এর মাধ্যমে এ বিষয়ের প্রকৃত অবস্থা পাঠকদের পক্ষে জানা খুবই সহজ। অতএব সে হিসেবে, ইয়াজুজ ও মাজুজের মুক্তির চূড়ান্ত ধাপ এখন নিকটবর্তী।

এ ব্যাপারে আরেক প্রমাণ হলো সূরা আম্বিয়ার আয়াত দু'টিতে উল্লেখিত **শহরটি** যাকে আমরা চিহ্নিত করেছি **জেরুযালেম** হিসেবে। বাস্তবতা হলো, ইসরাঈলের লোকেরা এখন তাদের **শহরের** দাবী নিয়ে **জেরুযালেমে** পুনরায় ফিরে এসেছে আর এটা থেকে বুঝা যায় যে, ইয়াজুজ ও মাজুজরা এখন সফলভাবে পৃথিবীর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে এবং বিশ্বের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে তুলে নিয়েছে।

ইয়াজুজ ও মাজুজরা এখন তাদের মুক্তির চূড়ান্ত ধাপের কাছাকাছি। আমাদের এই চিহ্নিতকরণ থেকে দু'টি ভয়াবহ পরিণাম বেরিয়ে এসেছে, যা নিচের বিষয়গুলির সাথে সম্পৃক্ত:

- ❖ বিশ্বের পরিণতি এবং
- ❖ আরবদের ভাগ্য।

উম্মুল মু'মিনীন জয়নব বিনতে জাহাশ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী (সাঃ) যখন ইয়াজুজ ও মাজুজের মুক্তি আরম্ভ হওয়া সম্পর্কিত ওহীটি দেখেন, তখন তিনি জাগ্রত হয়ে ঘোষণা করেন:

لإإله إلاالله ويل للعرب من شر قد إقترب

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ! আরবদের জন্যে ধ্বংস অনিবার্য, এক মহা অকল্যাণ তাদের কাছে আসছে।

"আমাদের ভিতর সৎলোক থাকা সত্ত্বেও কি আমরা ধ্বংস হয়ে যাবো?" প্রশ্নটি করে জয়নব বিনতে জাহাশ (রাঃ) ইয়াজুজ ও মাজুজের মুক্তি ও আরবদের বিপদ সম্পর্কিত তথ্যটি প্রকাশ করে দিয়েছেন। নবী (সাঃ) উত্তরে বললেন:

نعم إذا كثر الخبث

হ্যাঁ! যখন (বিশ্বে) খাবাস (নোংরামি) বৃদ্ধি পাবে।

الخبث। আল-খাবাস মানে হলো, আবর্জনা, বর্জ্য, ময়লার অংশ ইত্যাদি। আর الخُبْث। খুব্‌স অর্থ হলো, পাপাচার, নষ্টামী ইত্যাদি। আরবরা যে কেবল চরমভাবে ধ্বংস হবে তাই নয়, সেই সাথে তাদের ধ্বংস এমন একটা সময়ে সংঘঠিত হবে যখন পাপাচারী, নষ্ট লোকেরা বিশ্বে বৃদ্ধি পাবে। গোটা পৃথিবী নৈতিক বিশ্বাসে অপবিত্র, দুর্নীতিপরায়ন, অসভ্য, ইতর, ইত্যাদির ডাস্টবিনে পরিণত হবে।

এই হাদীসটি আরবদের ধ্বংসের একটা সময়সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছে অর্থাৎ যখন খাবাস বৃদ্ধি পাবে তখন ইয়াজুজ ও মাজুজের হাতে তাদের ধ্বংস নিকট থেকে আরো নিকটতর হবে। এটা পরিষ্কার যে, আমরা যখন এই বই লিখছি, ইতিহাসের যেকোন সময়ের তুলনায় সবচেয়ে পাপাচারী লোকদের দ্বারা (আজকের) পৃথিবী শাসিত হচ্ছে। পৃথিবী ইতোমধ্যেই ডাস্টবিন সমতুল্য অবস্থায় পৌঁছে গেছে, আর সেই সাথে আরবদের ধ্বংস আরম্ভ হয়ে গেছে।

পবিত্রভূমি এবং আরব বিশ্বের অন্যত্র আরবদের ধ্বংস সকল যুক্তিকে রোধ করে দেয়। তাসত্ত্বেও এই সত্য নাটক আজ পৃথিবী প্রত্যক্ষ করছে, যার ভবিষ্যদ্‌বাণী আরবের নবী মুহাম্মাদ (সাঃ) আজ থেকে ১৪০০ বছর আগে করেছেন। এই ঘটনা আরও নিশ্চিত করছে যে, তিনি এক আল্লাহ্‌র সত্য নবী, এবং এটা ইসলামের সত্যতার দাবীকেও নিশ্চিত করছে।

এরূপ একটা বিশ্বে মুসলিমরা একটা পথেই তাদের ঈমানকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে। সেটাই কুর'আনের সূরা কাহাফে (যে সূরাটি দাজ্জাল থেকে রক্ষা করে) বর্ণিত হয়েছে। মুক্তির সেই পথ হলো, ঈশ্বরহীন সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া। ঈশ্বরহীন এবং **ইয়াজুজ ও মাজুজীয় বিশ্ব-ব্যবস্থা** থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া বা অপসারিত হওয়ার প্রক্রিয়া সঠিকভাবে তখনই অর্জন করা সম্ভব হবে যখন মুসলিমরা সূরা কাহাফে উল্লেখিত যুবকদের উদাহরণকে অনুসরণ করবে, যারা এরূপ একটা বিশ্ব থেকে পালিয়ে গিয়েছিল এবং একটি গুহায় আশ্রয় নিয়েছিল।

কুর'আন নিজেই মুসলিমদেরকে এরূপ বিচ্ছিন্নতার নির্দেশ দিচ্ছে:

فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ

আপনি আমাদেরকে এরূপ পাপাচারী লোকদের থেকে বিচ্ছিন্ন করুন।

[মায়িদাহ ৫:২৫]

নবী (সাঃ) এরূপ একটি বিচ্ছিন্ন হবার সময়ের ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছেন এবং নিচের উপদেশ প্রদান করেছেন:

يوشك أن يكون خير مال يتبع بها شعف الجبال و مواقع القطر المسلم يفر بدينه من الفتن

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত: নবী (সাঃ) বলেছেন: "এমন একটা সময় আসবে যখন মুসলিমদের নিকট সর্বোত্তম সম্পদ হবে বকরী বা ছাগল, সে তা নিয়ে উঁচু পর্বত ও বৃষ্টিপাতের স্থানগুলিতে চলে যাবে। এভাবে সে দ্বন্দ্ব, সংঘাত, পরীক্ষা (ফিতনা) থেকে নিজের দ্বীনসহ পলায়ন করবে ।"

[সহীহ বুখারী: কিতাবুল ঈমান]

মুসলিমরা যদি সূরা কাহাফের যুবকদের ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে, তাহলে তারা উপলব্ধি করবে যে, তারা নিজকে ও নিজ পরিবারকে ঈশ্বরহীনতা এবং ঘিরে থাকা পাপাচার থেকে রক্ষা করতে পারছে। তাদের উচিত হবে ইয়াজুজ ও মাজুজীয় সমাজ থেকে দূরবর্তী কোন স্থানে "মুসলিম গ্রাম" প্রতিষ্ঠা করে আড়ালে চলে যাওয়া।

যেখানেই পারা যায় সেখানেই মুসলিমদেরকে মাইক্রো বা ক্ষুদ্র ইসলামি জনপদ তৈরী করাতে মনোনিবেশ করতে হবে। যদি একটি প্রকৃত মুসলিম গ্রাম প্রতিষ্ঠা করতে হয়, যা আজকের ক্রমবর্ধমান ঈশ্বরহীন বিশ্বে মুসলিমদের ঈমানকে সংরক্ষণের উপায় করে দিতে পারে, তবে এটিকে নিচের শর্তাবলী অবশ্যই পূরণ করতে হবে:

✓ একটি **মুসলিম গ্রামে**র সাধারণ জীবন যাপন অবশ্যই কুর'আন ও সুন্নাহর উপর প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। যা কিছুই কুর'আন ও সুন্নাহর উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, তা টিকে থাকার জন্যে প্রয়োজনীয়, এমন চিন্তা করা যাবেনা। একই ভাবে যদি কোন বিশেষ মুসলিম ধর্মীয় অনুশীলন প্রতিষ্ঠা করা না যায়, হোক না তা অতি উপকারী অথবা মুসলিমরা সেটা দীর্ঘদিন পালন করে আসছে, সেটাকে মসজিদ বা **মুসলিম গ্রামে**র বাহ্যিক জীবনে আনা যাবেনা। যদি সেটা মুসলিমদের মাঝে দলাদলি বা সংঘর্ষের কারণ হয়ে দাঁড়ায় তাহলে সেটাকে অনুমোদন করা যাবে না। আর এভাবেই **মুসলিম গ্রাম** সমসাময়িক কলুষিত মুসলিম সমাজের সকল অশুভ প্রচেষ্টা যা কুর'আন, সুন্নাহ এবং আসলাফদের (সালাফের বহুবচন, এর মানে পূর্বসূরী মুসলিম) পথের উপর প্রতিষ্ঠিত নয় সেটা থেকে নিরাপদ থাকবে। এর একটা প্রয়োগ হতে পারে যে, প্রত্যেক জুমু'আতে গ্রামের কোন নির্জন স্থানে সম্মিলিতভাবে সূরা কাহাফের তিলাওয়াতের **হাল্‌কায়ে যিকির** আয়োজন করা যেতে পারে।

✓ মুসলিম গ্রামকে অবশ্যই খাদ্য উৎপাদনে এবং জ্বালানীতে স্বাবলম্বী হতে হবে। কুর'আনের সূরা কাহাফ চিহ্নিত করেছে, সৌরশক্তির মাধ্যমে (মুসলিম) গ্রামটি জ্বালানীতে স্বাধীনতা অর্জন করতে পারে।

وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ

আর তুমি যদি তাদের দেখতে, সূর্য উদিত হলে তাদের গুহার ডানে হেলে পড়ছে আর অস্ত গেলে তাদেরকে বামে রেখে সরে যাচ্ছে। তখন তারা ছিল তাদের গুহার আঙ্গিনায়, এরা আল্লাহ্‌র নিদর্শনের অন্তর্গত; তুমি তাদেরকে মনে করবে তারা জাগ্রত অথচ তারা ছিল ঘুমন্ত এবং তাদেরকে ডানে ও বামে পরিবর্তন করিয়েছি।

[কাহাফ ১৮:১৭-১৮]

যুবকদের ডানে ও বামে **পার্শ্ব পরিবর্তন** সূর্যের আলোর মাধ্যমে অর্জিত হতো। সূর্যের আলোর প্রতি আকর্ষণের মাধ্যমে একটি গাছের **ফটোট্রপিযম** সম্পন্ন হয়। সূর্যালোক পেতে গাছপালা সেদিকে হেলে পড়ে। সূর্যালোকের আকর্ষণের কারণে যুবকদের ঘুমন্ত শরীর এপাশ থেকে ওপাশ নড়াচড়া করতো। গাছপালা সূর্যালোককে শক্তিতে পরিণত করে আর একে বলা হয়

ফটোসিনথেসিস। গুরুত্বপূর্ণ অংগগুলিতে এভাবে শক্তির সরবরাহ যুবকদের দীর্ঘ ঘুমন্ত সময়ে তাদের দেহগুলিকে সজীব রেখেছিল। **ফটোট্রপিযম** ও ফটোসিনথেসিস উভয়ের উপর মুসলিমদের দক্ষতা থাকতে হবে যাতে জ্বালানী-শক্তির স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে একে বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা যায়।

✓ সূরাটি খাদ্যের বিশুদ্ধতার প্রতি সতর্ক করে দিয়েছে। অতএব রাসায়নিক সার প্রয়োগ করা, জেনেটিক্যালি রিইঞ্জিনিয়ার্ড খাবার, হরমোনযুক্ত মাংস, দুধ ইত্যাদি পরিহার করতে হবে। মুসলিম গ্রামের উৎপাদিত উদ্বৃত্ত জৈব খাদ্য বাহিরে বিক্রি করা যাবে। এটা গ্রামের অর্থনীতির একটা ভিত্তি হতে পারে। একটি ফলপ্রসু বাণিজ্যিক কৌশলের সাথে যুক্ত হতে পারে। যেমন, খাদ্যের বিশুদ্ধতার সাথে যৌনতা এবং যৌন উন্মাদনার সম্পর্ককে অন্যান্য মানুষের সামনে তুলে ধরা। বিশুদ্ধ ও স্বাস্থ্যকর খাবার উৎপাদনের মাধ্যমে মুসলিম গ্রাম তা করতে সক্ষম হবে যেটা সম্পন্ন করতে বাকি বিশ্বের লোকেরা ক্রমশ অক্ষম হয়ে পড়ছে। অ্যালকোহল, মদ, মাদকতা নির্মূল করা, পতনশীল যৌন নৈতিকতাকে পুনরুদ্ধার করা, পারিবারিক একতাকে সংরক্ষণ করা, এমন একটা সময়ে যখন তা বিশ্বের সর্বত্র ধ্বসে পড়ছে। এসকল ক্ষেত্রে মুসলিম গ্রামের ভূমিকা অপরিসীম।

✓ মুসলিম গ্রামে একটি মাইক্রো বা ক্ষুদ্র বাজার প্রতিষ্ঠা করতে হবে যেটা বৃহৎ বাজার থেকে যথাসম্ভব স্বাধীন হবে। এটা বৃহৎ বাজারের নকল কাগজি মুদ্রার (যেটা পরবর্তীতে ক্যাশবিহীন ইলেকট্রনিক মুদ্রা দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে) পরিবর্তে আসল মুদ্রা (স্বর্ণ, রৌপ্য মুদ্রা) ব্যবহার করবে। আর এভাবেই ক্ষুদ্র বাজার টিকে থাকবে যখন কাগজি মুদ্রাভিত্তিক জালিয়াতিপূর্ণ আন্তর্জাতিক মুদ্রা ব্যবস্থা ধ্বসে পড়বে। আমি মনে করি, কাগজি মুদ্রাভিত্তিক আন্তর্জাতিক মুদ্রা ব্যবস্থা তখনই ধ্বসে পড়বে যখন ইসরাঈল তার সীমানাকে **মিসরের নদী** (নীল নদী) থেকে **ইরাকের ফোরাত নদী** পর্যন্ত বিস্তৃত করতে **মহা যুদ্ধ** আরম্ভ করে দিবে। আর মনে হচ্ছে এই যুদ্ধ এখন যেকোন সময় ঘটতে পারে। মাইক্রো বা ক্ষুদ্র বাজারের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো, এটা গ্রামের অর্থনীতিতে সম্পদের প্রবাহকে নিশ্চিত করবে, যে পথে দরিদ্ররা সবসময় স্থায়ী দরিদ্র থাকবে না আর ধনীরা সবসময় স্থায়ী ধনী থাকবে না, যেহেতু রিবা বা সব ধরনের সুদের কারবার (সামনের দরজার বা পেছনের দরজার

রিবা) এই গ্রামে নিষিদ্ধ থাকবে। তাই তথাকথিত ইসলামি ব্যাংকসমূহকে এখানে ব্যবসা করতে দেয়া হবে না।

✓ অভ্যন্তরীণ আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টি অর্জনের জন্যে মুসলিম গ্রামকে সুনির্দিষ্টভাবে ইহসান (অথবা তাসাউফ) লাভের প্রচেষ্টা চালাতে হবে। গ্রামের জীবন অত্যন্ত সহজ সরল, কঠোর আত্মসংযমী এবং ধার্মিক হতে হবে। এখানে শরী'য়াহ দৃঢ়ভাবে বলবৎ থাকতে হবে। উপরন্তু, শিক্ষার উপর মুসলিম গ্রামের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকতে হবে। শিক্ষার সকল স্তরে **কুর'আন** হবে শিক্ষার মূল কেন্দ্র। মুসলিম গ্রামের বাহিরে অবস্থিত মুসলিম বিদ্যালয়ের তুলনায় মুসলিম গ্রামে অবস্থিত মুসলিম বিদ্যালয়গুলির বিশাল উপকারিতা থাকবে। এরকম মুসলিম বিদ্যালয়ের সন্তানেরা এমন একটা মুসলিম জনসমষ্ঠি দ্বারা সহায়তা-প্রাপ্ত হবে যারা নিজেরাও ইসলামি জীবন যাপন করবে! এই মুসলিম গ্রামের সন্তানেরাই মুসলিম হিসেবে সঠিকভাবে প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা লাভ করবে!

✓ মুসলিম গ্রামে যারা বসবাস করবে তারা সবাই এক আমিরের নেতৃত্বে একটি জামা'আত গঠন করবে। আমির হবে এমন একজন যে দ্বীনকে ভালভাবে জানবে ও দ্বীন অনুযায়ী জীবনযাপন করবে। তাকে অবশ্যই আজকের পৃথিবী সম্পর্কে জানতে হবে। আরব, আফ্রিকান, তুর্কি, ভারতীয়, মালয় বা যাই হোন না কেন, তিনি জামা'আতের সকল সদস্যের উপর দ্বীন প্রয়োগ করবেন এবং তাদেরকে ***আস-সাম'উ ওয়াত্-ত্বা'আতু*** আচরণ মেনে চলতে শেখাবেন। এটা মুসলিম গ্রামের আভ্যন্তরীণ ঐক্য ও নিয়ম-শৃঙ্খলা বজায় রাখবে।

✓ মুসলিম গ্রাম অবশ্যই দেশ দখলের উপায় হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারবে না। যতক্ষণ ইয়াজুজ ও মাজুজীয় রাষ্ট্র ব্যবস্থা টিকে আছে, ততক্ষণ ইসলাম কোন রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ নিতে পারবে না, এমনকি ইসলামি খিলাফতও প্রতিষ্ঠা করা যাবেনা। সেই কাজের জন্য, অর্থাৎ অত্যাচার এবং দখলের বিরুদ্ধে **খোরাসান** থেকে বের হয়ে এক অস্ত্রসজ্জিত বাহিনী জেরুযালেমের কেন্দ্রে অবস্থিত অত্যাচারের বিরুদ্ধে অগ্রসর হবে। আর সেটা কখনো থেমে যাবেনা, কেননা সেখানে বিজয়ের চূড়ান্ত নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে। এটা আমাদের বইয়ের অন্যত্র উল্লেখ করা হয়েছে।

- ✓ মুসলিম গ্রামের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে মুসলিমদের ঈমানকে বাঁচিয়ে রাখা। আর একারণে মুসলিম গ্রাম কেবল ডাকাত, ধর্ষক, চোর, দস্যুদের মোকাবেলা ব্যতীত অস্ত্রে সজ্জিত হবে না। রাষ্ট্র যদি আক্রান্ত হয়, তবে সেটা মোকাবেলার কোন ক্ষমতা এর থাকবে না। যদি ইসলামের প্রতি বিদ্বেষী না হয় এবং মুসলিম গ্রামের সাধারণ জীবনযাপন মেনে চলার শর্তে রাজি হয়, তাহলে হিন্দু, খ্রিস্টান এবং অন্যান্যদেরকে মুসলিম গ্রামে অধিবাসী হবার জন্যে উৎসাহিত করা হবে। আর এভাবেই নিরাপত্তার প্রতি হুমকিবিহীন শান্তিপূর্ণ প্রকৃতির মুসলিম গ্রামের বিরুদ্ধে সন্দেহবাদীদের এবং অমুসলিমদের গুজব দূর হয়ে যাবে। অস্ত্রসজ্জিত না হওয়া সত্ত্বেও মুসলিম গ্রামের নিরাপত্তা এবং সকল গ্রামবাসীদের সম্মিলিত নিরাপত্তা নিশ্চিতের উপায় বৃদ্ধি করতে হবে। মুসলিম গ্রাম এমন হবেনা, যেখানে তারা লোহার বেড়ি দেয়া জানালার ঘরে কয়েদীর মতো জীবনযাপন করবে, অথবা তাদের ঘরগুলি অত্যাধিক নিরাপত্তা বিশিষ্ট হতে হবে। মুসলিম গ্রামের নিরাপত্তা ব্যবস্থা এমন হবে যে, নিরাপত্তা সহকারে একজন মুসলিম মহিলা রাতের বেলা গ্রামের চারদিক চলাফেরা করতে পারবে। মুসলিম গ্রামের নিরাপত্তা হবে বাকি অবরুদ্ধ বিশ্বের জন্য এক বিস্ময়কর রাজনৈতিক সবক।

কুর'আন ও সুন্নাহ থেকে প্রকাশিত সমগ্র হেদায়েত মুসলিম গ্রামে মুসলিম জনপদ প্রতিষ্ঠার কাজে অবশ্যই প্রয়োগ করতে হবে। আর এটাই হচ্ছে সেই কাজ যা আশির্বাদ-প্রাপ্ত স্মরণশক্তি বিশিষ্ট আমাদের শিক্ষক মাওলানা ড. ফজলুর রহমান আনসারী (রঃ) তাঁর *The Qur'ānic Foundations and Structure of Muslim Society* শিরোনামের অতুলনীয় বইতে সম্পন্ন করেছেন। ইসলামি আধ্যাত্মিকতার বিষয়টিকে অতি যত্নের সাথে তিনি সেখানে স্পষ্টভাবে এবং বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। আর এর মাধ্যমে তিনি সেই সকল সমালোচকদের জবাব দিয়েছেন যারা এই বই লেখার সময় আবির্ভূতই হয়নি। আধ্যাত্মিকতা ততক্ষণ পর্যন্ত অর্জন করা যাবেনা যতক্ষণ না তার পূর্বে নৈতিক বিশুদ্ধতা লাভের জন্যে নৈতিক সংগ্রাম চালানো হবে। এই বইয়ের বিশাল একটি অর্জন হলো, ইসলামি নৈতিক আইনের বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও বিন্যাস এবং ***তাযকিয়া*** (অর্থাৎ, আত্মিক পরিশুদ্ধি) এবং ***যিকিরের*** পদ্ধতির ব্যাখ্যা ও পথপ্রদর্শন করা। (যিকিরের অর্থ হলো স্নিগ্ধতা, সুভাস ইত্যাদি অর্জন করা, যা কেবল সত্যিকার ভালবাসাই দিতে পারে যখন তা হৃদয়কে আলিঙ্গন করে এবং হৃদয়ের গভীরকোণে স্থান করে নেয়। যিকিরের অর্থই হলো প্রিয়জনের স্মরণে বিভোর থাকা)।

আজকের উত্তাল সমুদ্রের যুগে মুসলিমদের টিকে থাকার জন্যে *The Qur'ānic Foundations and Structure of Muslim Society* বইটি একটি পাঠ্যবই, অনুশীলনী এবং পথপ্রদর্শক হিসেবে কাজ করবে। এই বইটি প্রধান নির্দেশনা হিসেবে কাজ করবে তাদের জন্যে যারা ইয়াজুজ ও মাজুজীয় বিশ্ব-ব্যবস্থা থেকে এবং নিরাপদভাবে আধুনিক দিনের ক্ষয়িষ্ণু ধর্মনিরপেক্ষ সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মুসলিম গ্রামে নির্ভেজাল মুসলিম জনপদ প্রতিষ্ঠা করতে চায়।

www.islamfind.wordpress.com

আট - উপসংহার

আধুনিক যুগে ইসলামের যেসকল প্রতিদ্বন্দ্বীরা দাবী করে যে সত্য কেবল তাদের নিকটেই রয়েছে সেসব দাবীদারদেরকে তাদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে আহ্বান জানানো এই বইটি রচনার বিশেষ উদ্দেশ্য, এবং সেই সাথে এই বইটির আরো উদ্দেশ্য হলো ইসলামের গন্ডির মধ্যে বহুসংখ্যক ফিরকাগুলিকে তাদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে আহ্বান জানানো। যে সমস্ত লোকেরা সত্যিকারের ইসলামি আধ্যাত্মিকতা (এর মানে, ইহসান বা তাসাউফ) অনুসন্ধানের জন্যে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এরা আদাজল খেয়ে নেমেছে।

বইটির আরো একটি উদ্দেশ্য হলো, বছরের পর বছর মাকড়শার জালের আবরণে ঢেকে থাকা ইয়াজুজ ও মাজুজ বিষয়টিকে জঞ্জাল-মুক্ত করে সহজ সরল করা। এই মাকড়শার জালগুলি বিষয়টিকে উপলব্ধি করতে অসম্ভব কঠিন বানিয়ে রেখেছে। এমনকি *Jewish Encyclopedia* ইহুদি বা জুইশ বিশ্বকোষ রহস্যজনকভাবে, আরবী সাহিত্যে ইয়াজুজ ও মাজুজকে নিয়ে উল্লেখিত বিষয়গুলিকে বেছে বেছে আরো ঘন মাকড়শার জাল লাগাতে সচেষ্ট হয়েছে। আমরা যেহেতু বইটি এখানে সমাপ্ত করছি, তাই পাঠকদের জন্য সেসমস্ত হাসি উদ্রেককারী মাকড়শার জালগুলি তুলে ধরার প্রয়াস করছি:

দৈহিকভাবে তারা ক্ষুদ্র, মানুষের অর্ধেক আকার বিশিষ্ট (ইয়াকুতের অন্য বর্ণনায় i. 113 তাদেরকে বড় হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে), খুব ভয়ংকর, নখের পরিবর্তে ধারালো নখরযুক্ত, সিংহের মতো দাঁত, উটের মতো চোয়াল এবং সমগ্র দেহ লোমে আবৃত। তাদের কান, চুল একদিকে এমন প্রসারিত যে তারা এক অংশকে বিছানা এবং আরেক অংশকে আবরণ হিসেবে ব্যবহার করে। তারা মূলত মাছ খেয়ে জীবনযাপন করে যেটা তাদেরকে অলৌকিকভাবে প্রদান করা হয়। তাদের আচরণ পশুর মতো। মাস্‌উদি তাদেরকে পশু হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তারা সৈন্যসামন্ত নিয়ে দেশ আক্রমণ করে, সব ধরনের সবুজকে তারা গিলে খেয়ে ফেলে। তাদের নিকটবর্তী লোকেরা তাদের থেকে বাঁচার জন্যে আলেকজান্ডারের কাছে একটি প্রাচীর নির্মাণের জন্যে অনুরোধ জানায়। তাদেরকে মানুষখেকো রাক্ষস হিসেবেও উল্লেখ করা হয়ে থাকে।

www.islamfind.wordpress.com

[*Jewish Encyclopedia, Emil G. Hirsh and Mary Montgomery* রচিত ইয়াজুজ ও মাজুজ *Gog and Magog* প্রবন্ধ]

এই বইয়ে পেশ করা যুক্তি এটা নিশ্চিত করছে যে ইয়াজুজ ও মাজুজরা হচ্ছে মানুষ। তাদেরকে অনেক আগেই বিশ্বে মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। **ইউরোপীয় ক্রুসেডের** মাধ্যমে তারা তাদের **হাজার বছরের লক্ষ্য** জেরুযালেমের ক্বার্ইয়াকে (অর্থাৎ **শহর**টিকে) মুক্ত করেছে, এবং 'শহরটি আমাদের' এই দাবী নিয়ে ইসরাঈলি ইহুদিদেরকে ফিরিয়ে আনতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। আর এর মাধ্যমে কুর'আনের সূরা আম্বিয়ায় ৯৫-৯৬ আয়াতে বর্ণিত তাদের ভূমিকাকে বাস্তবায়িত করেছে।

শক্তিশালী ইয়াজুজদেরকে আমরা চিহ্নিত করেছি যারা রহস্যজনক **ইহুদি-খ্রিস্টান চক্রের** মাঝে অবস্থিত। এই **চক্রই** তৈরী করেছে আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ পশ্চিমা সভ্যতা এবং **ইঙ্গ-মার্কিন-ইসরাঈল ত্রয়ী চক্র**। অপরদিকে, প্রতিক্রিয়াশীল মাজুজদেরকে আমরা চিহ্নিত করেছি যারা রাশিয়ার মাঝে অবস্থান করছে। কঠোরভাবে কুর'আন **ইহুদি-খ্রিস্টান চক্রের** সাথে মিত্রতা স্থাপন করতে নিষেধ করেছে। তবুও ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের সাথে এ ধরনের মিত্রতা ও বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে সৌদি রাজ্য *Kingdom of Saudi Arabia* ও পাকিস্তানের এলিট বা উচ্চস্তরের লোকেরা। কুর'আন ঘোষণা করেছে যারা সৌদি সরকার এবং মুসলিম বিশ্বের প্রায় সকল সরকার এবং তাদের সহায়তাকারী আলেমদের ***পথ অবলম্বন করবে তারা মুসলিম সমাজের পরিবর্তে ঐ চক্রের একজন হিসেবে বিবেচিত হবে (মায়িদাহ ৫:২৮)***। কিন্তু রাশিয়া (এবং বহু আমেরিকান, ব্রিটিশ, হিন্দু, ইহুদি ও খ্রিস্টান) বহুল পরিমাণে পশ্চিমা **ইহুদি-খ্রিস্টান চক্রের** অংশে পরিণত হয়নি। তাই রাশিয়া এবং বাইযানটাইন খ্রিস্টানদের সাথে মুসলিমদের মিত্রতা করতে কোন সমস্যা নেই। এটা ঘটতে যাচ্ছে, কেননা নবী (সাঃ) ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছেন:

ستصالحون الروم صلحا آمنا

তোমরা রূমের সাথে (অর্থাৎ পূর্বদেশীয় বাইযানটাইন খ্রিস্টানদের সাথে) মিত্রতা স্থাপন করবে।

শেষ সময়ের বহু আলামত, যেগুলির ভবিষ্যদ্‌বাণী নবী (সাঃ) করেছেন, সেগুলি **ইহুদি-খ্রিস্টান চক্রের** নির্মিত পশ্চিমা সভ্যতার সাথে সম্পর্কিত। ***মহিলারা পুরুষের ন্যায় কাপড় পরিধান করবে*** (নারীদেরকে সমাজে পুরুষের ভূমিকা আয়ত্ত করার দিকে ধাবিত করে নারী বিপ্লব তাদেরকে পথভ্রষ্ট করছে)। ***নারীরা কাপড় পরিধান করবে তারপরেও তাদেরকে উলঙ্গ মনে হবে*** (এটা এমন একটা যৌন বিপ্লব ঘটাবে যাতে

যৌনতা চূড়ান্তভাবে সবার নিকটে সূর্যের আলোর মতো সহজলভ্য হয়ে যাবে)। ***লোকেরা জনসম্মুখে গাধার ন্যায় যৌনমিলন করবে*** (ব্যক্তিগত যৌনমিলনের পরিবর্তে প্রকাশ্যে যৌনমিলনের প্রতি আজব আকর্ষণ)। ***পুরুষেরা নারীদের ন্যায় পোশাক পরিধান করবে*** (এর জন্যে দাড়ি শেভ করা বা কর্তন করা প্রয়োজন)। ***দাজ্জাল গাধার পিঠে চড়ে মেঘের গতিতে ভ্রমণ করবে এবং এর কান হবে অনেক প্রসারিত*** (অর্থাৎ আধুনিক জঙ্গীবিমান) ইত্যাদি।

ঐশ্বরিক আজ্ঞাবলে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় এই পশ্চিমা সভ্যতা আবির্ভূত হয়েছে। এর মিশন হলো সমগ্র মানবজাতিকে মিশ্রিত বা একত্রিত করে চরমভাবে পথভ্রষ্ট করা, এবং একটি ঈশ্বরহীন সমাজ তৈরী করা। ১০০০ জনের ৯৯৯ জন হবে সেই বিশ্বব্যাপী সমাজের নাগরিক। ইয়াজুজ ও মাজুজ বিশ্বব্যাপী সমাজকে চরমভাবে কলুষিত করবে, যে তাকে আলিঙ্গন করবে, সে বাস্তবিকপক্ষে ঈশ্বরহীন ক্ষয়িষ্ণু সভ্যতার প্রতিলিপিতে পরিণত হবে, এবং জাহান্নামের দিকে চালিত হবে।

আধুনিক পশ্চিমা ধর্মনিরেপক্ষ সভ্যতা মানব ইতিহাসে চোখ ঝলসানো একটি *নতুন ধর্মনিরপেক্ষ প্রভাতের* আবির্ভাবের দাবী করে। এর মাধ্যমে সমগ্র মানবজাতিকে (প্রকৃত মুসলিম ব্যতীত) পথভ্রষ্ট করে সে এটা অর্জন করবে। আজ এক ধর্মনিরপেক্ষ প্রভাত পূর্বের পরিবর্তে পশ্চিম দিক থেকে আবির্ভূত হয়েছে। ধর্মীয় **সত্যতা** যা ইব্রাহীম, মূসা, ঈসা এবং মুহাম্মাদ (তাদের উপর দুরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক)-এর মাধ্যমে আবির্ভূত হয়েছিল, সেটা এখন হয়ে যাচ্ছে সেকেলে, অস্তিত্বহীন এবং একে এখন ইতিহাসের যাদুঘরে ফেলে দেয়া হচ্ছে। উপরন্তু ***পশ্চিম দিক থেকে যে সূর্যোদয়*** হবে সেটা একটা মিথ্যা সূর্যোদয়, যা সত্যিকারের মুসলিমরা চিহ্নিত করতে এবং প্রত্যাখ্যান করতে পারবে।

ইউরোপীয় ক্রুসেডের সহায়তায় পবিত্রভূমিকে মুক্ত করার আজব মোহে লিপ্ত হওয়ার মাধ্যমে এই **ইহুদি-খ্রিস্টান চক্র** তৈরী করেছে **ইয়াজুজ ও মাজুজীয় বিশ্ব-ব্যবস্থা**। ঐশ্বরিক আজ্ঞাবলে বহিষ্কৃত ইসরাঈলি ইহুদিদেরকে প্রায় ২০০০ বছর পর **শহরে**র দাবী নিয়ে পবিত্রভূমিতে ফিরিয়ে আনতে এই বিশ্ব-ব্যবস্থা সফল হয়েছে। এই বিশ্ব-ব্যবস্থা পবিত্রভূমিতে একটি (প্রতারক) পবিত্র ইসরাঈলি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে সফল হয়েছে এবং সেই ইসরাঈলি রাষ্ট্রকে বিশ্বের **নিয়ন্তা রাষ্ট্রে**র মর্যাদা দিতে অগ্রসর হচ্ছে। এ সবকিছু করা হচ্ছে আল্লাহ্‌র তৈরী করা এবং *programmed* (নিয়ন্ত্রিত) শয়তানী এক সত্তার জন্যে,

অর্থাৎ ভন্ড মসীহ দাজ্জালের জন্যে, যেন সে জেরুযালেম থেকে বিশ্ব শাসন করতে পারে এবং নিজেকে **মসীহ** হিসেবে ঘোষণা করতে পারে।

উপরন্তু কুর'আন আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছে আল্লাহ্ নিজেই একদিন তাৎপর্যময় ইয়াজুজ ও মাজুজীয় সংঘর্ষ বাধিয়ে দেবেন। আমরা চিহ্নিত করেছি রাশিয়া হলো কুর'আনের মাজুজ আর তাই আমরা আসন্ন বিশ্বগ্রাসী **তারকা যুদ্ধের** অনুমান করতে পেরেছি। আমাদের অনুমান ইয়াজুজ (ইঙ্গ-মার্কিন-ইসরাঈলি **পশ্চিমা** চক্র) এবং মাজুজ তরঙ্গের ন্যায় **একে অপরের উপর আছড়ে পড়বে** (কাহাফ ১৮:৯৯)। আর এর মাধ্যমে তারা যে কেবল নিজেদেরকে ধ্বংস করবে তাই নয়, সম্ভবত অধিকাংশ উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপ, এবং সেই সাথে ঔদ্ধত্যপরায়ণ অত্যাচারী ইসরাঈলি রাষ্ট্রকে সম্পূর্ণ নিরাপত্তাহীন করে ফেলবে। সেই *Armageddon* **মহা যুদ্ধ** এতটাই নিকটবর্তী যে খুব সম্ভব আজকের স্কুলপড়ুয়া শিশুরা সেটা দেখার জন্যে বেঁচে থাকবে।

আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বিশ্বে **ইয়াজুজ ও মাজুজের মুক্তির নিহিতার্থ** আলোচনা করেছি। এর মধ্যে সবচেয়ে ভয়ানক ভবিষ্যদ্বাণী হচ্ছে, ১০০০ জনের ৯৯৯ জনই জাহান্নামে প্রবেশ করবে। স্বাভাবিকভাবেই এতে বিপুল পরিমাণ মুসলিমও পতিত হবে। উপরন্তু "আরবদের ধ্বংস" সম্পর্কিত আরো ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে, যেটা সংঘঠিত হবে যখন পৃথিবীতে খাবাস (যেমন প্রকাশ্য উলঙ্গতা এবং প্রকাশ্য যৌনমিলন) ছেয়ে যাবে। গাধার ন্যায় প্রকাশ্যে যৌনমিলন একদিন সংঘঠিত হবে এই ভবিষ্যদ্বাণী করার মাধ্যমে নবী (সাঃ) পরিষ্কারভাবে সেই খাবাসের দিকে ইঙ্গিত করেছেন।

এই বইটি যারা পাঠ করবে (বিশেষ করে মুসলিম), তাদের জন্যে এতে সতর্কবাণী রয়েছে। যদি তারা খাবাসে ছেয়ে যাওয়া সমাজে বসবাস করে, তবে তাদের সেসব মানুষদের থেকে বিচ্ছিন্ন হতে হবে। অন্যথায় তারা তাদেরই একজন হিসেবে বিবেচিত হবে, এবং এই লোকদের জন্যে অপেক্ষা করা শাস্তির মাঝে তারাও পতিত হবে। নবী (সাঃ) ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, দাজ্জালের দলে সর্বশেষে ভিড়বে নারীরা। এর তাৎপর্য হলো নারীরা এরূপ খাবাসপূর্ণ জীবনযাপন করবে। আর এই প্রেক্ষিতে আমরা বিচ্ছিন্ন সীমান্তবর্তী এলাকাতে **মুসলিম গ্রাম** প্রতিষ্ঠার পরামর্শ দিচ্ছি।

আধুনিক যুগে ইসলামের যেসকল প্রতিদ্বন্দ্বিরা দাবী করে যে সত্য কেবল তাদের নিকটেই রয়েছে, সেসব দাবীদারকে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে আহ্বান জানানো, বইটি রচনার আরেকটি উদ্দেশ্য। এবং সেই সাথে এই বইটির আরো উদ্দেশ্য হলো, ইসলামের গন্ডির ভেতরে বহুসংখ্যক ফিরকাগুলিকে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে আহ্বান

জানানো। যারা সত্যিকারের ইসলামি আধ্যাত্মিকতা (অর্থাৎ, ইহসান বা তাসাউফ) অনুসন্ধানের জন্যে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধে এই সমস্ত লোকেরা যুদ্ধ করতে আদাজল খেয়ে নেমেছে।

আধ্যাত্মিকতার অনুসন্ধান এজন্যে চর্চা করতে হবে যেন এই উপায়ে **নূর** (আলো) অর্জন করা যায়। আল্লাহ্‌র কাছ থেকে আগত এই **নূরের** মাধ্যমেই আজকের আজব আধুনিক পৃথিবীকে বুঝতে পারা সম্ভব (যেটা অন্যথায় দেখা বা উপলব্ধি করা যাবে না)। এরাই আজকের যুগের বাস্তবতাকে ব্যাখ্যা করতে পারবে, যা তাদের সত্যতার দাবীকে বৈধতা প্রদান করবে। পবিত্রভূমিতে দ্রুত বিকশিত এই *grande finale* বা শেষ দৃশ্যের সাথে সম্পর্কিত আজকের যুগের এই আজব **বাস্তবতাকে** ইসলামিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যাখ্যা করার জন্যেই বইটি রচিত হয়েছে। আর সে সমস্ত ঘটনাগুলিকে এই পদ্ধতিতে ব্যাখ্যার মাধ্যমে বইটি ইসলামের সত্যতার দাবীকে নিশ্চিত করেছে।

এই লেখক জ্ঞানকে সযত্নে লালন করেন এবং আল্লাহ্‌র যেসব বান্দা জ্ঞানের আশির্বাদপ্রাপ্ত তাদেরকে তিনি যথাযথ সম্মান করেন। তিনি প্রার্থনা করেন যে, এই বিনয়ী বইটি যেন জ্ঞানের ক্ষেত্রে একটি আশাব্যঞ্জক ভূমিকা রাখতে পারে। *আমিন!*

এই বইয়ে উল্লেখিত কুর'আন ও হাদীসের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ দ্বারা যেসব মুসলিমেরা প্রভাবিত হয়েছেন তারা এখন ইয়াজুজ ও মাজুজীয় বিশ্বব্যাপী সমাজকে অনুসরণ করার পরিবর্তে নবী মুহাম্মাদ মুস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে অনুসরণ করতে দৃঢ়ভাবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হবেন। সেই বিশ্ব সমাজ ইতোমধ্যেই অধিকাংশ মানবতাকে তার ধ্বংসাত্মক থাবা, আল্লাহ্‌র প্রতি চরম বিদ্রোহ এবং ধর্মীয় আচরণের প্রতি চরম অবজ্ঞার জালে আটকে ফেলেছে।

দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন ইসলামি ফিরকা এবং আন্দোলনের সদস্য যেমন **শি'আ, আহমেদিয়া, ওহাবী, তাবলীগ জামা'আত, আধুনিক ইসলামপন্থি আন্দোলন** এবং **গোঁড়া সুফি** ফিরকার সদস্যরা যদি এই বইয়ে উল্লেখিত যুক্তি দ্বারা প্রভাবিত হয় তবে তাদের উচিত সমালোচনার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে উপলব্ধি করা যে, ইসলামে তাদের ফিরকাবাজির বৈধতা কতটুকু রয়েছে।

সর্বশেষে, এই বইয়ের অন্যতম উদ্দেশ্য ড. তাম্মাম আদীর অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ ভূমিকাকে পেশ করা, যার অধিকাংশই লেখকের এই বইটিতে পেশ করা মতামতের সাথে সাদৃশ্যময়। তাঁর লেখার সাথে যেসকল ছোটখাটো ভিন্নতা দেখা গেছে সেগুলি আমরা

আশা করছি সামগ্রিকভাবে এই বইটিতে দেয়া প্রতিপাদ্যের সমন্বয়ে আরো গবেষণার দরজা উন্মুক্ত করে দিবে, যা অবশ্যই জ্ঞানের সীমানাকে বৃদ্ধি করবে। *ইনশাআল্লাহ্*। উদাহরণস্বরূপ, ড. আদী মনে করেন নবী (সাঃ) ইবনে সাইয়াদকে দাজ্জাল হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন। *ইনশাআল্লাহ্*, এবিষয়ে আলোচনা করব আমাদের আগামী বই ভন্ড-*মসীহ দাজ্জাল বা অ্যান্টি-ক্রাইস্ট সম্পর্কে ইসলামের ধারণা (An Islamic View of Dajjāl the false Messiah or Anti-Christ)*।